

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

ইসলামী নীতি-দর্শন

হ্যরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী
ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ)

ভাষান্তর : এ. এইচ. এম. আলী আনওয়ার

প্রকাশক :

আহমদীয়া মুসলিম জ্ঞানাত, বাংলাদেশ
৪ বকসী বাজার রোড,
ঢাকা-১২১১

প্রথম সংক্রণ : ১৯৭৭ ইসাব্দ

পঞ্চম সংক্রণ : ১৯৯৭ ইসাব্দ

(শত-বার্ষিকী সংক্রণ)

মুদ্রণ :

ইন্টারকন এসোসিয়েটস
ঢাকা।

ইসলামী নীতি-দর্শন শতবর্ষিকী প্রকাশনা ১৮৯৬-১৯৯৬



হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (১৮৩৫-১০৮),
প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী আলায়হেস সালাম

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

‘ইসলামী নীতি-দর্শন’ পুস্তকের শত-বার্ষিকী প্রকাশনা উপলক্ষ্যে—
সৈয়দনা আমীরুল মুমেনীন খলীফাতুল মসীহ রাবে’
হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ)-এর



বাণী

নিখিল-বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম
সম্প্রদায় এই বিখ্যাত অসাধারণ গ্রন্থানির
প্রকাশনার শতবর্ষ-পূর্তি উদ্ঘাপন করতে
যাচ্ছে। এই গ্রন্থটি সর্বপ্রথম পাঠ করা
হয়েছিল লাহোরে অনুষ্ঠিত একটি আন্তঃধর্মীয়
সম্মেলনে ১৮৯৬ সালের ২৬ থেকে ২৯শে
ডিসেম্বর পর্যন্ত। এর প্রত্যেকটি থিসিস রচিত
হয়েছিল ঐশী আশিসে ও কৃপায়। এবং এর
একক সাফল্যের কথা অবহিত করা হয়েছিল
আল্লাহর ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কিত ওহী-এর
মাধ্যমে, যা প্রকাশিত করা হয়েছিল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই।

একটি মুমিন-সম্প্রদায়ের যেমনটি করা উচিত, ঠিক তেমনিভাবে
আমাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের এই অনুষ্ঠানও হবে অর্থবহ এবং মর্যাদামণ্ডিত।
এবং তা থাকবে সর্বপ্রকারের অপ্রয়োজনীয় কর্মকাণ্ড, আজেবাজে প্রদর্শনী ও
আনন্দ-উল্লাস থেকে মুক্ত। তাই, আমরা এই গ্রন্থটির শত-বার্ষিকী উৎসব
উদ্ঘাপন করছি প্রধান প্রধান প্রায় সকল ভাষায় এর অনুবাদ প্রকাশিত করার
মাধ্যমে। ফলে, আমরা আশা করি যে, পৃথিবীর প্রায় সকল জাতিই এই
পুস্তকের কল্যাণরাজি আহরণ করতে সমর্থ হবে।

আল্লাহত্তা'লা'র বিশেষ ফযলে ও কৃপায় আমরা এ পর্যন্ত পৃথিবীর বায়ান্তি
বড় বড় ভাষায় এই গ্রন্থের তর্জমা সম্পূর্ণ করেছি এবং তা প্রকাশও করেছি।
এছাড়া, বাদবাকী প্রধান ভাষাগুলির কয়েকটিতেও অনুবাদের কাজ এগিয়ে
চলেছে। আমরা আশা করি, খোদার ফযলে এই সব কাজ সম্পন্ন হয়ে যাবে
১৯৯৬ সন শেষ হওয়ার পূর্বেই।

এই মহৎ কাজ সম্পন্ন করার জন্য যাঁরা তাঁদের ক্ষমতা, সময় ও শ্রমের
কোরবানী করছেন, আল্লাহত্তা'লা তাঁদের সবাইকে পুরস্কৃত করুন। আমীন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শতবর্ষ-পূর্তি সংস্করণের ভূমিকা

‘ইসলামী উসূল কি ফিলসফী’ গ্রন্থটি প্রতিশ্রূত মসীহ ও ইমাম মাহ্দী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী আলাইহেস্স সালামের একটি অনবদ্য ও অনন্য-সাধারণ রচনা। গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল ১৮৯৬ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত আন্তঃধর্মীয় সম্মেলনের প্রেক্ষাপটে। এর অনুবাদ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে এবং হচ্ছে। বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয় প্রথম ১৯৭৭ সালে ‘ইসলামী নীতি-দর্শন’ শিরোনামে। পরবর্তীতে, এর আরও কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

১৯৯৬ সালে এই পবিত্র গ্রন্থটির শত-বার্ষিকী উৎসব পালিত হয়েছে। এতদুপলক্ষ্যে পৃথিবীর বহু ভাষায় এর নতুন সংস্করণ এবং আরও অনেক ভাষায় নতুন তর্জমা প্রকাশিত হয়েছে।

কথিত আছে, হযরত ইমাম মাহ্দী আলাইহেস্স সালাম ইসলামের বিশ্ব-বিজয়ের লক্ষ্যে যুদ্ধ করবেন। আবার, একথাও বলা আছে যে, ইমাম মাহ্দী (আঃ) ‘ইয়ায়াউল হার্ব’ অর্থাৎ তিনি ‘অন্তের যুদ্ধ রাহিত’ করবেন। সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন ওঠে যে, তাহলে, তিনি কিসের যুদ্ধ করবেন? এর জবাব হচ্ছে, ইমাম মাহ্দী (আঃ) যুদ্ধ করবেন বটে, তবে সে যুদ্ধ অন্তের নয়, সে যুদ্ধ ‘কলম’-এর। এবং সেই কলমের যুদ্ধে তিনি যে সবার উপরে নিরংকুশ জয়লাভ করেছেন, তারই অন্যতম প্রকাশ্য প্রমাণ এই ‘ইসলামী উসূল কি ফিলসফী’ গ্রন্থ। তাই আল্লাহু তার (আঃ) কলমের নাম দিয়েছেন ‘জুলফিকারে আলী’ এবং তাঁকে উপাধি দিয়েছেন ‘সুলতানুল কলম’।

এবারে, বাংলা অনুবাদের কিছুটা মানোন্নয়নের চেষ্টা নেওয়া হয়েছিল। সহযোগিতা করেছেন সর্বজনাব মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, মওলানা আব্দুল আয়ীয় সাদেক এবং মৌলবী ফজলুল করীম মোল্লা সাহেবান। প্রফেসর দেখেছেন জনাব মৌলবী মোহাম্মদ মুতিউর রহমান সাহেব ও জনাব আব্দুল্লাহ ইউসুফ মোহাম্মদ, সহঃ সেক্রেটারী ইশায়াত। আল্লাহত্তা’লা সংশ্লিষ্ট সবাইকে উত্তম পুরস্কার দান করুন। এবং এই মহান গ্রন্থের প্রকাশনাকে মুবারক করুন। আমীন।

খাকসার

ঢাকা
আগস্ট, ১৯৯৭

আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী
ন্যাশনাল আমীর
আহ্মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

বাংলা প্রথম সংক্ষরণের ভূমিকা

(সংক্ষেপিত)

বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা 'সুলতানুল কলম' (লেখনী সম্প্রাট) হ্যুরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী আলায়হেসু সালাতু ওয়াস্স সালামের এই সন্দর্ভ 'ইসলামী উসুল কি ফিলসফী' ১৮৯৬ স্টিসার্ডে অনুষ্ঠিত বিশ্ব-ধর্ম সম্মেলনের উদ্দেশ্যে লিখিত হইয়াছিল।

হ্যুরত মুনশী জালালুন্দীন বালানূরী (রায়ি আল্লাহহ আনভু) লিখিত এক বর্ণনায় আছে যে, হ্যুর আলায়হেসু সালাম বলিয়াছিলেন : 'আমি এই সন্দর্ভের ছত্রে ছত্রে দোয়া করিয়াছি।' ('আসহাবে আহমদ, নবম খন্ড, ২৬৫ পঃ)

'আল্লাহতা'লা পূর্বাঙ্কে এলহাম যোগে জানাইয়াছিলেন : "ইহা সেই সন্দর্ভ, যাহা সকলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিবে।" বস্তুতঃ সম্মেলন শুরু হইবার অনেক পূর্বেই এক ইশতিহার দ্বারা হ্যুর (আঃ) এই সংবাদ ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং বাস্তবেও তাহাই ঘটিয়াছিল।

এই মহান আধ্যাত্মিক গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশের ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন আমাদের দুইজন মোখলেস বন্ধু। তাঁহাদের নেক ইচ্ছা ছিল যে, তাঁহাদের নাম যেন প্রকাশ করা না হয়। সেই জন্য আমরা তাঁহাদের নাম প্রকাশে বিরত রহিলাম। আল্লাহতা'লা তাঁহাদের এই কোরবানীকে কবুলিয়তের মর্যাদা দান করুন, এবং তাঁহাদেরকে জায়ায়ে খায়ের দান করুন। আমীন।

মূল গ্রন্থটি শুধু সাহিত্য হিসাবেও অতি উচ্চাঙ্গের সাহিত্য এবং একটি অমূল্য রচনা। ভাষাস্তরিত করিতে যাইয়া সাহিত্যের সেই নিখাদ রূপটি ধরিয়া রাখীর যে চেষ্টা করিয়াছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় বুর্যগ মোহতরম এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার সাহেব, তজ্জন্য তাঁহাকে অশেষ মুবারকবাদ। বৃন্দ বয়সে তাঁহার মেধার এবং শ্রমের এই কোরবানী আল্লাহ কবুল করুন এবং তাঁহাকে জায়ায়ে খায়ের দান করুন।

অনুদিত গ্রন্থটির সম্পাদনা করিয়াছেন মোহতরম মৌলবী মোহাম্মদ সাহেব (সাল্লামাল্লাহ) ন্যাশনাল আমীর, বাংলাদেশ জামা'তে আহমদীয়া। সম্পাদনার কাজে সহযোগিতা করিয়াছেন জনাব মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব, সদর মুরুর্বী। আল্লাহতা'লা তাঁহাদেরকে জায়ায়ে খায়ের দিন। (আমীন)

যে পরিত্র উদ্দেশ্যে এই মহান গ্রন্থটির প্রকাশ, তাঁহার অবশ্যিক্তাৰী সাফল্য এ দেশেও দ্রুততার সহিত অর্জিত হউক, ইহাই সর্বশক্তিমান আল্লাহর দরবারে আমাদের প্রার্থনা।

আমাদের শেষ কথা, আলহামদুলিল্লাহে রাবিল আলামীন।

খাকসার

১৯৭৭ খ্রীস্টাব্দ

শাহু মুস্তাফিজুর রহমান
সেক্রেটারী, প্রণয়ন ও প্রকাশনা
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

সূচীপত্র

বিষয়

	পৃষ্ঠা
পটভূমি ও প্রস্তুতি	১-১৮
সত্যাবেষীগণের জন্য মহা সুসংবাদ	১৯
ইসলাম : দাবী ও দলিল প্রমাণ ঐশীগৃহ হইতে হওয়া জরুরী	২১
□ প্রথম প্রশ্নের উত্তর :	২২
মানুষের দৈহিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থা	২২
মানুষের ত্রিবিধ অবস্থা	২২
প্রথম উৎস : নাফ্সে আম্বারাহ	২২
দ্বিতীয় উৎস : নাফ্সে লাউওয়ামাহ	২৩
তৃতীয় উৎস : নাফ্সে মুত্মাইন্নাহ	২৪
আত্মার সৃষ্টি হওয়া বিষয়ে	২৪
আত্মার দ্বিতীয় জন্ম	২৪
মানুষের ক্রমাগত উন্নতি	২৪
স্বভাবজ অবস্থা ও নৈতিক অবস্থার মধ্যে পার্থক্য এবং	৩১
জীব হত্যার অপরাদ খনন	৩১
ইসলাহের (সংশোধনের) তিনটি পদ্ধতি : ইসলাহের চরম	৩৩
প্রয়োজনের সময়ে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর আবির্ভাব	৩৩
কুরআনের শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ত্রিবিধ ইসলাহ সাধন :	৩৫
নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে স্বভাবজ অবস্থাকে নৈতিকতায় রূপ দান	৩৫
প্রকৃত নৈতিকতা	৩৬
খাল্ক ও খুল্ক	৩৭
প্রথম ইসলাহ : স্বভাবজ অবস্থার সংশোধনী	৩৮
শূকর নিষিদ্ধ (হারাম)	৩৯
মানুষের নৈতিক অবস্থা	৪৪
অকল্যাণ পরিহার সম্পর্কিত চারিত্রিক গুণ	৪৫
কাম-সংযম বা সতীত্ব রক্ষার পাঁচটি উপায়	৪৮
কল্যাণ সাধনের উপায়সমূহ	৫৬
প্রকৃত বীরত্ব	৬৩
সত্যবাদিতা	৬৫
সব্র বা ধৈর্য	৬৬
সহানুভূতি	৬৮
এক পরম উর্ধ্বতন অস্তিত্বের অব্বেষণ	৬৯
আঁ-হযরত (সাঃ)-এর আরবে আবির্ভূত হওয়ার তাৎপর্য	৭১
দুনিয়ার উপরে কুরআন করীমের অনুগ্রহ	৭২

মহান স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ	৭৩
মহান স্রষ্টার শুণাবলী	৭৬
রূহানী (আধ্যাত্মিক) অবস্থাসমূহ	৮২
একটি অতি প্রিয় দোয়া	৮৫
কপূর ও আদা মিশ্রিত শরবতের তত্ত্বকথা	৯০
যাঙ্গাবিলের ক্রিয়া	৯১
আল্লাহত্তালার সহিত নিবিড় রূহানী সম্বন্ধ স্থাপনের উপায়	৯৬
□ দ্বিতীয় প্রশ্ন	
মৃত্যুর পরে মানুষের অবস্থা কি হয় ?	৯৯
পরলোক সম্বন্ধে কুরআনে বর্ণিত তিনটি তত্ত্ব : মারেফত	১০২
মারেফত বা তত্ত্বজ্ঞানের প্রথম সূক্ষ্ম কথা	১০২
তিন প্রকারের জ্ঞান :	১০৮
তিন জগৎ :	১০৮
তত্ত্বজ্ঞানের দ্বিতীয় সূক্ষ্মতত্ত্ব	১০৯
তত্ত্বজ্ঞানের তৃতীয় সূক্ষ্ম কথা	১১২
□ তৃতীয় প্রশ্ন	
মানব জীবনের উদ্দেশ্য কী এবং উহা লাভ করিবার উপায় কী ?	১১৪
মানব জীবনের উদ্দেশ্যকে লাভ করার উপায়	১১৫
□ চতুর্থ প্রশ্ন	
ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনে কর্মের অর্থাৎ বিধিনিষেধ বা শরীয়ত পালনের ফলাফল কী ?	১২১
কুরআন শরীফে বর্ণিত বিভিন্ন বস্তুর ক্ষম (দিব্য) তত্ত্ব	১২৩
□ পঞ্চম প্রশ্ন	
মারেফাতে এলাহী (ঐশ্বী জ্ঞান) লাভের উপায়	১২৭
মানব স্বভাব-তত্ত্ব	১৩০
এলহাম (ঐশ্বী-বাণী) বলিতে কি বুঝায় ?	১৩৩
ইসলামের বিশেষত্ব	১৩৫
প্রবন্ধ প্রণেতার ঐশ্বীবাণী প্রাপ্তির মর্যাদা	১৩৬
পরিপূর্ণ জ্ঞানের উপায় খোদাতালার এলহাম	১৩৭
আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের জীবনের দুই যামানা	১৪০
আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের যুদ্ধের উদ্দেশ্য	১৪৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পটভূমি ও প্রস্তুতি-পরিচিতি

স্বামী সাধু শোগান চন্দ্র নামক এক বিশিষ্ট ভদ্রলোক, যিনি তিনি / চার বছর ধারণ হিন্দুদের কায়স্থ গোত্রের সংক্ষার সাধনের চেষ্টা চালিয়ে আসছিলেন, ১৮৯৬ সালে তাঁর মনে এই চিন্তার উদ্বেক হলো যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সকল মানুষ একত্রিত হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন লাভ হবে না। অবশেষে, তিনি একটি ধর্মীয় সম্মেলন করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিলেন। তদনুযায়ী, এ ধরনের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো আজমীরে। অতঃপর, তিনি ১৮৯৬ সালে দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠানের জন্য লাহোরকে উপযুক্ত স্থান বিবেচনা করে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগলেন।

জনাব স্বামী সাহেব এই ধর্মীয় কন্ফারেন্স-এর জন্য একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করেন। কমিটির প্রেসিডেন্ট হন জনাব মাস্টার দুর্গা প্রসাদ এবং চীফ সেক্রেটারী লাহোর চীফ কোর্টের জনৈক হিন্দু উকিল জনাব লালা ধনপত রায় বি. এ, বি. এল। কন্ফারেন্সের তারিখ নির্ধারিত হলো ২৬, ২৭ ও ২৮শে ডিসেম্বর, ১৮৯৬ খ্রীঃ। সম্মেলনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মনোনীত করা হলো ছয় ব্যক্তিকে। এবং তাঁরা হলেন :

১. জনাব রায় বাহাদুর বাবু প্রতুল্ল চন্দ্র, জজ, চীফ কোর্ট, লাহোর
২. জনাব খান বাহাদুর খোদা বখ্স, জজ, স্বল কজেজ কোর্ট, লাহোর
৩. জনাব রায় বাহাদুর পতিত রাধাকৃষ্ণ, উকিল, চীফ কোর্ট, সাবেক গভর্নর, জম্মু
৪. হযরত মৌলবী হেকীম নূর উদ্দীন (রাঃ), শাহী চিকিৎসক
৫. জনাব রায় ভবানী দাস এম. এ. এক্স্ট্রো এসিষ্ট্যান্ট অফিসার, কিলাম
৬. সরদার জওহর সিৎ, সেক্রেটারী খাল্সা কমিটি, লাহোর

স্বামী শোগান চন্দ্র কমিটির পক্ষ থেকে সম্মেলনের জন্য প্রকাশিত ইশ্তিহারে মুসলমান, খৃষ্টান এবং আর্যদেরকে কসম দিয়ে বললেন, তাঁদের প্রথ্যাত আলেমগণ যেন এই সম্মেলনে (অংশ গ্রহণ করে) নিজ নিজ ধর্মের সৌন্দর্যাবলী বর্ণনা করেন। তিনি আরও লিখলেন, বড় বড় ধর্মগুলির এই (আন্তঃধর্মীয়) সম্মেলন অনুষ্ঠানের স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে লাহোর টাউন হলে। এবং এর পিছনে উদ্দেশ্য এটাই যে, এতে করে যেন সত্য ধর্মের সৌন্দর্য, ঔৎকর্ষ এবং গুণাবলী অনুরাগীদের এক সাধারণ সমাবেশে প্রকাশিত হয় এবং তার প্রতি সকলের হৃদয়ে অনুরাগ ও ভালবাসার সৃষ্টি হয়, এবং তার দলীল ও যুক্তি-প্রমাণ যেন সকলে যথাযথরূপে অনুধাবন করতে পারে। এবং এই উপায়ে যেন প্রত্যেক ধর্মের সম্মানিত বুয়ুর্গ বঙ্গ তাঁর নিজ ধর্মের সত্যতাকে অন্যান্যদের হৃদয়ে স্থান

করে দেওয়ার সুযোগ লাভ করেন। এবং শ্রোতারাও যেন এই সুযোগ লাভ করে যে, বুয়ুর্গদের এই সমাবেশে তারা একজনের বক্তৃতার সঙ্গে আর একজনের বক্তৃতা তুলনা করে দেখবে এবং যার মধ্যে সত্যের জ্যোতিঃ দেখতে পাবে তাকেই গ্রহণ করবে।

আজকাল বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সৃষ্টি বিতর্কের কারণে সত্য ধর্মকে জানার জন্য মানুষের মনে আগ্রহেরও সৃষ্টি হয়েছে। এর জন্য উৎকৃষ্ট পন্থা বোধ করি এটাই যে, প্রতিটি ধর্মের বুয়ুর্গ ব্যক্তিরা যাঁরা ওয়াজ-নসীহত করে থাকেন তাঁরা সবাই একত্রে সমবেত হবেন এবং পূর্ব-প্রকাশিত কিছু প্রশ্নের উত্তরে প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধর্মের সৌন্দর্য বর্ণনা করবেন। অতএব, বড় বড় ধর্মগুলির এই সম্মেলনে, যে ধর্মটি সত্য-পরমেশ্বরের তরফ থেকে হবে, তা অবশ্যই তার আপন আলোকের প্রতিফলন দেখাতে পারবে। এই উদ্দেশ্যেই এই জলসার আয়োজন। প্রত্যেক জাতির বুয়ুর্গ বক্তাগণের প্রত্যেকেই ভালভাবেই জানেন যে, তাঁর স্বধর্মের সত্যতা প্রকাশ করা তাঁর জন্য ফরয। সুতরাং, যে অবস্থায়, যে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এই জলসার আয়োজন করা হয়েছে, তা হচ্ছে, সত্য প্রকাশিত হোক। কাজেই, খোদাতা'লাও এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এক বিরাট সুযোগ সৃষ্টি করে দিলেন, যা সব সময় মানুষের জন্য সৃষ্টি হওয়াটা সম্ভবপর হয় না।

অতঃপর, তিনি প্রেরণা দানের উদ্দেশ্যে লিখেন :

‘কী! আমি কি একথা মেনে নিতে পারি যে, এক ব্যক্তি মনে করে যে, অন্যান্য ব্যক্তিরা এক প্রাণঘাতী ব্যাধিতে আক্রান্ত এবং সে এই দৃঢ় বিশ্বাসও পোষণ করে যে, তাদের নিরাময়ের ঔষধ কেবল তারই কাছে আছে, এবং সে মানুষের প্রতি সহানুভূতিও রাখে; আর এই অবস্থায় গরীব রোগীরা তাকে চিকিৎসার জন্য ডাকলে সে জেনে শুনেই চুপ করে থাকবে? আমার প্রাণ তো এইজন্য ছটফট করছে যে, এটা ফায়সালা হয়ে যাক, কোন্ ধর্ম সত্য এবং সত্যতায় পরিপূর্ণ। আমার অন্তরের এই গভীর আবেগ আমি যে কোন্ ভাষায় প্রকাশ করবো, তা আমার জানা নেই।’

লাহোরে অনুষ্ঠিতব্য ধর্মগুলির এই সম্মেলনে যোগ দান করার জন্য বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিগণ স্বামী সাহেবের দাওয়াত করুল করলেন। ১৮৯৬-এর ডিসেম্বরে বড়দিন উদয়াপনের সময়ে লাহোরে এই আন্তঃধর্মীয় সম্মেলন উপলক্ষ্যে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিগণ জলসা কমিটির পক্ষ থেকে এই ঘোষণা দান করালেন যে, কেবল সেই সকল প্রশ্নের উপরেই বক্তৃতা করা যাবে, যা কমিটির পক্ষ থেকে পূর্বাহ্নেই প্রকাশ করা হয়েছিল উত্তর তৈরীর জন্য। এইসব প্রশ্নের উত্তর তৈরীর ব্যাপারে কমিটি একটি শর্ত আরোপ করেছিল। শর্তটি ছিল, বক্তৃতাকারী তাঁর বক্তব্যকে যথাসাধ্য সেই কিতাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখবেন, যে কিতাবকে তিনি তাঁর ধর্মের পবিত্র গ্রন্থ বলে মান্য করেন।

প্রশ্নগুলি ছিলঃ

১. মানুষের দৈহিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থা কি ?
২. মানবজীবনের পারলোকিক অবস্থা কি ?
৩. ইহলোকে মানবজীবনের উদ্দেশ্য কি এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের উপায় কি ?
৪. ঐতিক ও পারত্রিক জীবনে কর্মের ফল কি ?
৫. জ্ঞান অর্থাৎ আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভের উপায় কি ?

এই সম্মেলন, যা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২৬ থেকে ২৯ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত, তাতে সনাতন ধর্ম, হিন্দুইজম, আর্য সমাজ, ফ্রি থিংকার্স, ব্রাহ্মসমাজ, থিওসফিক্যাল সোসাইটি, রিলিজিয়ন্স অব হার্মনী, খৃষ্টধর্ম, ইসলাম, এবং শিখইজম-এর প্রতিনিধিবৃন্দ বক্তৃতা করেন। কিন্তু, এই সমস্ত বক্তৃতার মধ্যে মাত্র একটি বক্তৃতায় উল্লিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়া হয়েছিল সঠিকরূপে এবং সম্পূর্ণরূপে। যখন এই বক্তৃতাটি হয়রত মৌলবী আব্দুল করীম সাহেব (রাঃ) তাঁর সুললিত কর্তৃ পাঠ করা শুরু করলেন তখন যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। কোন ধর্মের এমন কোন লোক তখন ছিলেন না যিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রশংসাসূচক ধরনি (নারা) বুলন্দ আওয়াজে উচ্চারণ করা থেকে বিরত ছিলেন। এমন কোন ব্যক্তি ছিলেন না যাঁর উপরে গভীর আনন্দ ও তন্মুখ অবস্থার প্রভাব পড়েনি। বর্ণনার স্টাইল ছিল অতিশয় হৃদয়গ্রাহী এবং প্রত্যেকের নিকটে প্রিয়, আকর্ষণীয়। এই প্রবন্ধের শেষাংশে বড় প্রমাণ এর চাহিতে আর কী হতে পারে যে, বিরুদ্ধাবাদীগণ পর্যন্ত প্রশংসায় গদগদ হয়ে ওঠেছিল। বিখ্যাত ও জনপ্রিয় পত্রিকা সিভিল এ্যাণ্ড মিলিটারী গেজেট, লাহোর, খৃষ্টান হওয়া সত্রেও এই প্রবন্ধের উচ্চ প্রশংসা করেছে এবং একে অবিস্মরণীয় বলে উল্লেখ করেছে।

এই প্রবন্ধের রচয়িতা হচ্ছেন জামা'তে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা হয়রত মির্বা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)। এই প্রবন্ধের পাঠ নির্ধারিত দুই ঘণ্টায় সমাপ্ত না হওয়ায় সম্মেলনের দিন ২৯ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছিল। ‘পাঞ্জাব অবজার্ভার’ এই প্রবন্ধের আলোচনায় কলামের পর কলাম মন্তব্য লিখেছিল। ‘পায়সা আখবার’, ‘চৌধুই সদী’ (রাওয়ালপিণ্ডি), ‘মাখ্যামে দেকান’ ‘সাদেকুল আখবার’ এবং ‘জেনারেল ও গওহর আসফী’ প্রভৃতি পত্রিকা বিনা ব্যতিক্রমে এই প্রবন্ধের আলোচনা ও প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেছিল। অন্যান্য জাতি ও অন্যান্য ধর্মের লোকেরাও এই প্রবন্ধটিকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করেছেন। এই ধর্মীয় কনফারেন্সের সেক্রেটারী লালা ধনপত রায় বি. এ., বি. এল, উকীল চীফ কোর্ট, পাঞ্জাব, এই বক্তৃতা সম্পর্কে ‘রিপোর্ট জলসা আ’য়ম ম্যাহেব (ধরম মহোৎসব)’ নামক পুস্তকে লিখেছেন :

“পণ্ডিত গোবর্দ্ধন দাস সাহেবের বক্তৃতার পর বাকী ছিল মাত্র আধা ঘণ্টা সময়। এই বক্তৃতার পর ইসলামের একজন প্রখ্যাত প্রবক্তার পক্ষ থেকে বক্তৃতা দেওয়ার কথা ছিল। তাই, উপস্থিতি শোভন্দের কেউই তাদের নিজ নিজ আসন ছেড়ে যাননি। দেড়টা বাজার তখনও চের বাকী। ইসলামিয়া কলেজের প্রশংস্ত প্রাঙ্গণ (পরে নির্ধারিত স্থান) শীত্র শীত্র ভরে যেতে লাগলো এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে সমস্ত প্রাঙ্গণ লোকে ভরে গেল। তখন সেখানে প্রায় সাত আট হাজার লোকের সমাবেশ ঘটেছিল। বিভিন্ন ধর্ম ও বিভিন্ন সোসাইটির বহু জ্ঞানী-গুণী ও বিদ্বান ব্যক্তি উপস্থিতি ছিলেন। যদিও চেয়ার, বেঞ্চ, ফরাস ইত্যাদির যথেষ্ট বন্দোবস্ত ছিল, তবু শত শত লোকের দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া কোন উপায় ছিল না। এবং দাঁড়িয়ে থাকা এই সব শ্রেতাদের মধ্যে ছিলেন পাঞ্জাবের বড় বড় বিদ্যালী ও সন্তান ব্যক্তি, বড় বড় আলেম-ফাযেল, ব্যারিস্টার, উকীল, প্রফেসর, এক্স্ট্রা এসিস্ট্যান্ট (অফিসার বা ম্যাজিস্ট্রেট), ডাক্তার এক কথায় সমাজের উচ্চ স্তরের নানা শ্রেণীর ও পেশার লোকজন। এবং এই সমস্ত লোকজনের একত্রে জমা হওয়া এবং অত্যন্ত ধৈর্য ও তিতিক্ষা সহকারে আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত এক নাগাড়ে চার/ পাঁচ ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকাটাই সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করে যে, ঐ সমস্ত সম্মানিত ব্যক্তির মনে সেই পবিত্র বিষয় সম্পর্কে জানবার জন্য কত বেশী প্রেরণার সৃষ্টি হয়েছিল। বক্তৃতার (প্রবক্ত্বের) রচয়িতা তো সশরীরে সম্মেলনে উপস্থিত হতে পারেন নি, কিন্তু তাঁর এক বিশিষ্ট শিষ্য জনাব মৌলবী আব্দুল করীম সাহেব শিয়ালকোটীকে প্রবন্ধ পাঠের জন্য প্রেরণ করেছিলেন। এই প্রবন্ধ পাঠের জন্য যদিও কমিটির পক্ষ থেকে নির্ধারিত সময় ছিল মাত্র দু’ঘণ্টা, কিন্তু জলসায় উপস্থিত সুধীবৃন্দের সকলের মনে এই প্রবক্ত্বের প্রতি এমন এক আকর্ষণ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল যে, মডারেটর সাহেবান অত্যন্ত জোশের এবং খুশীর সঙ্গে এই অনুমতি দিলেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত এই প্রবক্ত্বের পাঠ শেষ না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত জলসার কার্যক্রমও শেষ হবে না। তাঁদের এই ঘোষণা জলসার কর্মকর্তা এবং উপস্থিতি শোভন্দারীর ইচ্ছানুসারেই দেওয়া হয়েছিল। কেননা, নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর যখন মৌলবী আবু ইউসুফ মোবারক আলী সাহেব তাঁর নিজের সময় এই প্রবক্ত্বের পাঠ শেষ করার জন্য ছেড়ে দিলেন, তখন উপস্থিতি সকলেই এবং মডারেটর সাহেবেরা ও খুশীর চোটে সমস্বরে নারা ধ্বনি দিয়ে মৌলবী সাহেবকে শুকরিয়া জানালেন। সম্মেলনের কার্যক্রম সমাপ্ত হওয়ার কথা ছিল সাড়ে চারটায়। কিন্তু, অবস্থার প্রেক্ষিতে এই কার্যক্রম সাড়ে পাঁচটার পরেও জারি রাখতে হয়েছিল। কেননা, এই প্রবক্ত্বের পাঠ শেষ করতে সময় লেগেছিল প্রায় চার ঘণ্টা এবং শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এর আকর্ষণ ও হৃদয় গ্রাহিতা অক্ষুণ্ণ ছিল।”

বিশ্বয়কর ব্যাপার হচ্ছে, সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই ২১ শে ডিসেম্বর (১৮৯৬) তারিখে আহমদীয়া জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা এই প্রবক্ত্বের বিজয়ী

হওয়া সম্পর্কে আল্লাহতা'লার কাছ থেকে খবর পেয়ে একটি ইশ্তিহার প্রকাশ করেছিলেন। ('সত্যাবেষীগণের জন্য মহা সুসংবাদ' শীর্ষক উক্ত ইশ্তিহারটি অন্ত পুস্তকের ২১ পৃষ্ঠায় দেখুন)। এখানে সঙ্গত কারণেই দু'তিনটি পত্রিকার সম্পাদকীয় থেকে উদ্ধৃতি দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করছি :

'দি সিভিল এ্যান্ড মিলিটারী গেজেট' (লাহোর), লিখেছে :

'এই জলসার শ্রোতৃবন্দের হৃদয়ের বিশেষ আকর্ষণ ছিল মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর বক্তৃতার প্রতি, যা ছিল ইসলামের সাহায্য ও হেফায়তের জন্য অত্যন্ত সুদক্ষ সফল ও উৎকর্ষমণ্ডিত। এই বক্তৃতা শোনার জন্য দূরের ও কাছের বিভিন্ন ফের্কার বা মতবাদের অসংখ্য লোক জমায়েত হয়েছিল। যেহেতু, মির্যা সাহেব নিজে উপস্থিত হতে পারেননি, সেহেতু এই বক্তৃতা তাঁর এক সুযোগ্য শিষ্য মুসী আব্দুল করীম সাহেব শিয়ালকোটী পাঠ করে শোনান। ২৭ তারিখে এই বক্তৃতা তিন ঘণ্টা ধরে চলছিল, এবং জনসাধারণ তা গভীর মনোযোগ সহকারে শুনছিল। কিন্তু, ততক্ষণ পর্যন্ত মাত্র একটি প্রশ্নের উত্তর দান সমাপ্ত হয়েছিল। মৌলবী আব্দুল করীম সাহেব প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, যদি সময় দেওয়া হয়, তাহলে বাকী অংশও শোনাবেন তাই, ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং সভাপতি সাহেব এই প্রস্তাব মণ্ডের করলেন যে, ২৯শে ডিসেম্বর পর্যন্ত জলসার তারিখ বাড়িয়ে দেওয়া হোক।'

'চৌধুই সদী' (রাওয়ালপিণ্ডি), হযরত আকদস ইমাম মাহ্মুদী আলায়হেস্সালাম-এর এই বক্তৃতার উপরে নিম্নলিখিত আলোচনা করেছে :

"সব ক'টি বক্তৃতার মধ্যে যে বক্তৃতাটি ছিল সম্মেলনের প্রাণ সঞ্চারকারী, তা ছিল মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর। তাঁর বাণিজ্যিক পূর্ণ বিখ্যাত সেই বক্তৃতা মৌলবী আব্দুল করীম সাহেব শিয়ালকোটী অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে সুলিলিত কঢ়ে পাঠ করে শোনান। এই বক্তৃতা শেষ হয় দুই দিনে। ২৭ শে ডিসেম্বর প্রায় চার ঘণ্টা এবং ২৯ শে ডিসেম্বর দু' ঘণ্টা, মোট ছ' ঘণ্টায় এই বক্তৃতা শেষ হয়, যা আকারে একশ' পৃষ্ঠা হবে। প্রতিটি কথা, প্রতিটি বাক্যের সমাপ্তিতে (শ্রোতাদের) প্রশংসার ধ্বনি বুলন্দ হয়ে উঠছিল। এবং কখনও কখনও এক একটা বাক্যকে দ্বিতীয় বার পড়ার জন্য উপস্থিত জনতার পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হচ্ছিল। জীবনভর আমাদের কান এমন শ্রুতিমধুর বক্তৃতা আর শোনেনি। অন্যান্য ধর্মের লোক যাঁরা বক্তৃতা করেছেন, সত্য তো এটাই যে, তাঁদের বক্তৃতায় জলসার প্রশংসাবলীর কোন উত্তরই ছিল না। প্রায় সব বক্তাই শধু চতুর্থ প্রশ্নের উপরেই কথা বলেছেন, বাকী প্রশ্নগুলির ব্যাপারে তাঁরা খুব সামান্যই বলেছেন। প্রায় সব ভদ্রলোকেরই অবস্থা তো এই ছিল যে, তাঁরা অনেক বলেছেন ঠিকই, কিন্তু তাঁদের কথায় কোন প্রাণ ছিল না, একমাত্র মির্যা সাহেবের বক্তৃতা ছাড়া।

কেবল তাঁরই বক্তৃতায় ছিল প্রত্যেকটি প্রশ্নের আলাদা আলাদা বিস্তারিত ও সম্পূর্ণ জওয়াব। এবং তা সম্মেলনে উপস্থিত সকলেই অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে সানন্দে শুনেছে। এবং তা সকলের কাছেই অত্যন্ত মূল্যবান ও অতিশয় প্রশংসাযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে।

আমরা মির্যা সাহেবের মুরীদ নই, তাঁর সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু, ইনসাফকে তো আমরা কখনই খুন করতে পারি না। কোন ন্যায়বান ও সুস্থিবিবেক তা করতেই পারে না। মির্যা সাহেব সমস্ত প্রশ্নের জওয়াব দিয়েছেন (যেমনটা দেওয়ার কথা ছিল)। কোরআন শরীফ থেকে তিনি ইসলামের বড় বড় শিক্ষা ও মতাদর্শকে যুক্তি-বুদ্ধির দলীল ও দার্শনিক প্রমাণ দ্বারা অলংকৃত করেছেন। প্রথমে যুক্তি-বুদ্ধির দ্বারা উলুহীয়ত বা ঈশ্঵রত্বের সমস্যার সমাধান দেওয়া, অতঃপর তারই সমর্থনে কালামে ইলাহী (অর্থাৎ কোরআন শরীফ) থেকে উদ্ভৃতি দেওয়ার মধ্যে একটা আশ্চর্য মহিমা প্রকাশিত হচ্ছিল। মির্যা সাহেব শুধু কোরআনী শিক্ষাসমূহেরই দার্শনিক ব্যাখ্যা দান করেননি, বরং সঙ্গে সঙ্গে কোরআনের শব্দাবলীরও অন্তর্নিহিত ভাব ও দার্শনিক তাৎপর্যেরও ব্যাখ্যা দান করেছেন। সংক্ষেপে, মির্যা সাহেবের বক্তৃতা ছিল সামগ্রিকভাবে একটি সফল, পরিপূর্ণ ও পারফেক্ট বক্তৃতা। এই বক্তৃতার মধ্য থেকে অগণিত মা'রেফতের জ্ঞান, সুস্মতত্ত্ব, প্রজ্ঞা ও গভীর রহস্যে ডরা মুক্তোর দৃষ্টি বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। এর বক্তব্য পেশ করা হয়েছিল দার্শনিকদের রচনার এমন এক স্টাইলে যাতে সকল ধর্মের লোকেরা বিশ্বায়ে অভিভূত হয়েছিল। মির্যা সাহেবের বক্তৃতার সময় সারাটা হলঘর, ভিতরে, বাইরে যেভাবে জনাকীর্ণ ছিল, সেভাবে অন্য আর কোন বক্তৃতার সময় ছিল না। শ্রোতাগণ সবাই মুঝ ও উৎকর্ণ হয়ে শুনছিল। মির্যা সাহেবের বক্তৃতা এবং অপরাপর বক্তাগণের বক্তৃতার তুলনায় শুধু এতটুকু বলাই যথেষ্ট হবে যে, মির্যা সাহেবের বক্তৃতার সময় জনগণ এমনভাবে ভীড় জমিয়েছিল যেমন মধুর উপরে মাছিরা ভীড় জমায়। কিন্তু অন্যান্য বক্তৃতা শুনোর সময় ভাল না লাগার কারণে লোকেরা উঠে উঠে যাচ্ছিল। মৌলবী মোহাম্মদ হোসেন বাটালবীর লেকচার ছিল অত্যন্ত মামুলী ধরনের। এর মধ্যে ঐ সমস্ত মোল্লায়ী ধ্যান-ধারণাই ছিল, যা কিনা লোকেরা প্রতিদিন শুনে থাকে। এর মধ্যে না ছিল কোন গভীর জ্ঞানের কথা না কোন নৃতন কথা। এই নামজাদা মৌলবী সাহেবের দ্বিতীয় বক্তৃতার সময় অনেক লোক উঠে চলে গিয়েছিল। এছাড়া, এই সম্মানিত মৌলবী সাহেবকে তাঁর বক্তৃতা শেষ করার জন্য কয়েক মিনিট সময়ও বেশী দেওয়া হয়নি।" - (চৌধুরী সদী, রাওয়ালপিণ্ডি, ১লা ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৭ইং)

‘জেনারেল ও গওহর আসফী’ ২৪ শে জানুয়ারী (১৮৯৭) সংখ্যায় “লাহোরে অনুষ্ঠিত মহাসম্মেলন” এবং “ইসলামের বিজয়” শিরোনামে দু’টি নিবন্ধে লিখেছে :

“সম্মেলনের কার্যক্রম সম্পর্কে কথাবার্তা বলার আগে একটা কথা বলা প্রয়োজন যে, আমাদের পত্রিকার কলামগুলিতে এ বিষয়টা নিয়ে এক বিতর্ক হয়ে গেছে। তা থেকে আমাদের পাঠকরা ভালভাবেই জানেন যে, এই ধর্মীয় মহাসম্মেলনে ইসলামের পক্ষে ওকালতি করার জন্য সর্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তি কে ছিলেন ? আমাদের একজন সম্মানিত প্রতিবেদক সর্বপ্রথম নিরপেক্ষ মন নিয়ে এবং সত্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে এক্ষেত্রে যাকে নির্বাচিত করেছেন, তিনি হচ্ছেন কাদিয়ানের রইস (প্রধান বা চীফ) হ্যরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব। এবং এর প্রতি ঐকমত্য প্রকাশ করেছিলেন আমাদের আর একজন শ্রদ্ধেয় ও সম্মানিত ব্যক্তি তাঁর পত্রিকায় সম্পাদকীয় লিখে। জনাব মৌলবী ফখরুজ্জীন সাহেব ফখর অত্যন্ত জোরের সঙ্গে এই নির্বাচন সম্পর্কে তাঁর যে স্বাধীন যুক্তিপূর্ণ ও মূল্যবান অভিমত জনসমক্ষে প্রকাশ করেছিলেন তাতেও হ্যরত মির্যা গোলাম আহমদ (রইসে কাদিয়ান)-এর কথাই বলা হয়েছিল। আলীগড়ের জনাব স্যার সৈয়দ আহমদ সাহেবকেও (বক্তৃতা দানের জন্য) নির্বাচন করা হয়েছিল। এবং একই সঙ্গে ইসলামের পক্ষে ওকালতীর জন্য যাঁদের নাম শোনা যাচ্ছিল, তাঁরা হচ্ছেন, জনাব মৌলবী আবু সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন সাহেব বাটালবী, জনাব মৌলবী হাজী সৈয়দ মোহাম্মদ আলী সাহেব কানপুরী এবং মৌলবী আহমদ হোসেন সাহেব আযিমাবাদী। এখানে একথার উল্লেখ করাও অসমীচীন হবে না যে, আমাদের একটি স্থানীয় পত্রিকার একজন সংবাদদাতা তফসীরে হাকানীর লেখক জনাব মৌলবী আব্দুল হক সাহেব দেহলবীকেও এই কাজের জন্য অনুরোধ করেছিলেন।

অতঃপর স্বামী শোগান চন্দ্রের ইশতিহারের সেই অংশ, যেখানে তিনি হিন্দুস্থানের বিভিন্ন ধর্মের আলেমদেরকে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে আহ্বান জানিয়েছিলেন তাঁদের স্ব স্ব ধর্মের মণি-মুক্ত্বে প্রদর্শন করার জন্যে, তার উদ্ধৃতি দিয়ে উক্ত পত্রিকাটি লিখেছে :

“এই জলসার ইশতিহার ইত্যাদি দেখার পর এবং দাওয়াত পৌছার পর হিন্দুস্থানের কোন্ কোন্ মনীষীর হিস্তের শিরা-উপশিরায় এই জোশের সৃষ্টি হয়েছিল যে, তাঁরা দীনে-ইসলামের পক্ষে ওকালতী করবেন। এবং তাঁরা ইসলামের সহায়তার জন্য কতটা দায়িত্বার ধ্রুণ করে দলীল ও যুক্তিপ্রমাণের সাহায্যে ফুরকানী-বিস্ময়ের বিজয় অন্য সব ধর্মের প্রাণের উপর প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন (তা জানা দরকার)।

আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পেরেছি যে, সম্মেলনের কর্মকর্তারা বিশেষ করে হ্যরত মির্যা গোলাম আহ্মদ সাহেব এবং স্যার সৈয়দ আহ্মদ সাহেবকে সম্মেলনে শরীক হওয়ার জন্য পত্র লিখেছিলেন। হ্যরত মির্যা সাহেব তো শারীরিক অসুস্থতার কারণে নিজে জলসায় শরীক হতে পারেননি, কিন্তু তাঁর প্রবন্ধ পাঠিয়েছিলেন এবং তাঁর একজন বিশিষ্ট সাগরেদ জনাব মৌলবী আব্দুল করীম সাহেব শিয়ালকোটীকে সেই প্রবন্ধ পাঠের জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু জনাব স্যার সৈয়দ সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করা এবং প্রবন্ধ পাঠানো থেকে নিজেকে বিরত রাখেন। এটা এজন্য ছিল না যে, তিনি বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, এবং এ ধরনের সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করার মত সামর্থ্য তাঁর ছিল না। এবং এটা এজন্যও ছিল না যে, ঐ সময়টাতে ‘এডুকেশনাল কনফারেন্স’ এর অনুষ্ঠান মীরাটে হওয়ার কথা ছিল। বরং এর কারণ এটাই ছিল যে, ধর্মীয় জলসা তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করার মত কোন যোগ্য বিষয় না। কেননা, তিনি তাঁর চিঠিতে, যা ইনশাআল্লাহ্, আমরা আমাদের পত্রিকায় আগামী এক সময় প্রকাশ করবো, তাতে পরিষ্কার লিখে দিয়েছেন যে, তিনি কোন ওয়াজ-নসীহতকারী মৌলবী নন, আর এতো হচ্ছে ওয়াজকারী ও নসীহতকারীদের কাজ। জলসার প্রোগ্রাম দেখে এবং অন্য সবকিছু দেখে শুনে মনে হয়েছে যে, জনাব মৌলবী সৈয়দ মোহাম্মদ আলী সাহেব কানপুরী, জনাব মৌলবী আব্দুল হক সাহেব দেহলবী, জনাব মৌলবী আহ্মদ হোসেন সাহেব আযিমাবাদী এই জলসার প্রতি কোন উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া দেন নি। এবং আমাদের সম্মানিত আলেমদের কোন সম্প্রদায়ের কোন সুযোগ্য ব্যক্তিও (এই সম্মেলনে) তাঁর কোন প্রবন্ধ পড়াবার বা পড়াবার কোন ব্যবস্থা নেননি। তবে, হ্যাঁ, দু' একজন আলেম ‘আমরা এর মধ্যে আছি’- মা নাহনো ফিহা- বলে কদম বাঢ়িয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু উল্টো দিকে। এজন্য তাঁরা হয় এই নির্ধারিত বিষয়-বস্তু নিয়ে কিছু কথাবার্তা বলেছিলেন, নয়তো অর্থহীন কিছু চেঁচামেচি করেছেন মাত্র। বিষয়টা আমরা তুলে ধরবো আমাদের আগামী প্রতিবেদনে। সংক্ষেপে, সম্মেলনের কর্মকাণ্ড থেকে এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে, রইসে কাদিয়ান হ্যরত মির্যা গোলাম আহ্মদ সাহেবেই ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি এই প্রতিযোগিতার ময়দানে ইসলামী বীরত্বের পূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। এবং এই নির্বাচনকে যথার্থ প্রমাণিত করেছেন, যা তাঁকে ইসলামের স্বপক্ষে উকীল নিয়োজিত করার ব্যাপারে পেশাওয়ার, রাওয়ালপিণ্ডি, কিলাম, শাহপুর, ডেরা, খোশহাব, শিয়ালকোট, জম্বু, উজীরাবাদ, লাহোর, অমৃতসর, গুরুন্দাসপুর, লুধিয়ানা, শিমলা, দিল্লী, আওলাদা, রিয়াসতে পাটিয়ালা, ডেরাদুন, মাদ্রাজ, বোম্বাই, হায়দারাবাদ (দাক্ষিণাত্য), বাঙালোর প্রভৃতি হিন্দুস্থানী শহরের বিভিন্ন

ইসলামী ফেরকা বা সম্প্রদায়ের নিকট থেকে যথারীতি স্বাক্ষরিত ওকালত নামার মাধ্যমে কার্যকর করা হয়েছিল। সত্য তো এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে, যদি এই সম্মেলনে হয়রত মির্যা সাহেবের প্রবন্ধ না হতো, তাহলে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সম্মুখে ইসলামপন্থীদের কপালে লাঞ্ছনা ও অনুশোচনার কলঙ্ক অঙ্গীকৃত হতো। কিন্তু খোদার শক্তিশালী হস্ত পরিত্র ইসলামকে পতন থেকে রক্ষা করেছে। উপরন্তু এই প্রবন্ধের বদৌলতে তাকে এমন বিজয় দান করেছে যে, স্বমতাবলম্বীরা তো বটেই, বিরুদ্ধ মতাবলম্বীরাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠেছে, এই প্রবন্ধটি সবার উপরে উত্তীর্ণ, সবার উপরে। এবং প্রবন্ধ পাঠ শেষ হওয়ার সাথে সাথে সত্যানুরাগী অপর সকলের মুখ থেকেও এই কথা উচ্চারিত হচ্ছিল যে, আজ ইসলামের সত্যতা উন্মোচিত হলো, এবং ইসলাম বিজয় লাভ করলো। যে নির্বাচন দিনের আলোকে লক্ষ্য ভেদ করায় সঠিক প্রমাণিত হয়েছে, তাতে বিরুদ্ধবাদীদেরও সন্দেহ প্রকাশের কোন অবকাশ ছিল না। এটাই ছিল আমাদের গৌরব ও আনন্দের কারণ। এবং তা এজন্যই যে, এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে ইসলামের মাহাত্ম্য। আর সত্য তো এটাই। যদিও, এটা ছিল হিন্দুস্থানের বড় বড় ধর্মগুলোর দ্বিতীয় সম্মেলন, তবুও এটা আপন শান ও শওকতে, মর্যাদায় ও মাহাত্ম্যে সারা হিন্দুস্থানের সব কংগ্রেস ও কনফারেন্সগুলোকে হার মানিয়েছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহরের রাইস-নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এই জলসায় শরীক হয়েছিলেন। আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে এটা প্রকাশ করতে চাই যে, আমাদের মাদ্রাজও এতে অংশ গ্রহণ করেছিল। জলসার আকর্ষণ এতটাই বেড়েছিল যে, তা নির্ধারিত তিন দিনের পর আরও একদিন বাড়াতে হয়েছিল। জলসা অনুষ্ঠানের জন্য কমিটির কর্মকর্তারা লাহোরের সব চাইতে বৃহৎ ও প্রশস্ত স্থান ইসলামিয়া কলেজকে বেছে নিয়েছিলেন। কিন্তু, মানুষের সমাগম এত বেশী হয়েছিল যে স্থান সংকুলান হচ্ছিল না। জলসার আয়মত বা মাহাত্ম্যের বড় প্রমাণ এটাই যে, সারা পাঞ্জাবের মহৎ-প্রধান ব্যক্তিরা ছাড়াও চীফকোর্ট ও হাই কোর্ট (এলাহাবাদ)-এর মাননীয় বিচারপতি বাবু প্রতুল চন্দ্র সাহেব এবং মি: বীজ জী সানন্দে জলসায় অংশগ্রহণ করেছিলেন”।

আলোচ্য প্রবন্ধটি লাহোরে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল সাধারণভাবে ‘আন্তঃধর্মীয় সম্মেলনের রিপোর্ট’ নামে। এবং এটি পুস্তকাকারে উর্দ্ধ ও ইংরেজীতে, কয়েক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে জামাতে আহমদীয়ার তরফ থেকে ‘ইসলামী উসুল কি ফিলসফী’ (The Philosophy of the Teachings of Islam) শিরোনামে। এছাড়া এর তর্জমা ফ্রাঙ্ক, ডাচ, স্পেনিশ, আরবী, জার্মান প্রভৃতি ভাষায়ও ইদানীং প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থের উপরে অনেক বড় বড় দার্শনিক এবং বিদেশী পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকীর সম্পাদকরা সারগর্ভ আলোচনা

করেছেন। এবং পাশ্চাত্যের চিন্তাবিদরাও এই বক্তৃতার ভূয়শী প্রশংসা করেছেন।
দৃষ্টান্তস্বরূপ,

১. ‘দি ব্রীটিশ টাইমস্ এ্যান্ড মিরর’ লিখেছে : নিচয় যে ব্যক্তি এইভাবে ইয়োরোপ ও আমেরিকাকে সম্মোধন করতে পারেন, তিনি কোন সাধারণ ব্যক্তি হতে পারেন না।’
২. ‘দি স্পিরিচুল জার্নাল’ বোস্টন, লিখেছে : ‘এই গ্রন্থ মানবজাতির জন্য এক বিশুদ্ধ সুসমাচার।’
৩. ‘দি থিওসফিকাল নোটস’ লিখেছে : ‘এই কিতাব মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ধর্মের উৎকৃষ্ট এবং সর্বাপেক্ষা উত্তম চিন্তাকর্ষক চিত্র।’
৪. ‘দি ইন্ডিয়ান রিভিউ’ লিখেছে : ‘এই গ্রন্থের চিন্তাধারা আলো দ্বারা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দ্বারা পরিপূর্ণ, এবং পাঠকের মুখ থেকে স্বতঃস্পূর্তভাবে এর প্রশংসা উচ্চারিত হয়।’
৫. ‘দি মুসলিম রিভিউ’ লিখেছে : ‘এই গ্রন্থের অধ্যয়নকারী এর মধ্যে অনেক সত্য এবং সূক্ষ্ম এবং অকৃত্রিম এবং জীবন সঞ্চারী চিন্তা-চেতনার সন্ধান পাবে।’

(দ্রঃ হযরত সাহেববাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রাঃ) রচিত
‘সিলসিলায়ে আহমদীয়া’।)

এই প্রবন্ধের বিশেষ সৌন্দর্য হচ্ছে, এতে অপর কোন ধর্মের প্রতি কোন আক্রমণ করা হয় নি। বরং, কেবল ইসলামেরই সৌন্দর্যাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। এবং প্রশ়ঙ্গলির উত্তর শুধু কোরআন মজীদ থেকেই দেওয়া হয়েছে। এবং তা সবই এমনভাবে দেওয়া হয়েছে যার ফলে অন্য সকল ধর্মের উপরে ইসলামের পূর্ণতা, সুন্দরতা এবং উৎকর্ষতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়েছে। *

মাওলানা জালালুদ্দীন শামসুন্নাহ
প্রাক্তন মোবাল্লেগ ও ইমাম,
লন্ডন মসজিদ

* হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মওউদ (আঃ)-এর রচনাবলী - ‘ক্রহানী খায়ায়েন’ -
১০ম খন্ড হতে গৃহীত। বঙ্গানুবাদ : শাহ মুস্তাফিজুর রহমান

সত্যাভেষীগণের জন্য

মহা সুসংবাদ

লাহোর টাউন হলে ২৬, ২৭ ও ২৮শে ডিসেম্বর, ১৮৯৬ ইং তারিখে যে ধর্মীয় মহাসম্মেলন হইবে, উহাতে কুরআন শরীফের কামালাত ও মো'জেয়াত বা সৌন্দর্য ও অলৌকিকতা সম্বন্ধে এই অধমের একটি সন্দর্ভ পাঠ করা হইবে। ইহা সেই সন্দর্ভ, যাহা মানুষের শক্তির উর্ধ্বে, খোদার নির্দর্শনাবলীর মধ্যে এক নির্দর্শন এবং তাহার বিশেষ সাহায্যে লিখিত। ইহাতে কুরআন শরীফের ঐ সব মা'রফাত বা জ্ঞান ও তত্ত্বাবলী লিখিত হইয়াছে, যদ্বারা সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশিত হইবে যে, উহা প্রকৃতপক্ষে খোদার কালাম এবং বিশ্ব-সৃষ্টা বিশ্ব-প্রতিপালক রবুল আলামীনের গ্রন্থ। যে ব্যক্তি এই সন্দর্ভের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর শুনিবেন, আমি নিশ্চিত যে, তাহার মধ্যে এক নৃতন ঈমান পয়দা হইবে; এক নৃতন আলোক তাহার মধ্যে দ্বিষ্ঠ হইয়া উঠিবে এবং খোদাতা'লার পবিত্র কালামের এক সংক্ষিপ্ত অথচ সম্পূর্ণ তফসীর তাহার হস্তগত হইবে। আমার এই বক্তৃতা মানবীয় বৃথা আশ্ফালন ও বাগাড়স্বরের কলঙ্কে কলঙ্কিত নহে। মানব জাতির জন্য আমার অকৃত্রিম সহানুভূতিই আমাকে এই ইশ্তিহার লিখিতে বাধ্য করিতেছে, যেন তাহারা কুরআন শরীফের হস্ত ও জামাল, ইহার পরম রূপ ও সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করে এবং বুঝিতে পারে যে, আমাদের বিরুদ্ধবাদীগণের ইহা কত বড় যুলুম যে, তাহারা অন্ধকারকে ভালবাসে এবং আলোকে ঘৃণা করে। আমাকে সর্বজ্ঞ খোদা এলহাম দ্বারা জানাইয়াছেন যে, ইহা সেই সন্দর্ভ যাহা সকলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিবে এবং ইহার মধ্যে সত্য, হেকমত ও তত্ত্ব-জ্ঞানের এমন অফুরন্ত আলোক আছে যে, যদি অন্য ধর্মের লোকগণ উপস্থিত হইয়া আদ্যোপান্ত ইহা শ্রবণ করে, তবে নিশ্চয় লজ্জিত হইবে। কেননা, কখনও তাহারা, খীষ্টানই হউক, আর্যই হউক, সনাতন ধর্মই হউক অথবা অন্য যে কোন ধর্মাবলম্বীই হউক, তাহাদের ধর্মগত্তগুলি হইতে এই সকল মহান তত্ত্ব ও বিশেষত্ব প্রদর্শন করিতে পারিবে না। কারণ খোদাতা'লা সংকল্প করিয়াছেন যে, এই উপলক্ষ্যে এই পবিত্র গ্রন্থের (কুরআনের) জ্যোতির্বিকাশ হইবে। আমি আলমে-কাশ্ফে অর্থাৎ দিব্য-জগতে ইহার সম্বন্ধে দেখিয়াছি যে, আমার বাড়ীতে অদৃশ্য হইতে একটি হস্ত প্রসারিত হইয়াছে এবং উহার স্পর্শে বাড়ী হইতে এক উজ্জ্বল আলো বিকীর্ণ হইয়া চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়াছে এবং আমার হস্তদ্বয়েও উহার আলো পড়িয়াছে। তখন এক ব্যক্তি আমার নিকটে দাঁড়াইয়াছিল। সে উচ্ছেঃস্বরে বলিল :

اَكْبَرُ خَيْرٍ

‘আল্লাহ মহান, খয়বর-এর পতন ঘটিয়াছে,

ইহার তা’বির (ব্যাখ্যা) এই যে, বাড়ী দ্বারা আমার হৃদয়কে বুঝায়, যাহা আলোকরাজি অবতরণ ও বিকীর্ণ হইবার স্থান এবং সেই আলো কুরআনের মারেফাত বা নিগৃঢ় তত্ত্বজ্ঞান। তারপর, খয়বর দ্বারা সব বিকৃত ধর্ম বুঝায়, যাহার মধ্যে শিরক ও মিথ্যা মিশ্রিত হইয়াছে এবং মানুষকে খোদার স্থান দেওয়া হইয়াছে বা খোদার গুণাবলীকে উচ্চ স্থান হইতে নিশ্চে নিষ্কেপ করা হইয়াছে। অতএব, আমাকে জানান হইয়াছে যে, এই সন্দর্ভ বহুল প্রচারিত হইলে অসত্য ধর্মগুলির অসারতা প্রকাশিত হইয়া পড়িবে এবং কুরআনের সত্যতা দিনে দিনে বিষ্ণে বিস্তৃতি লাভ করিবে, যে পর্যন্ত না উহা পূর্ণত্ব লাভ করে। অতঃপর আমার হৃদয়কে কাশ্ফী অবস্থা হইতে এলহামের দিকে আনা হইল এবং আমি এলহাম প্রাপ্ত হইলাম :

اَنِّ اللَّهُ مَعَكُمْ اَنِّ اللَّهُ يَقُولُ مَا يَنْهَا قَمْتُ

“খোদা তোমার সঙ্গে আছেন, এবং খোদা সেখানেই দাঁড়ান, যেখানে তুমি দাঁড়াও।” ইহা আল্লাহতা’লার সাহায্যের রূপক উক্তি। এখন আমি অধিক লিখিতে চাই না। সকলকে ইহা জানাইয়া দিতেছি যে, আপনাদের ক্ষতি স্বীকার করিয়া হইলেও অবশ্যই এই সকল জ্ঞান-দীপ্তি তত্ত্ব-কথা শ্রবণের জন্য লাহোর সম্মেলনের দিনগুলিতে উপস্থিত হইবেন। সকলের যুক্তি ও বিশ্বাস ইহার দ্বারা এমনভাবে উপকৃত হইবে, যাহা তাঁহারা কখনও কল্পনাও করিতে পারিবে না।

وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ أَتَى بِالْحِكْمَةِ

যে হেদায়াতের অনুসরণ করে, তাহার উপর শাস্তি।

কাদিয়ান

২১শে ডিসেম্বর, ১৮৯৬

খাকসার

গোলাম আহমদ

(মজ্মুয়া ইশ্যতিহারাত : ২য় খণ্ড, ২৯৩-২৯৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
نَّحْمَدُهُ وَنَصَّلٰی عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

ইসলাম

দাবী ও দলিল—প্রমাণ ঐশীগ্রহ হইতে হওয়া জরুরী

আজ এই মোবারক সন্ধেলনে, যাহার উদ্দেশ্য এই যে, ইহাতে প্রত্যেক বক্তা বিজ্ঞাপিত প্রশ়াবলীর সীমার মধ্যে থাকিয়া স্ব স্ব ধর্মের সৌন্দর্য তুলিয়া ধরিবেন, আমি এতদুপলক্ষ্যে ইসলামের সৌন্দর্য বর্ণনা করিব। আমি আমার বক্তব্য আরও করিবার পূর্বে একথা স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করা সমীচীন মনে করি যে, আমি যাহা কিছু বলিব খোদাতা'লার পরিত্র বাণী কুরআন শরীফ হইতে বলিব। কারণ আমার মতে ইহা অত্যন্ত জরুরী যে, যিনি যে গ্রন্থের অনুসারী এবং যে গ্রন্থকে তিনি ঐশীবাণী বলিয়া মান্য করেন, তিনি প্রত্যেক বিষয়ে সেই গ্রন্থের উন্নতি দিয়া উত্তর প্রদান করিবেন এবং তাহার ওকালতি ও বক্তব্যের পরিসীমাকে এত প্রশস্ত করিবেন না যে, তিনি যেন এক নৃতন পুস্তক প্রণয়ন করিতেছেন। সুতরাং আজ যেহেতু আমাকে কুরআন শরীফের সৌন্দর্যকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে এবং ইহার পূর্ণ গুণাবলী প্রদর্শন করিতে হইবে, সেইজন্য ইহা সংগত যে, আমি কোন বিষয়ে ইহার বর্ণনার বাহিরে যাইব না এবং ইহারই ইঙ্গিত, বা স্পষ্ট ব্যাখ্যা অনুযায়ী এবং ইহারই আয়তসমূহের উন্নতি দিয়া আমার বক্তব্যের প্রত্যেকটি উদ্দেশ্যকে লিখিব, যাহাতে শ্রোতা বা পাঠকের পক্ষে তুলনা ও যাচাই করা সহজ হয়। কারণ, যাহারা কোন ঐশী-গ্রন্থের অনুসারী, তাঁহারা আপন আপন ঐশী-গ্রন্থের বর্ণনার অধীনে থাকিয়াই সেই গ্রন্থের উক্তি উপস্থাপন করিবেন। এইজন্য আমি এখানে হাদীসের উল্লেখ ছাড়িয়া দিয়াছি, যদিও সব শুন্দি বা সহীহ হাদীস কুরআন শরীফেরই অনুসারী। কুরআন শরীফ পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ, যাহার মধ্যে সকল গ্রন্থ অন্তর্ভুক্ত ও শেষ হইয়াছে। বস্তুতঃ, আজ কুরআন শরীফের মর্যাদা প্রকাশিত হওয়ার দিন এবং আমরা খোদার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তিনি যেন এই কাজে আমাদের সহায় হন, আমীন।

প্রথম প্রশ্নের উত্তর

মানুষের দৈহিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থা

সম্মানিত শ্রোতৃমণ্ডলী! স্মরণ রাখিবেন যে, এই বিষয় সম্পর্কে প্রথম পৃষ্ঠাগুলিতে ভূমিকারূপে লিখিত কোন কোন কথা আপাতৎ দ্রষ্টিতে অগ্রাসঙ্গিক বোধ হইলেও, মূল উত্তর বুঝিবার পক্ষে এইগুলি প্রথমে হস্যঙ্গম করা খুবই জরুরী। এই জন্য বিষয়াবলীকে সহজবোধ্য করিবার উদ্দেশ্যে, মূল বক্তব্য আরম্ভ করিবার পূর্বে, এই সকল কথা লিখিতে হইল, যাহাতে আসল বিষয় বুঝিতে কষ্ট না হয়।

মানুষের ত্রিবিধ অবস্থা

প্রথম প্রশ্ন হইল মানুষের স্বভাবজ, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থানিচয় সম্বন্ধে। খোদাতা'লার পবিত্র গ্রন্থ কুরআন শরীফ আলোচ্য অবস্থা তিনটির উৎপত্তির তিনটি পৃথক পৃথক উৎস নির্ধারণ করিয়াছে। এইরূপও বলা যাইতে পারে যে, ইহাদের তিনটি উৎস রহিয়াছে, যেগুলি হইতে পৃথক পৃথকভাবে এই তিনটি অবস্থা উৎসারিত হইয়াছে।

প্রথম উৎস নাফসে আশ্মারাহ

প্রথম উৎস, যাহা হইতে সকল স্বভাবজাত অবস্থার উৎপত্তি হয়, উহার নাম রাখিয়াছে কুরআন শরীফ ‘নাফসে-আশ্মারাহ’।

যেমন বলা হইয়াছে :

إِنَّ النَّفَسَ لَامَارَةٌ بِالشُّوءِ (যোসুf : ৫৬)

অর্থাৎ নাফসে আশ্মারাহ বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা মানুষকে মন্দ কাজের দিকে টানিয়া নামায়, যাহা তাহার পূর্ণতার পরিপন্থী ও তাহার নৈতিক অবস্থার বিপরীত। ইহা তাহাকে অন্যায় ও অপসন্দনীয় পথে পরিচালিত করিতে চেষ্টা করে (১২: ৫৪)। বস্তুতঃ সীমা লংঘন ও মন্দ কাজের দিকে যাওয়া মানুষের এক অবস্থা, যাহা নৈতিক অবস্থা প্রাপ্তির পূর্বে স্বভাবতঃ তাহার উপর প্রবল থাকে। এই অবস্থা এই সময় পর্যন্ত সহজাত অবস্থা বলিয়া অভিহিত হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ বুদ্ধি ও তত্ত্ব-জ্ঞানের ছায়ায় চলে; বরং চতুর্পদ জন্মুর ন্যায় পানাহার, শয়ন, জাগরণ বা ক্রেতান ও উন্নেজনা প্রদর্শন প্রভৃতি বিষয়ে সে সহজাত বা প্রবৃত্তির অধীন থাকে। মানুষ যখন বুদ্ধি ও তত্ত্ব-জ্ঞানের প্রেরণায় স্বভাবজ অবস্থায় পরিবর্তন আনয়ন করে এবং বাস্তিত সংযমের প্রতি মনোযোগী হয়, তখন এই অবস্থাত্রয়ের নাম দৈহিক স্বভাবজ অবস্থা থাকে না, বরং এই অবস্থা নৈতিক অবস্থা বলিয়া অভিহিত হয়। এ সম্পর্কে পরে আরও আলোচনা হইবে।

দ্বিতীয় উৎস

নাফ্সে লাউওয়ামাহ

নৈতিক অবস্থার উৎসের নাম কুরআন শরীফে নাফ্সে লাউওয়ামাহ বলা হইয়াছে। যেমন, খোদাতা'লা বলিয়াছেন :

وَلَمْ يَنْفِسْ إِلَّا تَوَمَّأَةً (القيامة، ٣)

অর্থাৎ, “আমি ঐ আত্মার শপথ করিতেছি, যাহা প্রত্যেক অপকর্ম ও সীমা লংঘনে নিজেকে তিরক্ষার করে” (৭৫: ৩)। এই নাফ্সে লাউওয়ামাহ মানুষের অবস্থাসমূহের দ্বিতীয় উৎস। ইহা হইতে নৈতিক অবস্থার উদ্ভব হয়। এই পর্যায়ে মানুষ অন্য প্রাণীর সাদৃশ্য হইতে মুক্তি লাভ করে। এ স্থলে নাফ্সে লাউওয়ামার শপথ, ইহার সম্মানার্থে করা হইয়াছে। অন্য কথায় সে নাফ্সে আস্মারাহ বা অবাধ্য আত্মা হইতে নাফ্সে লাউওয়ামাহ বা তিরক্ষারকারী আত্মায় পরিণত হওয়ায়, এই উন্নতির ফলে আল্লাহতা'লার নিকট মর্যাদা প্রাপ্তির যোগ্য হইয়া যায়। ইহার নাম লাউওয়ামাহ রাখার কারণ ইহা মানুষকে মন্দ কাজে তিরক্ষার করে। এবং ইহা মানুষকে প্রবৃত্তির তাড়নায় বল্গাহীন উটের ন্যায় চলা এবং চুতল্পন্দ জন্মের মত জীবন যাপন করা হইতে নিবৃত্ত করে। বরং ইহা প্রেরণা দেয় যে, মানুষের দ্বারা উত্তম অবস্থা ও উত্তম চরিত্রের প্রকাশ হউক এবং মানব জীবনের কোন কাজে যেন কোন প্রকার অমিতাচার প্রকাশ না পায়। প্রবৃত্তির উভেজনা ও বাসনা যেন যুক্তি ও জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হয়। সুতরাং যেহেতু ইহা অন্যায় আচরণকে তিরক্ষার করে সেই জন্য ইহার নাম নাফসে লাউওয়ামাহ অর্থাৎ অত্যন্ত তিরক্ষারকারী আত্মা। যদিও নাফ্সে লাউওয়ামাহ প্রবৃত্তির উভেজনাকে পসন্দ করে না, এবং নিজেকে ভর্তসনা করিতে থাকে, তথাপি সৎকর্ম সাধনে পূর্ণরূপে সক্ষম হয় না। বরং কোনো কোনো সময়ে প্রবৃত্তির উভেজনা তাহার উপর প্রবল হইয়া পড়ে। তখন তাহার অধঃপতন ঘটে এবং সে পদচ্ছলিত হয়। অন্য কথায়, সে এক দুর্বল শিশুর ন্যায় হইয়া থাকে, যে আছাড় খাইতে না চাহিলেও, দুর্বলতাবশতঃ আছাড় খায়। অতঃপর সে স্বীয় দুর্বলতার জন্য অনুতঙ্গ হয়। মোট কথা ইহা আত্মার সেই নৈতিক অবস্থা, যে অবস্থায় আত্মা নিজের মধ্যে উন্নত নৈতিক গুণাবলীর সমাবেশ করিতে থাকে এবং অবাধ্যতায় অসন্তোষ বোধ করে, কিন্তু তখনও নাফ্সে আস্মারার উপর সম্পূর্ণরূপে বিজয়ী হয় না।

তৃতীয় উৎস

নাফ্সে মুত্মাইন্নাহ

অতঃপর তৃতীয় উৎস, যাহাকে রুহানী অবস্থার মূল উৎস বলা যাইতে পারে, সেই উৎসের নাম কুরআন শরীফে নাফ্সে মুত্মাইন্নাহ রাখা হইয়াছে। আল্লাহত্তা'লা বলিয়াছেন :

يَا أَيُّهَا النَّفَسُ الْمَطْمِئْنَةُ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ رَاضِيًّا مَرْضِيًّا

فَإِذْ هُنَّ فِي عِبْدِنِي وَإِذْ هُنَّ جَنَّتِي - ر.الফجر: ٢٨-٣١

অর্থাৎ, “হে শান্তিপ্রাপ্ত আত্মা ! (যাহা খোদা হইতে শান্তিপ্রাপ্ত হইয়াছ) ! তোমার অভুর নিকট ফিরিয়া আইস। তুমি তাহার প্রতি সন্তুষ্ট এবং তিনি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। সুতরাং আমার বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত হও এবং আমার বেহেশ্তে প্রবেশ কর” (৮৯ : ২৮-৩১)। ইহা সেই মর্যাদাসম্পন্ন অবস্থা, যাহাতে আত্মা যাবতীয় দুর্বলতা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া আধ্যাত্মিক বলে বলীয়ান হয় এবং খোদাতা'লার সহিত নিজেকে একুপ বাঁধনে বাঁধিয়া ফেলে যে তাহাকে ছাড়িয়া জীবন ধারণ করিতে পারে না। পানি যেমন উপর হইতে নীচের দিকে প্রবাহিত হয় এবং পরিমাণে প্রচুর ও গতিপথ বাধাশূন্য হইলে প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়, তেমনই উহা খোদার দিকে ধাবিত হইতে থাকে। ইহারই প্রতি ইংগিত করিয়া আল্লাহত্তা'লা বলিয়াছেন, “হে সেই আত্মা, যাহা শান্তি পাইয়াছ! তাহার দিকে প্রত্যাবর্তন কর।” সুতরাং মৃত্যুর পরে নহে, বরং ইহজীবনেই সে এক মহান পরিবর্তন সাধন করে। অন্য স্থানে নহে বরং ইহজগতেই সে এক বেহেশ্ত প্রাপ্ত হয়। এবং এই আয়াতে যেমন লিখিত আছে, তুমি তোমার ‘রক্র’-এর (প্রতিপালকের) দিকে প্রত্যাবর্তন কর, তেমনি তখন সে খোদা কর্তৃক প্রতিপালিত হয় এবং খোদার প্রেমই তাহার খাদ্য-স্বরূপ হয় এবং সে এই জীবনদায়িনী প্রস্তবণ হইতে পানি পান করে। এইজন্য সে মৃত্যু হইতে মুক্তি লাভ করে। যেমন, অন্যত্র আল্লাহত্তা'লা কুরআন শরীফে বলিয়াছেন :

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا - وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا - ر.الثمس: ١٠-١١

অর্থাৎ “যে ব্যক্তি পার্থিব আবেগসমূহ হইতে তাহার আত্মাকে শুদ্ধ করে, সে রক্ষা পায়। সে ধ্রংস হইবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি পার্থিব আবেগসমূহে, যাহা আসলে স্বভাবজ আবেগসমূহের অন্তর্গত, নিজ সন্তাকে হারাইয়া ফেলে, সে জীবন সম্বন্ধে নিরাশ হইয়াছে” (৯১: ১০-১১)।

বস্তুতঃ এই হইল তিনটি অবস্থা, যাহা অন্য কথায় দৈহিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক অবস্থা বলিয়া আখ্যায়িত হইতে পারে। যেহেতু প্রবৃত্তির উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইলে প্রবল ও তয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করে এবং অনেক সময় নৈতিক চরিত্র ও

আধ্যাত্মিকতার সর্বনাশ সাধন করে, সেহেতু খোদাতা'লার পবিত্র গ্রন্থে ইহাকে নাফ্সে আশ্মারাহ্ বা অবাধ্য আস্তা বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে। যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে, মানুষের দৈহিক প্রবৃত্তিসমূহের উপর কুরআন শরীফের প্রতিক্রিয়া কি এবং উহা এ সম্পর্কে কি নির্দেশ দান করে এবং কার্যতঃ কোথায় লইয়া যাইতে চাহে ? তাহা হইলে, জানা আবশ্যক, কুরআন শরীফের মতে, মানুষের দৈহিক অবস্থা তাহার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থার সহিত অত্যন্ত নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। এমন কি মানুষের পানাহার পদ্ধতিও মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থার উপর ক্রিয়া প্রকাশ করে। যদি প্রবৃত্তিগত অবস্থাসমূহকে শরীয়তের নির্দেশ অনুযায়ী পরিচালিত করা যায়, তাহা হইলে, যেমন কোনো বস্তু লবণের খনিতে পতিত হইলে উহা লবণ হইয়া যায়, তেমনই ঐ সকল অবস্থা নৈতিক অবস্থায় পরিণত হইয়া যায় এবং রূহানীয়তের(আধ্যাত্মিকতার) উপর গভীর ক্রিয়া প্রকাশ করে। এই কারণে কুরআন শরীফ সর্বপ্রকার এবাদতের ক্ষেত্রে, হৃদয়ের পবিত্রতা, ভক্তি ও চিত্ত-বিগলনের উদ্দেশ্যে, দৈহিক পবিত্রতা, দৈহিক আদব এবং সুসঙ্গত দেহ-সঞ্চালনের উপর বিশেষ জোর দিয়াছে। গভীর মনযোগ সহকারে চিন্তা করিলে এই দর্শনই অত্যন্ত সঠিক বলিয়া প্রতীয়মান হয় যে, রূহ্ বা আস্তাৰ উপর দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গভীর প্রভাব রহিয়াছে। যেমন, আমরা দেখিতে পাই যে, আমাদের স্বত্বাবজ ক্রিয়া বাহ্যতঃ দৈহিক হইলেও আমাদের আত্মিক অবস্থার উপর উহার নিশ্চিত প্রভাব রহিয়াছে। দৃষ্টান্তস্থলে, যখন আমাদের চক্ষু কাঁদিতে আরম্ভ করে এবং আমরা যদি চেষ্টা করিয়াও কাঁদি, তখন সঙ্গে সঙ্গে অশ্রুধারা হইতে একটি শোকাগ্নি-শিখা উথিত হইয়া হৃদয়ের মধ্যে নিপতিত হয়। তখন হৃদয়ও চোখের অনুগমনে শোকার্ত হয়। সেইরূপ, যখন আমরা কৃত্রিমভাবে হাসিতে আরম্ভ করি, তখনও হৃদয়ে এক প্রকার প্রফুল্লতা জন্মে। ইহাও দেখা যায় যে, দৈহিক সেজদাও আস্তাৰ মধ্যে একাগ্রতা ও বিনীতভাবের সৃষ্টি করে। ইহার মোকাবিলায়, আমরা ইহাও দেখিতে পাই যে, আমরা ঘাড় উঁচু করিয়া বুক ফুলাইয়া চলিলে, হাঁটার এই ভঙ্গী আমাদের মধ্যে এক প্রকার অহঙ্কার ও আত্মসম্মতিৰ ভাব সৃষ্টি করে। সুতরাং এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, নিশ্চয় আধ্যাত্মিক অবস্থার উপর দৈহিক অঙ্গ-ভঙ্গিও প্রভাব রহিয়াছে।

অনুরূপভাবে অভিজ্ঞতা দ্বারা জানা যায় যে, মানসিক এবং আত্মিক শক্তির উপর বিভিন্ন খাদ্যেরও নিশ্চিত প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। দৃষ্টান্ত স্থলে, একটু চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, যাহারা কখনও মাংস খায় না, তাহাদের বীরত্বের শক্তি ক্রমশঃ ত্রাস পাইতে থাকে। এমন কি, অচিরেই তাহারা অত্যন্ত দুর্বলচিত্ত হইয়া পড়ে এবং খোদাপ্রদণ্ড একটি প্রশংসনীয় শক্তি হারাইয়া ফেলে। ইহার সাক্ষ্য খোদার প্রাকৃতিক বিধানে এইভাবে পাওয়া যায় যে, চতুর্পদ জন্মদের মধ্যে ত্রিগোজী যতগুলি জন্ম আছে, তাহাদের কোনটিই তেমন সাহসী নহে, যেমন

সাহসী মাংসাশী জন্মে। পাথীর মধ্যেও ইহাই লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং ইহাতে সন্দেহ নাই যে, নৈতিক জীবনের উপর খাদ্যের ক্রিয়া ও প্রভাব রয়িয়াছে। অবশ্য, যাহারা দিনে ও রাতে সব বেলাই মাংস আহারের উপর জোর দেয় এবং শাকসজী জাতীয় খাদ্য খুবই অল্প আহার করে, তাহাদের মধ্যে সহিষ্ণুতা ও নম্রতার গুণ কমিয়া যায়। যাহারা মধ্যপন্থী, তাহারা উভয় শ্রেণীর গুণাবলীর উত্তরাধিকারী হয়। এই তত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই খোদাতা'লা কুরআন শরীফে বলিয়াছেন :

كُلُّوا وَاشْرِبُوا وَلَا تُنْسِرُوا . (الاعراف: ٣٢)

অর্থাৎ, মাংসও ভোজন করিবে এবং অন্য দ্রব্যও খাইবে, কিন্তু কোন জিনিসের আহারের ব্যাপারে সীমান্তক্রম করিবে না। যেন উহাতে নৈতিক চরিত্রের উপর মন্দ প্রভাব না পড়ে এবং ইহার আধিক্যের ফলে স্বাস্থ্য হানিও না ঘটে (৭:৩২)। দৈহিক কার্যকলাপের প্রভাব যেমন আত্মার উপর পড়ে, তেমনি আত্মার প্রভাবও দেহের উপর পড়িয়া থাকে। যে ব্যক্তি শোকার্ত হয়, তাহার চক্ষু সজল হইয়া উঠে এবং যে উৎফুল্ল হয়, তাহার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠে। আমাদের পানাহার, শয়ন, জাগরণ, শ্রম, বিশ্রাম, স্নানাদি যত প্রকার স্বাভাবিক কাজকর্ম আছে, ইহাদের সবগুলিই নিশ্চিতরূপে আমাদের আধ্যাত্মিক অবস্থার উপর প্রভাবশীল। আমাদের মানব-প্রকৃতির সহিত আমাদের দৈহিক গঠনের নিবিড় সম্পর্ক রয়িয়াছে। মস্তিষ্কের একস্থানে আঘাত লাগিলে, তৎক্ষণাত্মে স্মরণ শক্তি লোপ পাইতে থাকে এবং অন্যত্র আঘাত লাগিলে চেতনা ও বোধ-শক্তি লোপ পায়। মহামারীর বিষাক্ত হাওয়া অতি দ্রুত দেহের উপর ক্রিয়া করিয়া মনকে আক্রমণ করে এবং দেখিতে দেখিতে সেই অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা, যাহার সহিত সকল নৈতিক বিধান সম্পর্কযুক্ত, চুরমার হইতে থাকে। এমন কি মানুষ পাগল-প্রায় হইয়া কয়েক মিনিটের মধ্যে ইহধাম ত্যাগ করে। বস্তুতঃ দৈহিক আঘাতও আশ্চর্য রকমের অঘটন ঘটায়। এগুলি হইতে প্রমাণিত হয় যে, আত্মা ও দেহের মধ্যে এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান যে, এই রহস্য ভেদ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এই সম্পর্ক সম্বন্ধে, ইহার চাইতে অধিকতর শক্তিশালী দলীল এই যে, মনোযোগ সহকারে চিন্তা করিলে বুঝা যায় যে, দেহই আত্মার জননী। অন্তঃসত্ত্ব স্ত্রীলোকের গর্ভে আত্মা উপর হইতে নিপত্তি হয় না। বরং উহা এক আলোচ্চরূপ, যাহা বীর্যে নিভৃতভাবে গুপ্ত থাকে এবং দৈহিক পুষ্টি সাধনের সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বলতর হইতে থাকে। খোদাতা'লার পবিত্র কালাম (বাক্য) আমাদিগকে এই শিক্ষা দিতেছে যে, আত্মা এই দেহের মধ্যেই বিকশিত হয়; ইহা বীর্য হইতে মাত্রগর্ভে তৈরী হয়। যেমন, তিনি কুরআন শরীফে বলিয়াছেন :

ثُمَّ أَنْشَأَهُ خَلْقًا أَخَرَ، فَتَبَرَّقَ اللَّهُ أَحَسْنُ

الْخَلِقَيْنَ - (المؤمنون: ١٥)

অর্থাৎ, “অতঃপর আমরা এই দেহকে, যাহা মাত্রগতে তৈরী হইয়াছিল, আর এক জন্মের রঙে আনয়ন করি এবং উহার মধ্যে আরও এক সৃষ্টির প্রকাশ করি, যাহা আত্মা (রহ) নামে অভিহিত হয়। খোদা অনন্ত কল্যাণময় এবং এমনই স্বৃষ্টা যে, তাঁহার সমকক্ষ কেহ নাই” (২৩ : ১৫)।

‘এই দেহের মধ্যে আমরা আর এক সৃষ্টির প্রকাশ করি,’ কথাগুলির মধ্যে এক গভীর রহস্য রহিয়াছে, যাহা আত্মার প্রকৃত তত্ত্বকে প্রকাশ করে এবং ঐ সকল একান্ত নিবিড় সম্পর্কের প্রতি ইঙ্গিত করে, যাহা আত্মা ও দেহের মধ্যে বিদ্যমান। এই ইঙ্গিত আমাদিগকে এ কথাও শিক্ষা দেয় যে, মানুষের দৈহিক ক্রিয়া ও কথা-বার্তা এবং যাবতীয় স্বভাবজাত কাজকর্ম যখন খোদাতা’লার উদ্দেশ্যে এবং তাঁহার পথে প্রকাশ পাইতে থাকে, তখন উহার প্রতিও একই ঐশ্বী-দর্শন প্রযোজ্য। অর্থাৎ, এই সকল আন্তরিকতাপূর্ণ আমল বা কর্মসমূহেও শুরু হইতেই একটি আত্মা লুকায়িত থাকে, যেভাবে বীর্যে নিহিত ছিল এবং যতই এই সকল আমলের দেহ তৈরী হইতে থাকে, ততই সেই আত্মা ও উজ্জ্বলতর হইতে থাকে এবং যখন দেহ সম্পূর্ণ তৈরী হইয়া যায়, তখন সহসা সেই আত্মা ও উহার পূর্ণ জ্যোতির্বিকাশ সহ উদ্দীপিত হইয়া উঠে এবং স্বীয় আত্মিক মর্যাদায় নিজ সত্তাকে প্রকাশ করিয়া দেখায়। তখন জীবনের স্পষ্ট স্পন্দন শুরু হইয়া যায়। যখন আমলের পূর্ণ দেহ তৈরী হইয়া যায়, তখন সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের ন্যায় একটা জিনিস উহার ভিতর হইতে স্বীয় প্রকাশ্য জ্যোতিঃ বিকাশ করিতে আরম্ভ করে। ইহা সেই সন্ধিক্ষণ, যাহার স্বক্ষে আল্লাহতা’লা কুরআন শরীফে রূপকভাবে বলিয়াছেনঃ

فَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُزْقِي

فَقَعُوا لَهُ سَجِدِينَ - (الحجر، ٣٠)

অর্থাৎ, “যখন আমি উহার কলেবর তৈরী সম্পূর্ণ করিলাম এবং জ্যোতির্বিকাশের সকল ব্যবস্থাপনাকে সুসম্পন্ন করিলাম এবং আমার রহ উহার মধ্যে ফুঁকিয়া দিলাম, তখন তোমরা সমগ্র মানবমণ্ডলী উহার জন্য ভূমির উপর সিজদায় প্রণত হও” (১৫ : ৩০)। সুতরাং এই আয়াতে এই ইশারাই রহিয়াছে যে, আমলের সম্পূর্ণ কলেবর যখন তৈরী হইয়া যায়, তখন উহার মধ্যে সেই রহ উদ্দীপিত হইয়া উঠে, যাহাকে খোদাতা’লা আপন সত্তার দিকে সম্পর্কযুক্ত করিয়াছেন। কারণ পার্থিব জীবনের বাসনা কামনাকে বিলীন করিয়া দিবার পর, সেই অবয়ব তৈরী হয়। এইজন্য ঐশ্বী আলো, যাহা মৃদু ছিল, হঠাৎ জলিয়া উঠে। তখন ইহা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়ে যে, খোদার এহেন মহিমা দর্শনে যেন সকলেই সিজদা করে এবং তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হয়। সুতরাং সকলেই এই জ্যোতিঃ দর্শনে সিজদা করে এবং স্বভাবের টানে উহার দিকে অগ্রসর হয়, কেবল মাত্র ইবলীস ছাড়া, যে অন্ধকারকেই ভালবাসে।

আত্মার সৃষ্টি হওয়া বিষয়ে

আবার আমি প্রথম কথার দিকে প্রত্যাবর্তন করিতেছি। ইহা একান্ত সঠিক ও সত্য যে, আত্মা এক সূক্ষ্ম জ্যোতিঃ, যাহা এই দেহাভ্যন্তরেই জন্মে এবং মাত্গভৰ্ত্তে প্রতিপালিত হয়। জন্মিবার অর্থ এই যে, প্রথমে গুপ্ত থাকে এবং অনুভূত হয় না। পরে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। গোড়া হইতে ইহার উপাদান বীর্যের মধ্যে বিদ্যমান থাকে। নিঃসন্দেহে উহা স্বর্গের খোদার অভিপ্রায়ে, তাঁহার অনুমতিতে ও তাঁহার ইচ্ছায় এক অজ্ঞাত অবস্থায় রহস্যাবৃতভাবে বীর্যের সহিত সম্পর্কযুক্ত হয়। ইহা বীর্যের এক উজ্জ্বল আলোকময় অবস্থা। আমি বলিতে পারি না, ইহা বীর্যের সেইরূপ অংশ, যেরূপ প্রত্যঙ্গ দেহের অংশ। কিন্তু ইহাও আমি বলিতে পারি না যে, ইহা বাহির হইতে আসে বা ভূমিতে পতিত হইয়া বীর্যের মূল ধাতুর সহিত মিশ্রিত হয়। বরং ইহা বীর্যে প্রচন্ড থাকে, যেমন পাথরে আগুন প্রচন্ড থাকে। খোদার কেতাব ইহার সমর্থন করে না যে, আত্মা স্বতন্ত্রভাবে আকাশ হইতে অবতীর্ণ হয় বা নভোমণ্ডল হইতে পৃথিবীতে নিপতিত হয় এবং দৈবক্রমে বীর্যের সহিত মিলিত হইয়া মাত্গভৰ্ত্তে প্রবেশ করে। বরং এই ধারণা কোন মতেই সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। যদি আমরা এই প্রকার ধারণার বশবর্তী হই, তাহা হইলে প্রাকৃতিক নিয়ম আমাদিগকে ভ্রান্ত বলিয়া সাব্যস্ত করিবে। আমরা রোজ প্রত্যক্ষ করি যে, বাসী ও পচা খাদ্য দ্রব্য এবং পচা যথমে সহস্র সহস্র জীবাণু জন্মে; ময়লা কাপড়ে শত শত উকুন হয়। মানুষের পেটেও ক্রিমি জন্মে। আমরা কি বলিতে পারি যে, এসব বাহির হইতে আসে বা আকাশ হইতে কেহ ইহাদিগকে নিষ্কেপ করে? সূতরাং সত্য কথা এই যে, আত্মা দেহ হইতেই উদ্গত হয় এবং এই প্রমাণ দ্বারাই ইহার সৃষ্টি হওয়া সাব্যস্ত হয়।

আত্মার দ্বিতীয় জন্ম

এখন আমরা বলিতে চাই, যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাঁহার অপার মহিমায় আত্মাকে দেহ হইতে উদ্গত করেন, তাঁহার অভিপ্রায় ইহাই ছিল বলিয়া প্রতীয়মান হয় যে, আত্মার দ্বিতীয় জন্মও দেহের মাধ্যমেই প্রকাশিত হউক। আত্মার স্পন্দন আমাদের দেহের স্পন্দনের উপর নির্ভরশীল। যে দিকে আমরা দেহ সঞ্চালিত করি, আত্মা ও সেই দিকে নিশ্চিতভাবে পশ্চাদানুসরণ করিয়া চলে। এজন্য মানুষের স্বভাবজ অবস্থার প্রতি মনোযোগ দেওয়া খোদাতা'লার সত্য গ্রহের কাজ। এই কারণেই কুরআন শরীফে মানুষের স্বভাবজ অবস্থার ইস্লাহের (সংশোধনের) জন্য বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে। মানুষের হাসি-কানা,

পানাহার, শয়ন, কথা বলা, চুপ থাকা, বিবাহ করা, কৌমার্য অবলম্বন করা, চলা ফেরা, অবস্থান করা, বাহ্যিক পবিত্রতা ও স্নানাদির শর্ত পালন করা, স্বাস্থ্যের বিধান মান্য করা, অসুস্থ অবস্থায় বিশেষ বিশেষ নিয়ম পালন করা, এই সকল বিষয়ের নির্দেশ কুরআন শরীফে লিখিত আছে ; এবং মানুষের দৈহিক অবস্থা আধ্যাত্মিক অবস্থার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে বলিয়া উহা নির্ধারিত করিয়াছে। এই সমুদয় নির্দেশ বিস্তারিতভাবে লিখা হইলে, আমার মনে হয় না যে, এই প্রবন্ধ পাঠের জন্য যথেষ্ট সময় পাওয়া যাইবে ।

মানুষের ক্রমাগত উন্নতি

আমি যখন খোদার পবিত্র বিধান নিয়া চিন্তা করি, তখন দেখিতে পাই যে, তিনি তাঁহার শিক্ষায়, প্রথমে মানুষের দৈহিক ও স্বাভাবিক অবস্থার সংক্ষারের বিধান প্রদান করিয়া, পরে তাহাকে ক্রমশঃ উর্ধ্ব দিকে আকর্ষণ করিয়াছেন এবং তাহাকে সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থা পর্যন্ত পৌঁছাইতে চাহিয়াছেন। এই জ্ঞানগর্ত বিধান দেখিয়া আমার মনে হয় যে, প্রথমে খোদা চাহিয়াছেন, মানুষকে উঠা-বসা, পানাহার, কথাবার্তা এবং সামাজিক জীবন যাপনের সর্বপ্রকার নিয়ম শিক্ষা দিয়া, তাহাকে অসভ্য আচরণ হইতে মুক্তি দান করেন এবং পশুসদৃশ অবস্থা হইতে সম্পূর্ণরূপে আলাদা করিয়া লইয়া, নিম্ন পর্যায়ের এক নৈতিক অবস্থা শিক্ষা দেন, যাহা আদব ও শিষ্টাচার নামে অভিহিত হওয়ার উপযোগী। তারপর, মানুষের স্বভাবজাত অভ্যাসকে, অন্য কথায় যাহাকে নিম্নস্তরের চরিত্র বলা যাইতে পারে, সুষ্ঠু অবস্থায় আনেন, যাহাতে উহা সুনিয়ন্ত্রিত ও সুসমঞ্জস হইয়া উন্নত চরিত্রের রূপ পরিগ্রহ করে। কিন্তু এই উভয় পস্থাই প্রকৃতপক্ষে এক। কারণ উহা প্রকৃতিগত অবস্থার ইস্লাহ(সংশোধন) মাত্র। শুধু উচ্চ ও নিম্ন পর্যায়ের পার্থক্য ইহাদিগকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে ; এবং সেই পরম প্রজ্ঞাময় খোদা, নৈতিক ব্যবস্থাকে এমনভাবে পেশ করিয়াছেন যে, তদ্বারা মানুষ চরিত্রের সর্বনিম্ন স্তর হইতে সর্বোচ্চ স্তরে উন্নতি লাভ করিতে পারে ।

তারপর, তৃতীয় পর্যায়ে উন্নতির জন্য এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, মানুষ তাহার স্বষ্টার প্রেম ও সন্তুষ্টিতে বিলীন হইয়া যাইবে এবং তাহার সমস্ত অস্তিত্ব খোদার জন্য হইয়া যাইবে। এই সেই মর্যাদা, যাহা স্মরণ করাইতে মুসলমানদের ধর্মের নাম ইসলাম রাখা হইয়াছে। কারণ, ইসলামের অর্থ এই যে, সম্পূর্ণভাবে খোদার হইয়া যাওয়া এবং নিজের বলিতে কিছুই বাকী না রাখা । যেমন, আল্লাহ জাল্লা জালালুহু বলিয়াছেন :

بَلِّي مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُخْسِنٌ فَلَهُ أَجْرٌ
 إِنَّمَا يَعْلَمُ مَا فِي الْأَنْفُسِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
 قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ - لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ
 وَآتَنَا أَوْلَى الْمُسْلِمِينَ - (الانعام: ١٤٣-١٤٤)

وَآتَنَّهُمْ هَذَا صِرَاطِنَا مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَشْبِعُوا
 السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ - (الانعام: ١٥٤)
 قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحْبِّبُونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوهُ فِي هَذِهِنَّكُمْ أَنَّ اللَّهُ دَيْفَنَ
 تَحْكُمُ ذُنُوبَكُمْ وَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ عَنِ الْجِنْحِنِ - (آل عمران: ٣٢)

অর্থাৎ “মুক্তি প্রাপ্ত সেই, যে তাহার অস্তিত্বকে খোদার জন্য বিলীন করিয়া দেয় এবং খোদার পথে কুরবানীস্বরূপ রাখিয়া দেয়। শুধু নিয়ত দ্বারাই নহে, বরং সৎকর্ম দ্বারা ও তাহার প্রতিদান খোদার নিকট নির্ধারিত হইয়া থাকে। এই প্রকার ব্যক্তিদের জন্য কোন ভয় নাই এবং তাহারা শোকার্ত হইবে না (২৪১১৩)। বল, আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মৃত্যু সবই সেই খোদার জন্য, যাহার রবুবিয়ত(প্রতিপালনকারী গুণ) সকল বস্তুকেই বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। কোন বস্তু এবং কোন ব্যক্তি তাহার অংশীদার নহে। আমার প্রতি আদেশ হইয়াছে, আমি যেন ইহাই করি এবং ইসলামে যথার্থ অর্থে প্রতিষ্ঠিত হই অর্থাৎ খোদার পথে আপন অস্তিত্বকে কুরবানী করিতে সকলের অগ্রণী হই (৬৪১৬৩-১৬৪)। ইহাই আমার পথ। অতএব, আইস আমার পথ অবলম্বন কর। ইহার বিরোধী কোন পথ অবলম্বন করিও না। অন্যথায়, খোদা হইতে দূরে সরিয়া পড়িবে (৬৪১৫৪)। জনগণকে বলিয়া দাও, যদি তোমরা খোদাকে ভালবাস, তবে আইস আমার অনুগমন কর এবং আমার পথে চল, যেন খোদাও তোমাদিগকে ভালবাসেন, তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু (৩৪৩২)।”

স্বভাবজ অবস্থা ও নৈতিক অবস্থার মধ্যে পার্থক্য এবং জীব হত্যার অপবাদ খণ্ডন

এখন আমরা মানুষের এই তিনি স্তরের বা অবস্থার পৃথক পৃথক আলোচনা করিব। কিন্তু প্রথমে ইহা স্বরণ করাইয়া দেওয়া প্রয়োজন যে, স্বভাবজ অবস্থা, যাহার উৎস নাফ্সে আশ্মারাহ, তাহা খোদাতা'লার পবিত্র কালামের ইঙ্গিত অনুযায়ী নৈতিক অবস্থা হইতে স্বতন্ত্র কিছু নহে। কারণ, খোদার পবিত্র কালাম যাবতীয় স্বভাবজ বৃত্তিসমূহ এবং দৈহিক বাসনা-কামনাসমূহকে স্বভাবজ অবস্থার সহিত সমশ্রেণীভুক্ত করিয়াছে। এই বৃত্তিশুলি যখন সদিচ্ছা প্রণোদিত হইয়া উপযুক্ত ক্ষেত্রে কাল ও পাত্র অনুযায়ী প্রযুক্ত হয়, তখন উহারা উত্তম নৈতিক চরিত্রে পরিণত হয়। তেমনি নৈতিক অবস্থা আধ্যাত্মিক অবস্থা হইতে ভিন্ন কিছু নহে, বরং ঐ সমস্ত নৈতিক অবস্থাই পূর্ণ মাত্রায় ফানাফিল্লাহ (আল্লাহতে বিলীন হওয়া), তায়কিয়ায়ে নফস (আত্মশুন্দি), এনকেতা-ইলাল্লাহ (সংসার- বিমুখ হইয়া আল্লাহহুর্মুর্থী হওয়া) পূর্ণ প্রেম, পূর্ণ আত্মবিলীনতা, পূর্ণ স্বষ্টি ও প্রশান্তি এবং আল্লাতা'লার সহিত পূর্ণ সখ্য স্থাপন দ্বারা রুহানী রূপ গ্রহণ করে। স্বভাবজ অবস্থা যে পর্যন্ত নৈতিক অবস্থায় পরিণত না হয়, মানুষ কিছুতেই প্রশংসার যোগ্য হয় না। কারণ উহা অন্য প্রাণী এমনকি অচেতন পদার্থেও পাওয়া যায়। শুধু নৈতিকতা অর্জন দ্বারাও মানুষ আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করিতে পারে না। বরং কোন ব্যক্তি খোদাতা'লার অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিয়াও উত্তম নৈতিকতা প্রদর্শন করিতে পারে। চিত্তের ন্যূনতা, সহিষ্ণুতা, শান্তি-প্রিয়তা, অনিষ্টকারিতা পরিহার, দুষ্টের মোকাবেলাতে না আসা, এই সব স্বভাবজ অবস্থা, এবং এমন বিষয় যাহা এমন অযোগ্য ব্যক্তির মধ্যেও থাকিতে পারে, যে মুক্তির মূল উৎস হইতে বঞ্চিত এবং প্রকৃত মুক্তি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। অনেক চতুর্পদ জন্মকে নিরীহ দেখা যায়। লালিত পালিত হইলে তাহারা শান্ত-স্বভাব দেখায়। এমন কি তাহাদিগকে চাবুকের পর চাবুক মারিলেও তাহারা প্রতিরোধ করে না। এই সব স্বভাবের অধিকারী হওয়ার কারণে, তাহাদিগকে উন্নত মানুষ বলা তো দূরের কথা, মানুষ নামেও আখ্যায়িত করা যায় না। অনুরূপভাবে মন্দ হইতে মন্দতর বিশ্বাস-সম্পন্ন ব্যক্তি, বরং কোন কোন জঘন্য কুক্রিয়াশীল ব্যক্তিও উক্ত গুণাবলীর অধিকারী হইতে পারে। ইহা সম্বৰ্প যে, মানুষ দয়ার এমন সীমানায় পৌঁছিতে পারে যে, যদি তাহার নিজের যখনে পোকা জন্মায়, তবু উহাদেরকে হত্যা করা পদ্ধতি করিবে না এবং জীবের প্রতি এরূপ মমতাশীল হইতে পারে যে, তাহার মাথার উকুন, বা পাকাশয়ে, অন্ত্রে এবং মস্তিষ্কে যে সকল ক্রিমি বা জীবাণু জন্মে উহাদিগকেও কষ্ট দিতে চাহিবে না। বরং আমি ইহাও স্বীকার করিতে প্রস্তুত যে,

কাহারও দয়া এমন পর্যায়ে পৌছিতে পারে যে, সে মধু পান ত্যাগ করিয়া দিবে। কারণ অনেক প্রাণী নাশ করিবার পর এবং বেচারী মধু মঞ্চিকাসমূহকে স্থানচ্যুত ও বিক্ষিপ্ত করিবার পর মধু পাওয়া যায়। আমি ইহাও স্বীকার করি যে, কেহ মৃগ-নাভির ব্যবহারও এই জন্য ত্যাগ করিতে পারে যে, উহা অসহায় হরিণীর রক্ত ঝরাইয়া এবং বেচারীকে হত্যা করিয়া উহার শাবক হইতে বিছিন্ন করার পর সংগ্রহ করা হয়। তেমনি আমি ইহাও অস্বীকার করি না যে, কেহ মুক্তা ব্যবহার এবং রেশমী বস্ত্র পরিধান করা ছাড়িয়া দিবে, কারণ এই উভয় বস্তুই নিরীহ কীটসমূহকে হত্যা করিয়া পাওয়া যায়। বরং আমি ইহাও মানিতে প্রস্তুত যে, কেহ ক্লেশের সময় জোক লাগানো হইতে বিরত থাকিবে, এবং নিজে দুঃখ সহ্য করিবে, তবু বেচারা জোকের মৃত্যু কামনা করিবে না। পরিশেষে, কেহ স্বীকার করুক বা না করুক, আমি স্বীকার করি যে, কেহ দয়ার পরাকার্ষা দেখাইয়া পানি পান করাও পরিত্যাগ করিতে পারে এবং এইভাবে পানির মধ্যে অবস্থিত জীবাণুসমূহকে রক্ষা করিতে যাইয়া নিজে মৃত্যুবরণ করিতে পারে। আমি এ সবই স্বীকার করিতেছি। কিন্তু আমি কখনও ইহা স্বীকার করিতে পারি না যে, এইসব স্বভাবজ অবস্থা নৈতিকতা বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে, কিংবা শুধু এইগুলি দ্বারা চিত্তের সমস্ত ময়লাই খোত হইতে পারে, যাহার বিদ্যমানতা খোদা-মিলনের পরিপন্থী। আমি কখনও ইহা বিশ্বাস করিব না যে, এই প্রকার নিরীহভাব এবং অন্যের ক্ষতি সাধন হইতে বিরত থাকার দিক হইতে কোনো কোনো চতুর্পদ জন্ম এবং পাথীকে হার মানাইলেও এগুলি উচ্চাঙ্গের মানবতা অর্জনে সাহায্য করিতে পারে। বরং আমার মতে ইহা প্রাকৃতিক নিয়মের সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহা প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধের শামিল। যে সকল উচ্চ নৈতিক গুণাবলী আল্লাহত্তা'লার 'রেয়া' বা সন্তুষ্টি লাভের জন্য একান্ত প্রয়োজন, সেগুলির সাথে ইহার কোন সামঞ্জস্য নাই। ইহা বরং আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামতকে অস্বীকার করার শামিল। প্রকৃত রূহানিয়াৎ (আধ্যাত্মিকতা), প্রত্যেক নৈতিক গুণকে স্থান, কাল ও পাত্র অনুযায়ী সঠিকভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে অর্জিত হয়।

খোদাতা'লার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বস্ততার সহিত চলিয়া, তাঁহারই হইয়া যাওয়ার ফলে আধ্যাত্মিকতা প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি এইভাবে তাঁহারই হইয়া যায়, সে তাঁহাকে ছাড়িয়া জীবন ধারণই করিতে পারে না। তত্ত্বদর্শী মানব বা আরেফ ব্যক্তি আল্লাহর হাতে উৎসর্গীত এক মৎস্য বিশেষ, আল্লাহর ভালবাসার পানিই তাহার জীবিকা।

ইসলাহের (সংশোধনের) তিনটি পদ্ধতি

ইসলাহের চরম প্রয়োজনের সময়ে আঁ হ্যরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব

এখন আমি পূর্বেলিখিত বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করিতেছি। আমি বলিয়াছি যে, মানুষের অবস্থাসমূহের মূল উৎস তিনটি। অর্থাৎ, ‘নাফ্সে আম্বারাহ’ (অবাধ্য আত্মা), নাফ্সে লাউওয়ামাহ (তিরক্ষারকারী আত্মা) এবং নাফ্সে মৃৎমাইন্নাহ (শান্তি-প্রাপ্ত আত্মা) এবং ইসলাহ বা শুন্দির পথও তিনটি। প্রথমতঃ হিতাহিত জ্ঞানশৃঙ্গ অসভ্য মানুষকে নিম্ন স্তরের নীতির উপর কায়েম করিতে হইবে, যেন সে পানাহার এবং বিবাহাদি সামাজিক ব্যাপারে মানবোচিত নিয়মে চলে। সে উলঙ্গ বিচরণ করিবে না; কুকুরের মত মৃত খাইবে না এবং অন্য কোন প্রকার অনাচার করিবে না। প্রবৃত্তির সংক্ষার কার্যে ইহা সর্ব নিম্ন স্তরের ইসলাহ। ইহা এই প্রকারের ইসলাহ যে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, পোর্ট ব্ল্যায়ারের জংলী মানুষের মধ্যে কাহাকেও মানবতার প্রয়োজনীয় উপাদান শিক্ষা দিতে হইলে, প্রথমে ছোটখাট মানবোচিত নীতি এবং শিষ্টাচারের পছ্ন্য শিক্ষা দিতে হইবে।

ইসলাহের দ্বিতীয় পছ্ন্য এই যে, মানবতার সাধারণ বাহ্যিক শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়ার পর তাহাকে মানবতার উন্নতমানের নীতিসমূহ শিক্ষা দিতে হইবে এবং মানুষের বৃত্তিসমূহে নিহিত শক্তিসমূহকে উপযুক্ত ক্ষেত্রে ও সময়ে ব্যবহার করিবার শিক্ষা দিতে হইবে।

তৃতীয় পর্যায়ে সংক্ষার সাধনের পছ্ন্য এই যে, যাহারা উন্নত চরিত্রের অধিকারী হইয়া সাধু সাধকের মত হইয়াছে, তাহাদিগকে প্রেম সুধা এবং ঐশ্বী মিলনের স্বাদ গ্রহণ করাইতে হইবে। ইসলাহের এই তিন পছ্ন্যাই কুরআন শরীফে বর্ণিত হইয়াছে।

আমাদের নেতা ও প্রভু নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এমন সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, যখন পৃথিবী সকল দিক হইতেই খারাপ ও নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। যেমন আল্লাহত্তা'লা বলিয়াছেন :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ - رِبْرَوْم : ১১৪

অর্থাৎ, “জঙ্গলও বিগড়াইয়াছে, দরিয়াও বিগড়াইয়াছে” (৩০ : ৪২)। একথা ইংগিত করিতেছে যে, যাহারা গ্রন্থধারী বলিয়া দাবী করে, তাহারাও বিকৃত হইয়াছে এবং অন্য সব মানুষ, যাহারা ঐশ্বী বারিধারা লাভ করে নাই, তাহারাও বিকৃত হইয়াছে। সুতরাং কুরআনের কাজ ছিল মূলতঃ মৃতদিগকে জীবিত করা। যেমন আল্লাহত্তা'লা বলিয়াছেন :

إِعْلَمْتَنَا أَنَّ اللَّهَ يُخْرِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِنَا - (الْمُعَدِّدः ١٨)

অর্থাৎ “অবহিত হও, এখন আল্লাহতা’লা পৃথিবীকে উহার মৃত্যুর পর নতুনভাবে জীবিত করিতে চলিয়াছেন” (৫৭ : ১৮)। এই সময়ে আরবের অবস্থা বর্বরতার নিম্নতম স্তরে গিয়া পৌছিয়াছিল। মানবতার কোন লক্ষণই তাহাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল না। সকল প্রকারের পাপ তাহাদের দৃষ্টিতে শুধার বিষয় ছিল। এক এক ব্যক্তি শত শত বিবাহ করিত। নিষিদ্ধ খাদ্য ভক্ষণ তাহাদের নিকট শিকারের খাদ্যের ন্যায় ছিল। মাতার সহিত বিবাহ বৈধ বলিয়া বিবেচিত হইত। এই জন্যই আল্লাহতা’লাকে বলিতে হইয়াছিল :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمْهَاتُكُمْ - (الْتَّاءَ : ٤٤)

অর্থাৎ, “আজ তোমাদের মাতাদিগকে তোমাদের জন্য হারাম(নিষিদ্ধ) করা হইল” (৪ : ২৪)। অনুরূপভাবে তাহারা মৃতদেহ ভক্ষণ করিত এবং মানুষের মাংস খাইত। পৃথিবীতে এমন কোন পাপ নাই, যাহা তাহারা করিত না! অধিকাংশ ব্যক্তি পরকালে অবিশ্বাসী ছিল। তাহাদের মধ্যে অনেকেই খোদার অস্তিত্বও স্বীকার করিত না। কন্যাদিগকে স্বহস্তে হত্যা করিত। এতিমদিগকে বঞ্চিত করিয়া তাহাদের ধন-সম্পদ আঘসাণ করিত। যদিও তাহারা দেখিতে মানুষ ছিল, তথাপি তাহাদের জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পাইয়াছিল। তাহাদের লজ্জা-শরম ও আত্মর্যাদাবোধ ছিল না। তাহারা পানির ন্যায় মদ্য পান করিত। সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যতিচারী ব্যক্তি জাতির প্রধান বলিয়া গণ্য হইত। অঙ্গতা এত অধিক ছিল যে, চারিদিকের সকল জাতি তাহাদের নাম ‘উমি’ (নিরক্ষর) রাখিয়াছিল। ঠিক এমনি সময়ে এবং এই প্রকারের জাতিসমূহের ইসলাহের জন্য আমাদের নেতা ও প্রভু নবী সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লাম মক্কা শহরে আবির্ভূত হন। অতএব, যে তিনি প্রকার শুন্দির কথা আমি বলিয়া আসিলাম, এগুলির প্রকৃত প্রয়োজনীয়তা ছিল। এই কারণেই কুরআন শরীফ পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম ধন্ত্বের তুলনায় পূর্ণাঙ্গীন ও সমগ্র হওয়ার দাবী করে। কারণ, ভূ-পৃষ্ঠস্থ অন্য কোন ধর্ম পুস্তকই এই ত্রিবিধি সংস্কার সাধনের সুযোগ পায় নাই। কেবল কুরআন শরীফেরই এই সুযোগ ঘটিয়াছিল। কুরআন শরীফের উদ্দেশ্য ছিল জনগণকে পশুর স্তর হইতে মানুষের স্তরে উন্নীত করা, মানুষকে নৈতিক মানুষে উন্নীত করা এবং নৈতিক মানুষকে খোদা-প্রাপ্ত মানুষ করা। এই জন্য কুরআন শরীফ এই তিনটি বিষয় সম্বলিত গ্রন্থ।

কুরআনের শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ত্রিবিধি ইস্লাহ (সংশোধন) সাধনঃ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে স্বভাবজ অবস্থাকে নৈতিকতায় রূপ দান

স্বভাবজ অবস্থার ইস্লাহের বিস্তারিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে আমি ইহারও আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করি যে, কুরআন শরীফে এমন কোন শিক্ষা নাই, যাহা বাধ্য হইয়া অতিকষ্টে মানিতে হয়। কুরআনের উদ্দেশ্য শুধু ত্রিবিধি সংস্কার। ইহা সকল শিক্ষার সার। অবশিষ্ট যাবতীয় আদেশ এই তিনি প্রকার সংস্কারের জন্য উপাদানস্বরূপ। স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য ডাঙ্গারকে কখনও কখনও অঙ্গোপচার করিতে হয়, আবার কখনও মলম লাগাইতে হয়; তেমনি কুরআনের শিক্ষা মানুষের প্রতি সহানভূতিসম্পন্ন হইয়া এই সব উপাদানকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়াছে। ইহার বর্ণিত যাবতীয় তত্ত্ব, যাবতীয় জ্ঞান ও দর্শন এবং উপদেশ ও নির্দেশাবলীর প্রকৃত উদ্দেশ্য হইতেছে মানুষকে স্বভাবজ অবস্থা হইতে, যাহার মধ্যে বর্বরতার রং রহিয়াছে, তাহা নৈতিক অবস্থায় উন্নত করা এবং নৈতিক অবস্থা হইতে আধ্যাত্মিকতার সীমাহীন সমুদ্র পর্যন্ত পৌছাইয়া দেওয়া।

ইতিপূর্বে আমি বলিয়া আসিয়াছি, স্বভাবজ অবস্থা নৈতিক অবস্থা হইতে স্বতন্ত্র কিছু নহে, বরং ইহা সেই অবস্থা, যাহা নিয়ন্ত্রিত হইয়া যথাক্ষেত্রে, যথাসময়ে প্রযুক্ত হইলে এবং যুক্তি ও বিবেচনার সহিত প্রয়োগ করিলে, নৈতিক অবস্থার রূপ ধারণ করে। যতক্ষণ পর্যন্ত না স্বভাবজ অবস্থা, বিচারবুদ্ধি ও তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত উহা যে কোনো চরিত্রের সাদৃশ্য রাখুক না কেন, উহা নৈতিক চরিত্র নহে। বরং যেমন প্রভুর প্রতি কোন কুকুরের বা ছাগলের ভালবাসা ও ন্যূনতা দেখিয়া আমরা সেই কুকুরকে ভদ্র বলি না এবং ছাগলকেও সদাচারী আখ্যা দিই না, তেমনিভাবে এক ভল্লুক বা ব্যাঘকে উহাদের হিংস্রতার জন্য অশিষ্ট বলি না। আমরা পূর্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে, স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনাপূর্বক যুক্তি, বিচার, বুদ্ধি ও বিবেক খাটাইয়া করা না হইলে, সেই কাজ নৈতিকতার আওতায় পড়ে না বা ঐ কাজকে নৈতিক কাজ বলা যায় না। যে ব্যক্তি বিচার-বুদ্ধি ও উপায় অবলম্বন না করিয়া কাজ করে, সে যথোচিত দুংশ-পোষ্য সেই শিশুর ন্যায়, যাহার মন ও মস্তিষ্কের উপর এখনও বুদ্ধি বা যুক্তির ছায়াপাত হয় নাই; বা সে উন্নাদের ন্যায়, যে তাহার বুদ্ধি ও বিচার-শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে। ইহা দেখা যায় যে, দুংশ-পোষ্য শিশু ও পাগল কোনো কোনো সময় এমন আচার-ব্যবহার করে, যাহা শিষ্টাচারের অনুরূপ। কিন্তু কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি ইহার নাম শিষ্টাচার রাখিবে না। কারণ এই প্রকারের ক্রিয়া বিবেচনা ও ক্ষেত্রজ্ঞানের প্রস্তবণ হইতে নির্গত হয় না, বরং সহজাত প্রবৃত্তির গতিধারায় প্রকাশিত হয়; যেমন মানব শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া মাত্স্নের দিকে তার

মুখ বাড়ায়, মুরগীর বাচ্চা জন্মিয়াই শস্য-কণা ঠোকরাইয়া খাইবার জন্য দোড়ায়। জেঁকের বাচ্চার মধ্যে জেঁকের স্বভাব নিহিত থাকে, সাপের বাচ্চা সাপের স্বভাব প্রকাশ করে এবং ব্যাস্ত শাবক ব্যাস্তের প্রকৃতি প্রদর্শন করে। অতএব মানব শিশুর প্রতি গভীর মনোনিবেশ সহকারে দেখা কর্তব্য যে, সে জন্মিবামাত্র কীভাবে মানুষের স্বভাব দেখাইতে আরম্ভ করে। তারপর তাহার বয়স এক বৎসর দেড় বৎসর হইলে, তাহার মধ্যে সহজাতস্বভাব বেশী স্পষ্ট হইয়া ওঠে। দৃষ্টান্তস্থলে, সে পূর্বে যেভাবে কান্দিত, এখন তাহার ক্রন্দন পূর্বাপেক্ষা কতকটা উচ্চ হয়। তেমনি তাহার হাসি অটহাস্যের পর্যায়ে পৌছে এবং চোখেও ইচ্ছা-পূর্বক দেখার লক্ষণ জন্মে। এই বয়সে তাহার মধ্যে আরো একটা স্বাভাবিক আচরণের স্ফুরণ ঘটে। সে তাহার সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি অঙ্গ-ভঙ্গির দ্বারা প্রকাশ করে। সে কাহাকেও মারে এবং কাহাকেও কিছু দিতে চায়। কিন্তু এই সব ক্রিয়াই মূলতঃ সহজাত। এইভাবে শিশুর ন্যায় অসভ্য মানুষও, যাহার মধ্যে মানবোচিত বিবেচনা শক্তি অত্যন্ত অল্প, তাহার প্রত্যেক কথা, কার্য, অঙ্গ-সঞ্চালন ও শান্তভাবের মধ্যে সহজাত আচার-ব্যবহারই প্রকাশ করে, এবং সে প্রবৃত্তির তাড়নার বশে চলে। তাহার কোন কাজ তাহার মানসিক শক্তি, বিচার বা চিন্তার ফলে প্রকাশিত হয় না। বরং যাহা কিছু প্রকৃতিগতভাবে তাহার মধ্যে সৃষ্টি হয়, উহাই পারি-পার্শ্বিকতার প্রতিক্রিয়ার তালে তাল মিলাইয়া প্রকাশিত হইতে থাকে। ইহা সম্বৰ্পণ যে, তাহার প্রকৃতিগত তাড়না, যাহা তাহার মধ্য হইতে কোন কিছুর প্রতিক্রিয়ায় প্রকাশিত হয়, সবই মন্দ নহে। বরং উহাদের কোন কোনটি সদাচারের সহিত মিলিয়া যাইতে পারে। কিন্তু এসবের মধ্যে চুল-চেরা বিচার, বিবেচনা ও যুক্তির কোন দখল থাকে না। যদি কিছু থাকেও, তাহা হইলে প্রবৃত্তির উত্তেজনার প্রাবল্য হেতু তাহা নির্ভরযোগ্য হয় না। বরং আধিক্য যেদিকে সেই দিকটাই নির্ভরযোগ্য।

প্রকৃত নৈতিকতা

বস্তুতঃ ঐরূপ ব্যক্তিকে প্রকৃত নৈতিকতার গুণ-সম্পন্ন বলা যায় না, যাহার উপর সহজাত বা স্বভাবজ আবেগ মানবেতর প্রাণী, পাগল ও শিশুদিগের ন্যায় প্রবল থাকে এবং যে তাহার জীবন প্রায় অসভ্য বর্বরদের ন্যায় যাপন করিয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে, সাধু বা অসাধু চরিত্রের বিকাশ তখন হইতেই শুরু হয়, যখন মানব খোদা-প্রদত্ত বুদ্ধিতে পরিপক্ষ হইয়া, তবারা সৎ ও অসৎ বা কুকর্ম ও সুকর্মের মধ্যে পার্থক্য করিতে পারে। অতঃপর, এক সময় সুপথ বর্জনে তাহার মনে ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয় এবং কুকর্ম করিলে মনে মনে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়। ইহা তাহার জীবনের দ্বিতীয় স্তর। ইহাকে খোদার কালাম কুরআন শরীফে নাফ্সে লাউওয়ামাহ (তিরঙ্কারকারী আত্মা) নামে অভিহিত করা হইয়াছে। কিন্তু স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, কোন অসভ্য বর্বর মানুষকে ‘নাফ্সে লাউওয়ামার’ অবস্থায়

আনিতে, শুধু ভাসা-ভাসা উপদেশ প্রদানই যথেষ্ট নহে। বরং প্রয়োজন, সে যেন খোদার পরিচয় লাভের যোগ্যতা অর্জন করে, যেন তাহার জন্মকে সে অহেতুক ও নিষ্কল মনে না করে এবং ঐশী তত্ত্ব-জ্ঞানের ভিত্তিতে যেন তাহার মধ্যে সত্যিকারের নৈতিক চরিত্র গঠিত হয়। সেইজন্য খোদাতা'লা সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত ঐশীজ্ঞানের দিকেও মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন এবং নিশ্চয়তা দিয়াছেন যে, প্রত্যেক কাজ ও নৈতিকগুণের একটা ফল আছে, যাহা ইহজীবনে আত্মিক সুখ বা আত্মিক শাস্তির কারণ এবং পরজীবনে তাহাই সুস্পষ্টভাবে স্বীয় প্রভাব প্রদর্শন করিবে। বস্তুতঃ 'নাফসে লাউওয়ামাহ'র পর্যায়ে মানুষ এরূপ জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিচার-শক্তি এবং পবিত্র বিবেকের অংশ লাভ করে যে, কুকার্য করিলে নিজেকে তিরক্ষার করে এবং সুকার্যে আগ্রহ ও স্পৃহা অনুভব করিতে থাকে। ইহাই সেই পর্যায় যেখানে মানুষ উন্নত চারিত্র্য লাভ করে।

খাল্ক ও খুল্ক

এই স্থানে আরবী 'খাল্ক' ও 'খুল্ক' শব্দের কিছু তৎপর্য বর্ণনা করাও সমীচীন হইবে। খাল্ক (عَلْق) শব্দের 'খা' (خ) অক্ষরে ফাতাহ (যবর) দ্বারা বাহ্যিক বা দৈহিক সৃজন বুঝায়, এবং খুল্ক (خُلْق) শব্দের 'খ' অক্ষরে যাম্মা (পেশ) দ্বারা বাতেনী বা আত্মিক সৃজন বুঝায়। বাতেনী সৃজন আখলাক বা নৈতিকতার দ্বারা পূর্ণত্বে পৌঁছিয়া থাকে, শুধু স্বভাবজ আবেগ দ্বারা নহে। সেইজন্য, নৈতিক চরিত্রের জন্যই এই শব্দ ব্যবহৃত হয়। স্বভাবজ আবেগ-উভেজনার জন্য ব্যবহৃত হয় না। তারপর ইহা বলা বাঞ্ছনীয় যে, সাধারণ লোক মনে করে, খুল্ক শুধু সহনশীলতা, ন্যূনতা ও বিনয়েরই অন্য নাম। ইহা তাহাদের ভুল ধারণা। বরং বাহ্যিক কর্মসমূহের পিছনে তদানুযায়ী যেসব অভ্যন্তরীণ মানবীয় গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য নির্ধারিত আছে, এই সব বৈশিষ্ট্যেরই নাম খুল্ক। যেমন, মানুষ বাহ্যতঃ চক্ষু দ্বারা কাঁদে, কিন্তু ইহার পিছনে এক নৈতিক অভ্যন্তরীণ গুণ কাজ করে, যাহাকে বলা যায় মনের কোমলতা। মনের এই কোমলতা যখন খোদাপ্রদত্ত বিচার-বুদ্ধির দ্বারা সঠিক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, তখন উহাই হয় একটি খুল্ক। তেমনি, মানুষ হস্ত দ্বারা শক্তির সহিত সংগ্রাম করে এবং এই ক্রিয়ার উৎসস্বরূপ তাহার হস্তয়ে এক শক্তি আছে, যাহাকে বীরত্ব বলা হয়। সুতরাং, যখন মানুষ এই শক্তিকে যথাস্থানে যথাসময়ে ব্যবহার করে, তখন ইহাও খুল্ক বলিয়া অভিহিত হইবে। সেইরূপে, মানুষ যখন হস্ত দ্বারা কোন আক্রান্ত ব্যক্তিকে আক্রমণকারী হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টা করে, অভাবী এবং বুভুক্ষুকে কিছু দান করিতে চাহে কিংবা অন্য কোন উপায়ে মানব-সেবা করিতে চাহে, তখন এই ক্রিয়ার প্রেরণাদানকারীরূপে তাহার হস্তয়ে এক শক্তি সক্রিয় হয়, যাহা দয়া নামে অভিহিত। কোনো সময়ে মানুষ হাত দ্বারা অত্যাচারীকে শাস্তি দেয়। এই ক্রিয়ার উদ্বৃক্ষকারী এক অভ্যন্তরীণ শক্তি হস্তয়ে আছে, যাহাকে প্রতিশোধপরায়ণতা বলা হয়। কখনও মানুষ আক্রমণের বিরুদ্ধে আক্রমণ করিতে চাহে না এবং অত্যাচারীর অত্যাচারকে উপেক্ষা করে। এই

ক্রিয়ার সাথে সমন্বযুক্ত হৃদয়ে যে শক্তি আছে, তাহাকে ক্ষমা ও ধৈর্য বলা হয়। কোনো সময়ে মানুষ মানব জাতির হিতার্থে তাহার হাত, পা বা হৃদয় ও মস্তিষ্কের ব্যবহার করে এবং তাহাদের উপকারার্থে তাহার সঞ্চিত ধন ব্যয় করে। তখন এই ক্রিয়ার পিছনে যে নৈতিক শক্তি কার্যকরী থাকে তাহাকে দয়া ও দানশীলতা বলা হয়। আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে সম্মোধন করিয়া বলিয়াছেন :

إِنَّكَ لَعَلَىٰ حُلُقٍ عَظِيمٍ - (الْقَلْمَ، ٥)

অর্থাৎ- “নিশ্চয় তুমি মহান নৈতিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত আছ” (৬৮ : ৫)। এখানে উল্লিখিত ব্যাখ্যা অনুযায়ী এই আয়াতের অর্থ হইল, যাবতীয় চরিত্র-গুণ, যথা দানশীলতা, বীরত্ব, ন্যায়পরায়ণতা, দয়া, এহসান, সত্যবাদিতা, বীরত্ব ও সাহসিকতা প্রভৃতি তোমাতে সুসমর্ভিতভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। বস্তুতঃ মানুষের হৃদয়ে যতগুলি বৃক্ষি পাওয়া যায়, যথা শিষ্টাচার, লজ্জা, সততা, সৌজন্য, গয়রত (কুকার্য বিরক্তি ও উষ্মা), দৃঢ়তা, কাম-সংযম, বিরাগ, নিয়মানুবর্তিতা, সহানুভূতি, বীরত্ব, সাহসিকতা, বদান্যতা, ক্ষমা, সহনশীলতা, ধৈর্য, দয়া, সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা প্রভৃতি স্বভাবজ অবস্থাসমূহ যখন যুক্তি ও চিন্তার আলোকে স্ব স্ব স্থানে ও পরিস্থিতিতে কার্যতঃ প্রকাশ করা হয়, তখন তাহাদের নাম হয় আখলাক বা নৈতিকতা। প্রকৃতপক্ষে, এইসব চরিত্র-গুণ মানুষের স্বভাবজ অবস্থা এবং স্বভাবজ আবেগ বিশেষ। এইগুলি সুনীতি বলিয়া শুধু তখনই অভিহিত হইতে পারে, যখন পরিস্থিতি ও পরিবেশ অনুযায়ী ইচ্ছা শক্তির প্রয়োগ ও পরিচালনায় উহাদিগকে ব্যবহার করা হয়। যেহেতু মানুষের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের অঙ্গর্গত ইহাও একটি বৈশিষ্ট্য যে, সে উন্নতিশীল প্রাণী, সেই জন্য সে সত্য ধর্মের অনুসরণে, সাধু-সঙ্গ ও সৎশিক্ষার ফলে, সকল প্রকার স্বভাবজাত আবেগ উত্তেজনাকে নৈতিকতায় রূপায়িত করিতে পারে। এই সৌভাগ্য অন্য কোন প্রাণীর ভাগ্যে জুটে না।

প্রথম ইস্লাহঃ স্বভাবজ অবস্থার সংশোধনী

এখন আমরা কুরআন শরীফ বর্ণিত মানবের ত্রিবিধ অবস্থার ইস্লাহের মধ্যে প্রথম ইস্লাহের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। ইহার সম্পর্ক নিম্নতম স্বভাবজ অবস্থার সহিত। এই ইস্লাহ আখলাকের ক্ষেত্রে আদব (শিষ্টাচার) নামে পরিচিত। অর্থাৎ, এই সকল সদাচার, যাহা পালন করিলে অসভ্য মানুষের স্বভাবজ ক্রিয়া-কর্ম, যথা, পানাহার, বিবাহ ইত্যাদি সামাজিক ব্যাপার সুনিয়ন্ত্রিত ও শোভনীয় হয় এবং বন্য, পাশব এবং হিংস্র জীবন যাত্রা হইতে মুক্তি লাভ ঘটে। এই সকল সদাচার সম্বন্ধে মহামহিমাবিত আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু কুরআন শরীফে বলিয়াছেন :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهْتَكُمْ وَبَنِتُكُمْ وَأَخْوَتُكُمْ وَعَمْتُكُمْ وَ
 خَلْتُكُمْ وَبَنْتُ الْأَخْرَجِ وَبَنْتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهْتُكُمْ الْقِنَّ
 أَزْضَغْتُكُمْ وَأَخْوَتُكُمْ مِنَ الرَّضَا عَةٍ وَأُمَّهْتُ نِسَاءَكُمْ
 وَرَبَّائِكُمْ الْقِنَّ فِي حَجَّوْرِكُمْ مِنْ لِسَائِكُمْ الْقِنَّ دَخْلَتْمُ
 بِمِنْ نِفَانِ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِمِنْ فَلَاجْنَاحَ عَلَيْكُمْ
 وَحَلَالِهِ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمِعُوا
 بَيْنَ الْأَخْتَيْبِينِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ - (النساء: ٢٤)

لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهَاهُ - (النساء: ٢٠)
 وَلَا تَنِكِحُوا مَا نَكَحَ أَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا
 قَدْ سَلَفَ - (النساء: ٤٣)

أُحِلَّ لَكُمُ الطِّبِّيلَتُ وَالْمُخَصَّنَتُ مِنَ
 الْمُؤْمِنَتِ وَالْمُخَصَّنَتِ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ
 قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُخْصِنَتِينَ غَيْرَ
 مُسِفِحِيَّنَ وَلَا مُتَخَدِّسِيَّنَ أَخْدَانِ - (المائدة: ٦)

وَلَا تَقْتُلُوا آنفُسَكُمْ - (النساء: ٣٠)

وَلَا تَقْتُلُوا آدَلَادَكُمْ - (الأنعام: ١٥٢)

لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْأَلُوا وَتُسَلِّمُوا
 عَلَى أَهْلِهَا - فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا

تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ ۚ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا

فَارْجِعُوا هُوَ أَذْكَرُ لَكُمْ ۖ (النور: ۲۹-۳۰)

وَأَتُوا الْبُشِّرَاتِ مِنْ آبَوَابِهَا ۖ (المقرة: ۱۹۰)

وَإِذَا حَيَّيْتُمْ بِتَحْيَيَةٍ فَحَيِّوْا بِآخْسَنَ مِنْهَا
أَذْرَقَهَا ۖ (النساء: ۸۷)

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ

رِبْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعْنَكُمْ تُفْلِحُونَ ۖ (المائدة: ۹۱)

عَرِّمْتَ عَلَيْكُمُ الْيَتَّةَ وَالدَّمْرَ وَلَعْنَمُ الْخِزْنِيرَ وَمَا أَهْلَ
لِغَنِيرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةَ وَالْمَوْقُوذَةَ وَالْمُتَرَدِّيَةَ وَالنَّحِيمَةُ
وَمَا أَكَلَ السَّبُّعَ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ۖ (المائدة: ۴)

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحِلَّ لَهُمْ قُلْ أَحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۖ (المائدة: ۵)

إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَlisِ فَافْسَحُوا

وَإِذَا قِيلَ أَشْرُذُوا فَأَشْرُذُوا ۖ (المجادلة: ۱۲)

كُلُّوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُشْرِفُوا ۖ (الاعراف: ۳۲)

وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۖ (الاحزاب: ۱۱)

وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ ۖ وَالرَّجَبَ فَاهْجَرْ ۖ (المدثر: ۴-۵)

وَأَقْصِدْ فِي مَشِيكَ وَاغْضَضْ مِنْ صَوْتِكَ ۖ (لقمان: ۲۰)

تَرَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۖ (البقرة: ۱۹۸)

وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَأَطْهَرُوا - (المائدۃ : ۷)

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلْسَّائِلِ وَالْمَحْرُومٌ - (الثَّرِیْت : ۲۰)

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَمَّى فَأَنْكِحُوهُ أَمَّا طَابَ لَكُمْ

مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلْثَةً وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُونَا

فَوَاحِدَةً أَوْ مَامَلَكُتْ أَيْمَانَكُمْ ذَلِكَ أَذْنِي أَلَا تَعْوُلُوا.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدْقَتِهِنَّ بِخَلْلَةً - (النَّسَاء : ۴۵)

অর্থাৎ, “তোমাদের জন্য তোমাদের জননীগণকে হারাম (নিষিদ্ধ) করা হইয়াছে এবং সেইরূপ ভাবেই নিষিদ্ধ তোমাদের কন্যা, তোমাদের ভগুৰী এবং তোমাদের ফুফু, তোমাদের খালা, তোমাদের ভাতিজী, তোমাদের ভাগিনী এবং তোমাদের স্তন্যদায়িনী মাতা এবং তোমাদের দুঃখ-ভগুৰী, তোমাদের স্ত্রীদের মাতাগণ, তোমাদের স্ত্রীদের পূর্ব স্বামীর ওরসজাত কন্যাগণ, যাহাদের (অর্থাৎ স্ত্রীদের) সহিত তোমরা সহবাস করিয়াছ, এবং যদি সহবাস না করিয়া থাক, তবে কোন পাপ নাই এবং তোমাদের নিজ পুত্রবধুগণ এবং সেই প্রকারে একই সময়ে দুই ভগুৰী। এইসব কাজ, যাহা ইতিপূর্বে প্রচলিত ছিল, এখন তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হইল (৪:২৪)। ইহাও তোমাদের জন্য বৈধ নহে যে, বলপূর্বক স্ত্রীদের উত্তরাধিকারী হও (৪:২০)। ইহাও বৈধ নহে যে, তোমরা ঐসব স্ত্রীলোকের সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হও, যাহারা তোমাদের পিতার স্ত্রী ছিল। ইতিপূর্বে যাহা ঘটিয়াছে, ঘটিয়াছে (৪:২৩)। সতী স্ত্রীলোকগণকে তোমাদের মধ্য হইতে বা পূর্ববর্তী শাস্ত্রধারী আহলে-কেতাবের মধ্য হইতে বিবাহ করা তোমাদের জন্য বৈধ, কিন্তু কেবল তখন, যখন মোহরানা নির্ধারণ করিয়া বিবাহ কর। ব্যতিচার বৈধ নহে এবং গোপন বন্ধুত্বও বৈধ নহে” (৫:৬)। আরবের অঙ্গদের মধ্যে যাহাদের কোন সন্তান হইত না, তাহাদের কাহারও কাহারও মধ্যে এই প্রথা ছিল যে, সন্তান লাভের জন্য তাহাদের স্ত্রী অন্যের সঙ্গে প্রণয় করিত। কুরআন শরীফ এই আচারকেও হারাম করিয়াছে। এই কুপ্রথার নাম ‘মুসাফেহাত’।

তারপর বলিয়াছেন : “তোমরা আঘ-হত্যা করিবে না (৪:৩০)। নিজেদের সন্তানকেও বধ করিবে না (৬:১৫২) এবং অসভ্যের ন্যায় অনুমতি ছাড়া অন্যের গৃহে আপনা আপনি প্রবেশ করিবে না। অনুমতি নেওয়াই শর্ত। তোমরা যখন

অন্যের ঘরে যাও, তখন প্রবেশ দ্বারে পৌছা মাত্র ‘আস্সালামু আলায়কুম’ বলিবে। যদি ঐ সব গৃহে কেহ না থাকে, তবে যে পর্যন্ত না কোনো গৃহ-স্বামী তোমাদিগকে অনুমতি দেয়, ঐ সব গৃহে যাইবে না এবং যদি গৃহ-স্বামী ফিরিয়া যাইতে বলে, তবে তোমরা ফিরিয়া যাইবে ইহা তোমাদের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ হইবে (২৪:২৮-২৯)। কোনো গৃহে দেওয়াল টপকাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিবে না। বরং গৃহের দরজা দিয়া গৃহে প্রবেশ করিবে (২৪:১৯০) এবং যদি কেহ তোমাদিগকে সালাম বলে, তবে তাহাকে তাহা হইতে উত্তম ও আশিস-পূর্ণ সালাম বলিবে (৪:৮৭)। মদ, জুয়া, পৌত্রলিকতা, ভাগ্য-গণনা, এই সবই অপবিত্র ও শয়তানী কাজ। এইগুলি হইতে বাঁচিয়া চলিবে (৫:৯১)। মৃত জন্মুর এবং শূকরের মাংস খাইবে না। প্রতিমার নিকট উৎসর্গীকৃত (বস্তু) ভক্ষণ করিবে না। লাঠির আঘাতে নিহত প্রাণী খাইবে না। পতনে মৃত্যু ঘটিয়াছে, এই প্রকার মৃত জীব খাইবে না। শিং-এর আঘাতে মৃত জীব খাইবে না। হিংস্র জন্মুর দ্বারা ছেঁড়া-ফাড়া প্রাণী খাইবে না। মৃত্তির উদ্দেশ্যে সমর্পিত জিনিস খাইবে না। এই সবই মৃত-তুল্য (৫:৪)। যদি লোকেরা জিজ্ঞাসা করে, তবে কি খাইব? প্রত্যুভাবে বলিবে যে, “পৃথিবীর যাবতীয় পবিত্র জিনিস খাইবে” (৫:৫)। শুধু মৃত, মৃতের অনুরূপ এবং অপবিত্র জিনিস খাইবে না।

যদি মজলিসে বৈঠকে তোমাদিগকে প্রসারিত হইয়া বসিতে বলা হয়, অর্থাৎ অন্যের জন্য স্থান করিতে বলা হয়, তৎক্ষণাত্ম স্থান প্রশস্ত করিবে, যাহাতে অন্যেরাও বসিতে পারে। যদি তোমাদিগকে উঠিয়া যাইতে বলা হয়, তবে দ্বিরুক্তি না করিয়া উঠিয়া যাইবে (৫৮:১২)। মাংস, ডাল ইত্যাদি সব জিনিসই পবিত্র হইলে নিঃসন্দেহে খাইবে। কিন্তু কোন কিছুতেই বাড়াবাড়ি করিবে না। অমিতাচার এবং অপরিমিত ভোজন হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিবে (৭:৩২)। বৃথা কথা বলিবে না। স্থান ও সময় উপযোগী কথা বলিবে (৩৩:৭১)। তোমাদের কাপড় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিবে। দেহ, গৃহ, গলি এবং তোমাদের বসিবার সকল স্থান অপবিত্রতা, ময়লা ও আবর্জনা হইতে মুক্ত রাখিবে। গোসল করিবে এবং ঘর পরিষ্কার রাখার অভ্যাস করিবে (৭৪:৫-৬)। খুব উচ্চ কঢ়ে কথা বলিবে না এবং অত্যন্ত মৃদু স্বরেও কথা বলিবে না। মধ্যম পস্তা গ্রহণ করিবে; তবে প্রয়োজনের সময় অন্য কথা (৩১:২০)। চলিবার সময় খুব দ্রুত চলিবে না। অত্যন্ত আস্তেও চলিবে না। মাঝামাঝি গতির প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। সফরের সময় সব দিক দিয়া প্রবাসের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় জিনিষপত্রের বদ্দোবস্ত করিয়া লইবে; যথেষ্ট পরিমাণে পথের খরচ সঙ্গে লইবে, যাতে ভিক্ষাবৃত্তি হইতে রক্ষা পাও (২৪:১৯৮)। অশৌচ অবস্থায় স্নান করিবে (৫:৭)। খাওয়ার সময় আহার-প্রার্থীকে দান করিবে এবং কুরুক্ষেত্রে দিবে। যদি সম্ভব হয়, পাখী এবং অন্যান্য প্রাণীকেও খাবার দিবে (৫১:২০)। এতীম মেয়ে, যাহাদের তোমরা ভরণ পোষণ কর, তাহাদিগকে বিবাহ করায় দোষ নাই। কিন্তু যদি মনে

কর যে, তাহাদের অসহায়ত্ব তোমাদিগকে সীমা-লংঘনে প্রলুক্ষ করিতে পারে, এমন আশঙ্কা থাকিলে, এমন সব মেয়েকে বিবাহ করিবে, যাহাদের মাতা-পিতা ও নিকট আঞ্চীয় রহিয়াছে, যাহারা তোমাদিগকে সংযত রাখিবে ও শাসনে রাখিবে। এক, দুই, তিন, চারি বিবাহ পর্যন্ত করিতে পারিবে, যদি তোমরা সমতা রক্ষা করিতে পার এবং যদি সমতা রক্ষা সম্ভব না হয়, তবে প্রয়োজন হইলেও শুধু একেই সীমাবদ্ধ থাকিবে। চারি বিবাহ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ এই উদ্দেশ্যে করা হইয়াছে যাহাতে তোমরা পুরাতন অভ্যাসের তাগিদে সীমালংঘন না কর। অর্থাৎ শত শত সংখ্যায় না পৌছাও বা ব্যভিচারের দিকে যেন আকৃষ্ট না হও। এবং তোমাদের নিজেদের স্ত্রীদের মোহরানা দাও (৪:৪-৫)।

বস্তুতঃ ইহা কুরআন শরীফের প্রথম ইস্লাহ। এই ইস্লাহ বা সংক্ষার দ্বারা মানুষের স্বত্ত্বাবজ অবস্থাকে অসভ্য ও বর্বর পন্থাসমূহ হইতে টানিয়া আনিয়া মানবতার উপযোগী সামাজিক সভ্যতার প্রতি মনযোগী করা হইয়াছে। এই শিক্ষায় এখনও উন্নত চরিত্রের কোনই উল্লেখ নাই। এখানে শুধু মানবতার শিষ্টাচারসমূহই শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। আমরা লিখিয়াছি যে, এই শিক্ষার প্রয়োজন হইয়াছিল এই জন্য যে, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম যে জাতির শুন্দি ও সংক্ষার সাধনের জন্য আসিয়াছিলেন, তাহারা বর্বরতার চরমে নিপতিত হইয়াছিল। কোন দিক দিয়াই মানবতার কোনো নীতি বা শিক্ষা তাহাদের মধ্যে ছিল না। সুতরাং তাহাদিগকে সর্বাঙ্গে মানবতার বা বাহ্যিক সদাচারের শিক্ষা দান করা প্রয়োজন ছিল।

শূকর নিষিদ্ধ (হারাম)

একটি সূক্ষ্মতত্ত্ব এখানে স্মরণ রাখার যোগ্য এবং উহা হইল শূকর হারাম হওয়া সম্পর্কিত। খোদাতা'লা আদি হইতে ইহার নামের মধ্যেই নিমেধের দিকে ইংগিত করিয়াছেন। কারণ, আরবী 'খিন্যীর' শব্দ 'খিন্য' ও 'আরা' ধাতু দ্বারা গঠিত। ইহার অর্থ আমি ইহাকে অত্যন্ত কলহপূর্ণ ও মন্দ দেখিতেছি। খিন্য অর্থ অত্যন্ত দূষিত এবং আরা অর্থ দেখিতেছি। সুতরাং এই জন্তু যে নাম আদি হইতে খোদাতা'লার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে, উহা তাহার অপবিত্রতা নির্দেশ করে। আরো একটি আশচর্য সমৰ্পণ এই যে, হিন্দি ভাষায় এই জন্মকে 'শূয়ার' বলে। এই শব্দ 'শূ' এবং 'আর' দ্বারা গঠিত। অর্থ হইল আমি ইহাকে অত্যন্ত মন্দ অবস্থায় দেখিতেছি। ইহাতে অবাক হইবার কিছুই নাই যে, 'শূ' শব্দ কি প্রকারে আরবী হইল? কারণ আমরা আমাদের প্রণীত 'মিনানুর রহমান' গ্রন্থে প্রমাণ করিয়াছি যে, সব ভাষার জননী আরবী ভাষা। আরবী শব্দ প্রত্যেক ভাষাতেই একটি দুইটি নহে বরং সহস্র সহস্র সংখ্যায় মিশ্রিত হইয়াছে। সুতরাং, 'শূ' শব্দ আরবী। এজন্য হিন্দীতে শূয়ারের অনুবাদ বদ বা মন্দ। সুতরাং ইহাকে 'বদ'ও বলা হয়। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, যে যুগে আরবী সারা পৃথিবীর ভাষা

ছিল, তখন এদেশে এই জন্মুর নাম আরবীতে প্রসার লাভ করিয়াছিল। ইহা ‘খিন্ধীর’ শব্দের সম-অর্থ প্রকাশক এবং প্রতিশব্দ। এখন পর্যন্ত উহার স্মৃতি বিদ্যমান রহিয়া গিয়াছে। অবশ্য ইহা সম্বৰপর যে, সংকৃত ভাষায় ইহার নিকটবর্তী শব্দ বিকৃত হইয়া অন্য কিছু হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বিশুদ্ধ শব্দ ইহাই। কারণ ইহাতে নামকরণের কারণও নিহিত রহিয়াছে। ‘খিন্ধীর’ শব্দ দ্ব্যর্থহীনভাবে ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। এই শব্দের এই যে অর্থ, অর্থাৎ অত্যন্ত বদ, ইহার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। একথা কে না জানে যে, এই জন্মু প্রথম শ্রেণীর মল ভক্ষক, নাপাক, নির্লজ্জ, এবং লম্পট। ইহা হারাম বা অবৈধ হওয়ার কারণ অতি স্পষ্ট। প্রাকৃতিক বিধান ইহাই চাহে যে, এই প্রকার অপবিত্র, বদ জন্মুর মাংসের ক্রিয়া দেহ এবং আত্মার উপর অপবিত্রই হইবে। কারণ আমরা প্রমাণ করিয়া আসিয়াছি যে, মানুষের আত্মার উপর খাদ্যেরও সুনিশ্চিত ক্রিয়া হয়। সুতরাং ইহাতে সন্দেহ কি যে, এইরূপ মন্দ জিনিসের ক্রিয়াও মন্দই হইবে। গ্রীক চিকিৎসাবিদগণ প্রাগু ইসলামী যুগেই এই অভিমত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন যে, লজ্জাহীনতার সৃষ্টি এই জন্মুর মাংসের গুণগত বৈশিষ্ট্য। অশ্লীলতা বৃদ্ধি ও ইহা ভক্ষণের অবশ্য়ঙ্গাবী কুফল। মৃত (পশুপাখী) খাওয়াও এই (ইসলামী) শরীয়তে এই জন্যই নিষেধ করা হইয়াছে যে, মৃতও ইহার ভক্ষককে আপন দোষে দুষ্ট করে। অধিকন্তু দূষিত, স্বাস্থ্যেরও ক্ষতি সাধন করে। যে সকল জন্মুর রক্ত ভিতরেই থাকে, যেমন, শ্বাসরুদ্ধ হইয়া বা লাঠির আঘাতে মারা যায়, সে সব জন্মু আসলে লাশের অবস্থার অন্তর্গত। মৃতের রক্ত ভিতরে থাকিয়া সঠিক অবস্থায় থাকিতে পারে কি? না। বরং তাহা তরল বস্তু বলিয়া অতি শীত্র পচিবে এবং ইহার পচনে সাকল্য মাংসই নষ্ট হইয়া যাইবে। তারপর, আধুনিক গবেষণা দ্বারা ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে, রক্তের জীবাণু মরিয়া দেহে বিষাক্ত পচন সঞ্চারিত করে।

মানুষের নৈতিক অবস্থা

কুরআনের বর্ণিত ইসলাহের দ্বিতীয় বিভাগ হইল স্বভাবজ প্রেরণা বা তাড়নাকে যথোপযুক্ত গুণাবলীর সহিত সমৰ্ষয় করিয়া উন্নত চারিত্বে রূপায়িত করা। সুতরাং, জানা আবশ্যক যে, এই বিভাগটি বেশ ব্যাপক। যদি আমরা এই বিভাগ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হই, অর্থাৎ কুরআন শরীফ বর্ণিত যাবতীয় নৈতিক গুণ বা নীতি এখানে লিখিতে যাই, তবে এই প্রসঙ্গ এত দীর্ঘ হইয়া পড়িবে যে, নির্ধারিত সময় উহার দশমাংশের জন্যও যথেষ্ট হইবে না। এজন্য এখানে নমুনা হিসাবে কতিপয় উন্নত নৈতিক গুণাবলী সম্বন্ধে বর্ণনা করা যাইতেছে।

জানা দরকার যে, আখলাক (চারিত্রিক গুণাবলী) দুই প্রকারের। প্রথমতঃ সেই আখলাক, যাহা দ্বারা মানুষ গর্হিত আচরণ হইতে নিবৃত্ত হয়। দ্বিতীয়, ঐ সকল নৈতিক গুণ যাহা দ্বারা মানুষ কল্যাণকর আচরণে সক্ষম হয়। অকল্যাণ বা

অনিষ্ট ত্যাগ অর্থে ঐসব আখলাককে বুঝায়, যাহা দ্বারা মানুষ চেষ্টা করে যেন, তাহার জিহ্বা, তাহার হাত, তাহার চক্ষু, বা তাহার অন্য কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা অন্যের সম্পদ, সম্মান বা প্রাণের কোন ক্ষতি সাধন না হয়, কিংবা কোন অনিষ্টের বা মানহানির ইচ্ছা না হয়। কল্যাণ বা হিত সাধন অর্থে সেই সম্যক গুণকেই বুঝায়, যদ্বারা মানুষ চেষ্টা করে, যেন তাহার জিহ্বা, হাত, বা জ্ঞান দ্বারা বা অন্য কোন উপায়ে অন্যের ধন বা সম্মানের কল্যাণ সাধন করিতে পারে, কিংবা তাহার প্রতাপ বা সম্মান প্রকাশে সাহায্য করিতে পারে। কিংবা কেহ তাহার প্রতি কোন অত্যাচার করিয়া থাকিলে অত্যাচারী যে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য, তাহা সে ছাড়িয়া দেয় এবং এই প্রকারে তাহাকে কষ্ট পাওয়া হইতে এবং দৈহিক ও আর্থিক দণ্ড হইতে নিরাপদ রাখার মত উপকার সাধন করে বা তাহাকে এতটুক সাজা দেয়, যাহা প্রকৃত পক্ষে তাহার জন্য প্রত্যক্ষ করুণাস্বরূপ হয়।

অকল্যাণ (Evil) পরিহার সম্পর্কিত চারিত্রিক গুণ

এখন জানা আবশ্যক যে, সেই আখলাক যাহা পরম পরাণপর স্বষ্টি অকল্যাণ পরিহারের জন্য নির্দিষ্ট করিয়াছেন, তাহা আরবী ভাষায় চারিটি বিশিষ্ট শব্দ দ্বারা চিহ্নিত করা হইয়াছে। মানুষের চিন্তাধারা, চাল-চলন এবং ভিন্নভিন্ন আখলাকের প্রকাশের জন্য আরবীতে বিশেষ অর্থবোধক ভিন্ন ভিন্ন শব্দ রহিয়াছে। এগুলির মধ্যে প্রথম চরিত্র-গুণ (حُسْنٌ) এহসান নামে আখ্যায়িত। এই শব্দ দ্বারা ঐ বিশিষ্ট ধরনের পবিত্রতাকে বুঝায়, যাহা পুরুষ ও স্ত্রীলোকের প্রজনন শক্তির সহিত সম্পর্কিত এবং মুহসেন (مُحْسِن) বা মুহসেনা, (مُحْسِنَة) এই পুরুষ বা স্ত্রীলোককে বলা হয়, যে ব্যক্তিকে বা উহার সূচনা বা ভূমিকা হইতে পৃথক থাকিয়া ঐ নাপাক কুক্রিয়া হইতে নিজেকে সংযত রাখে, যাহার কুফল উভয়ের জন্য এ পৃথিবীতে লাঞ্ছনা ও অভিশাপ এবং পরলোকের শাস্তি ছাড়াও আঘাতীয়-স্বজনগণের লজ্জা এবং ভীষণ ক্ষতির কারণ হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যদি কোন ব্যক্তি কাহারও স্ত্রীর সহিত অবৈধ কাজ করে, কিংবা ব্যক্তিকে না করিয়া যদি উহার সূচনা পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়ের দ্বারা প্রকাশ পায়, তবে কোন সন্দেহ নাই যে, আঘ-মর্যাদা-বোধ-সম্পন্ন নির্যাতিত ব্যক্তির পক্ষে যে স্ত্রী ব্যক্তিকে উদ্যত হইয়াছিল, বা ব্যক্তিকে লিপ্ত হইয়াছিল, তাহাকে তালাক দেওয়া ছাড়া গত্যত্র থাকে না।

এই স্ত্রীর গর্ভ ধারণে সন্তান হইলে, সন্তানদেরও মহা বিপদ হয় এবং গৃহ-স্বামীকে এই সকল ক্ষতি সেই দুশ্চরিত্রার জন্যই ভোগ করিতে হয়।

এস্তে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই যে চরিত্র গুণ এহসান অর্থাৎ চারিত্রিক পবিত্রতা বা সতীত্ব, সেই অবস্থায় খুল্ক বলিয়া আখ্যায়িত হইবে, যখন ঐরূপ ব্যক্তি, যাহার মধ্যে কুদৃষ্টি বা কুকার্যের ক্ষমতা আছে অর্থাৎ প্রকৃতি যাহাকে ঐ

ক্ষমতা দিয়াছে, যদ্বারা সে এই অপরাধে লিঙ্গ হইতে পারে, সে ঐ কুকর্ম হইতে নিজেকে রক্ষা করে। যদি শিশু কিংবা নপুংসক বা খোজা বা অসমর্থ বৃন্দ হওয়ার দরুন এই ক্ষমতা কাহারও না থাকে, তবে তাহাকে এই অবস্থায় সেই চরিত্রগুণে গুণাবিত বলা যাইবে না, যাহার নাম সতীত্ব বা এহসান বা ইফ্ফাত। অবশ্য ইহা নিশ্চিত যে, সতীত্ব বা এহসানের একটা স্বভাবজ অবস্থা তাহার মধ্যে আছে। কিন্তু আমরা বার বার লিখিয়াছি যে, স্বভাবজ অবস্থার নাম চরিত্রগুণ বা নৈতিকতা নহে। বরং উহা তখনই নৈতিকতা বা চরিত্রগুণ বলিয়া গণ্য হইবে, যখন বিচার-বিবেচনা ও যুক্তির আশ্রয়ে উপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রকাশিত হইবে বা প্রকাশের যোগ্যতা রাখিবে। সুতরাং আমি যেমন লিখিয়াছি যে, শিশু, নপুংসক এবং যাহারা কোন বিশেষ প্রক্রিয়া দ্বারা নিজেদের পুরুষত্ব নষ্ট করিয়া ফেলে, তাহারা এই চরিত্রগুণের আওতায় আসে না। যদিও আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হয় যে, তাহারা চারিত্রিক পবিত্রতায় বা সতীত্বের মধ্যেই জীবন যাপন করে, তথাপি তাহাদের এই অবস্থার নামও স্বভাবজ অবস্থা, অন্য কিছু নহে। যেহেতু উল্লিখিত অপবিত্র ক্রিয়া-কলাপ এবং সূচনা পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোক দ্বারাও প্রকাশিত হইতে পারে, এজন্য খোদাতা'লার পবিত্র গ্রন্থে ত্রী-পুরুষ উভয়ের জন্য এই শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে :

قُلْ لِلّٰهِ مُنِينَ يَغْضُبُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَخْفَظُوا
فُرُوجَهُمْ ذٰلِكَ آزِكَةُ لَهُمْ
وَقُلْ لِلّٰهِ مُنِينَ يَغْضُبُونَ مِنْ

أَبْصَارِهِنَّ وَيَخْفَظُنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبَدِّلُنَ
زِينَتَهُنَ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَيَضِرُّنَ بِخُمُرِهِنَ
عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يَضِرُّنَ بِأَرْجُلِهِنَ لِيُعْلَمَ
مَا يَخْفِيَنَ مِنْ زِينَتِهِنَ وَتُؤْتُوا إِلَيَ اللّٰهِ مِنِيعًا

أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . (النور : ٣٢-٣١)

وَلَا تَقْرَبُوا إِلَيْنِي إِذْ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سِنِيًّا (دُبَى اسْرَائِيلٍ) ۲۳

وَلَيَسْتَعْفِفَنِي إِلَيْنِي لَا يَحْمُدُونَ نِكَاحًا . (النور : ٣٤)

وَرَهْبَانِيَّةَ إِنْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا

إِنْتَفَاعَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوهَا حَقٌّ

رِعَايَتِهَا - (الحمد: ٤٨)

অর্থাৎ “ঈমানদার পুরুষগণকে বল যে, তাহাদের চক্ষুব্যক্তিকে না-মাহ্রাম [যাহাদের সহিত বিবাহ বৈধ (অনুবাদক)] স্ত্রীলোকদিগকে দেখা হইতে যেন বাঁচাইয়া রাখে এবং ঐ সকল স্ত্রীলোকদিগকে খোলা চোখে না দেখে, যাহারা কামোদ্রেকের ক্ষেত্রে হইতে পারে। এই সব ক্ষেত্রে আনত দৃষ্টির অভ্যাস করিবে এবং আপন লজ্জাস্থানকে যে প্রকারে হউক বাঁচাইবে। অনুরূপভাবে, না-মাহ্রাম ও অনাত্মীয়া স্ত্রীলোকদের গান, বাদ্য ও সুললিত কর্তৃ শুনিবে না। তাহাদের রূপ কাহিনী শুনিবে না। এই নিয়ম দৃষ্টিকে পবিত্র রাখিবার এবং চিত্তকে অবিকৃত রাখিবার উত্তম পদ্ধতি। তেমনি ঈমানদার স্ত্রীলোকদিগকে বল যে, তাহারাও যেন তাহাদের চক্ষু এবং তাহাদের কানকে না-মাহ্রাম পুরুষ হইতে রক্ষা করে। অর্থাৎ তাহাদের কামোদ্রীপক স্বর শুনিবে না এবং নিজেদের লজ্জাস্থানগুলিকে আবৃত রাখিবে এবং সৌন্দর্যময় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কোন না-মাহ্রাম ব্যক্তির নিকট অনাবৃত করিবে না এবং ওড়না-চাদর এমনভাবে মাথায় দিবে যেন, কণ্ঠদেশ হইতে মাথায় পৌছে। অর্থাৎ, গ্রীবা, দুই কান, মাথা এবং কানপাত্রি সব যেন চাদরের পর্দায় ঢাকা থাকে। নর্তকীদের ন্যায় মাটিতে পদযুগল দ্বারা আঘাত হানিবে না। ইহা সেই পদ্ধতি যাহা অবলম্বন করিলে পদস্থলন হইতে রক্ষাপ্রাপ্ত হইবে” (২৪:৩১-৩২)।

বাঁচিবার দ্বিতীয় উপায় — খোদামুখী হইবে এবং তাহার নিকট প্রার্থনা করিবে যেন তিনি হঁচে থাওয়া হইতে এবং পদস্থলন হইতে বাঁচান। ব্যভিচারের কাছেও যাইবে না (১৭:৩৩)। অর্থাৎ এমন আচার-অনুষ্ঠান হইতে দূরে থাকিবে, যাহা মনে কুভাবের উদ্বেক করিতে পারে। এমন সব পথ ধরিবে না, যেখানে এই পাপ সংঘটনের আশঙ্কা থাকে। যে ব্যভিচার করে, সে পাপকে শেষ সীমান্য পৌছায়। ব্যভিচারের পথ অত্যন্ত মন্দ, ইহা গন্তব্য পথকে রুদ্ধ করে এবং তোমাদের শেষ মন্ডিলের (গন্তব্যস্থান) জন্য এ পথ অত্যন্ত বিপজ্জনক। যে বিবাহ করিতে পারে না, তাহার কর্তব্য সে তাহার পবিত্রতাকে অন্য উপায়ে রক্ষা করিবে (২৪:৩৪)। যেমন, রোয়া রাখিবে, স্বল্পাহার করিবে বা কঠোর দৈহিক পরিশ্রম করিবে। অন্যান্য লোক এই পথ উত্তীবন করিয়াছে যে, তাহারা চির কুমার থাকিবে বা খোজা হইবে এবং যে কোন উপায়ে হউক সন্যাস-ব্রত অবলম্বন করিবে (৫৭:২৮)। কিন্তু আমরা মানুষের উপর এই আদেশ অবশ্য-পালনীয় করি নাই। এই কারণে তাহারা এই সব অভিনব স্বকল্পিত প্রথা পূর্ণরূপে পালন করিতে পারে নাই। “মানুষ খোজা হউক, ইহা আমার আদেশ নয়” খোদাতা’লার একথা

বলার মধ্যে এই সংকেত রহিয়াছে যে, ইহা খোদার আদেশ হইলে সব লোকই এই আদেশ পালনে সক্ষম হইত। তদবস্থায় সমগ্র মানবজাতি কবেই বংশহীন হইয়া জগৎ হইতে লোপ পাইয়া যাইত। যদি পবিত্রতা লাভ করিতে পুরুষাঙ্গ কর্তন করিতে হইত, তাহা হইলে ইহা প্রকারান্তরে সেই মহান স্রষ্টার বিরুদ্ধে আপত্তি হইত, যিনি উক্ত অঙ্গ সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর যখন সওয়াব বা পুণ্যার্জন সম্পূর্ণ এ কথার উপর নির্ভর করে যে, ক্ষমতা থাকিবে, অথচ মানুষ খোদাতা'লার ভয়ে এই ক্ষমতার কদর্য ব্যবহার করিবে না ; বরং কদর্য উত্তেজনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া এবং ইহার উপকারিতা দ্বারা লাভবান হইয়া দুই প্রকারের পুণ্য অর্জন করিবে। সুতরাং, ইহা সুস্পষ্ট যে, এই অঙ্গকে নষ্ট করার অর্থ উভয় প্রকার সওয়াব হইতে বঞ্চিত হওয়া। পুণ্য লাভ হয় বিরোধী উত্তেজনার উপস্থিতিতে ও উহার বিরুদ্ধে সংগ্রামে। কিন্তু শিশুর ন্যায় যাহার এই শক্তিই নাই, সে কি সওয়াব পাইবে? শিশু কি চারিত্রিক পবিত্রতার সওয়াব পাইতে পারে?

কাম সংযম বা সতীত্ব রক্ষার পাঁচটি উপায়

এই আয়াতগুলিতে খোদাতা'লা চারিত্রিক পবিত্রতা লাভের জন্য শুধু উচ্চ শিক্ষাই দেন নাই, বরং মানুষকে কাম বিষয়ে পবিত্র থাকার জন্য পাঁচটি প্রতিকারও বলিয়া দিয়াছেন যথা : (১) না-মাহুরাম নারীকে দর্শন হইতে পুরুষের চক্ষুকে বাঁচানো। (২) না-মাহুরাম পুরুষের কঠ শ্রবণ হইতে নারীর কানকে বাঁচানো। (৩) না-মাহুরাম স্ত্রীলোক ও পুরুষের স্বরূপে গল্প শ্রবণ না করা। (৪) আলোচিত কুকর্মের সূচনাকারী যাবতীয় অনুষ্ঠান ও ক্ষেত্র হইতে নিজেকে বাচাইয়া চলা। (৫) বিবাহ না হইলে, রোগ্য রাখা ইত্যাদি।

এখানে আমরা জোর দাবীর সংগে বলিতেছি যে, এই সকল চেষ্টা-তদবীরের যাবতীয় পক্ষ সম্পূর্ণ মহান শিক্ষা, যাহা কুরআন শরীফে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা একমাত্র ইসলামেরই বৈশিষ্ট্য। বিশেষভাবে একটি তত্ত্ব স্মরণ রাখিতে হইবে এবং তাহা এই যে, মানুষের স্বত্বাবজ অবস্থা যাহা কাম-প্রবৃত্তির উৎস, তাহা হইতে মানুষ পরিপূর্ণ পরিবর্তন ছাড়া মুক্ত হইতে পারে না। বরং মহাবিপদাপন্ন হইয়া পড়ে। সেই কারণেই খোদাতা'লা আমাদিগকে পবিত্র মনোভাব লইয়া না-মাহুরাম স্ত্রীলোকদিগকে অবাধে দর্শন করার, তাহাদের শোভা ও সৌন্দর্য সব দেখিয়া এবং তাহাদের নাচ, অঙ্গভঙ্গ ইত্যাদি প্রত্যক্ষ করিবারও অনুমতি দেন নাই। বরং আমাদিগকে তাকিদ করা হইয়াছে যে, আমরা যেন না-মাহুরাম স্ত্রীলোককে এবং তাহার শোভা ও সৌন্দর্য প্রকাশক অঙ্গগুলিকে কখনও না দেখি, পবিত্র বা অপবিত্র কোন দৃষ্টিতেই নহে ; তাহাদের সুকর্ষ, তাহাদের সৌন্দর্যের গল্প যেন আমরা না শুনি, পবিত্র ভাব দ্বারাও নহে ; বরং আমাদের কর্তব্য, আমরা যেন উহা শোনা ও দেখাকে মৃত্যুসম ভয় ও ঘৃণা করি, যাহাতে আমাদের

পদস্থলন না ঘটে। কারণ অবাধ দৃষ্টির ফলে যে কোন সময় পদস্থলন হইতে পারে। সুতরাং, যেহেতু খোদাতা'লা চাহেন যে, আমাদের চক্ষু, হৃদয় এবং আমাদের মনোভাব সবই যেন পবিত্র থাকে, সেইজন্য তিনি এই উচ্চ পর্যায়ের প্রতিরোধকারী শিক্ষা দান করিয়াছেন। ইহাতে কোন সন্দেহ আছে কি যে, অবাধ মেলামেশায় পদস্থলন ঘটে? যদি আমরা কোন ক্ষুধার্ত কুকুরের সমুখে নরম নরম ঝঁঠি রাখিয়া আশা করি যে, কুকুরের প্রাণে এই ঝঁঠির কোন খেয়াল জন্মিবে না, তবে আমরা আমাদের এই ধারণা পোষণে ভুল করিব। সুতরাং খোদাতা'লা চাহিয়াছেন, কুপ্রবৃত্তি যেন গোপন কার্যের সুযোগ না পায় এবং এমন কোনই লগ্ন বা ক্ষেত্র যেন উপস্থিত না হয়, যাহাতে কুৎসিত আশঙ্কা মাথা চাড়া দিয়া উঠে।

ইসলামী পর্দার ইহাই দার্শনিক তত্ত্ব এবং ইহাই শরীয়তের ব্যবস্থা। খোদার পবিত্র গ্রন্থে পর্দার উদ্দেশ্য ইহা নহে যে, স্ত্রীলোকদিগকে কয়েদীর ন্যায় নজরবন্দী অবস্থায় রাখা। এইরূপ ধারণা সেই সকল অজ্ঞ লোকেরা রাখে যাহারা ইসলামী ব্যবস্থার কোন খবর রাখে না। বরং পর্দার উদ্দেশ্য হইল স্ত্রী পুরুষ উভয়ে পরম্পরাকে অবাধ দর্শন হইতে ও পরম্পরার শোভা-সৌন্দর্যের আকর্ষণ হইতে বিরত থাকা। কারণ ইহাতে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই মঙ্গল। পরিশেষে ইহাও স্বরণ রাখিতে হইবে যে, চোখ অবনত রাখিয়া অসঙ্গত ক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টি নিষ্কেপ করা হইতে আত্মরক্ষা করার এবং সমগ্রভাবে দর্শন-যোগ্য জিনিষ দেখার যে পত্তা, উহাকে আরবী ভাষায় ‘গায়য়েবসর’ বলা হয়। প্রত্যেক সাধু ব্যক্তি, যিনি নিজের হৃদয় পবিত্র রাখিতে চাহেন, তাঁহার পক্ষে মানবেতর জন্মদের ন্যায় যে দিকে ইচ্ছা অবাধে চাহিয়া দেখা উচিত নহে। বরং তাহার পক্ষে সামাজিক জীবনে ‘গায়য়েবসর’-এর অভ্যাস অত্যাবশ্যক। ইহা সেই শুভ এবং আশিসপূর্ণ অভ্যাস, যাহার ফলে তাহার এই স্বভাবজ অবস্থা এক মহান নৈতিক গুণরূপে রূপায়িত হইবে, অথচ তাহার সামাজিক কাজকর্ম সম্পাদনে কোন বিন্দু ঘটিবে না। এই চরিত্র গুণকেই ইহসান ও ইফ্ফাত বা কামবৃত্তির পবিত্রতা বলা হয়।

অকল্যাণ পরিহারের দ্বিতীয় প্রকার খুল্ক (চারিত্রিক গুণ) আমানত ও দিয়ানত (সততা ও বিশ্বস্ততা) নামে পরিচিত। অর্থাৎ অন্যের ধন-সম্পদ অসৎ উপায়ে ও অসদুদ্দেশ্যে হস্তগত করিয়া তাহাকে কষ্ট দেওয়ায় অনীহা ও অসম্মতি। সুতরাং জানা আবশ্যিক, দিয়ানত ও আমানত স্বভাবজ অবস্থাসমূহের অন্যতম। এই জন্য দুধের শিশু, যে অল্প বয়সবশতঃ স্বভাবতই সরলচিত্ত এবং বয়সের স্বল্পতার জন্য এখনও কু অভ্যাসগ্রস্ত হয় নাই, অন্যের জিনিষের প্রতি তাহার এত ঘৃণা থাকে যে, তাহাকে অন্য স্ত্রী লোকের দুঃখ পান করান একটা কঠিন ব্যাপার। বুদ্ধি বিকাশের বয়সের পূর্বে যদি কোন ধাত্রী নিয়োগ করা না হইয়া থাকে, তাহা হইলে বুদ্ধি হইবার বয়সে তাহাকে অন্যের দুধ পান করান অত্যন্ত মুশকিল হইয়া পড়ে এবং সে প্রাণে অনেক কষ্ট সহ্য করিবে, এমনকি এই কষ্টে তাহার প্রাণ ত্যাগের উপক্রম হইবে, তবু সে অন্য স্ত্রীলোকের দুঃখ পান হইতে স্বভাবতই

পরানুর থাকিবে। এত ঘৃণার তাৎপর্য কি? শুধু ইহাই যে, সে মা ছাড়া অন্যের দুর্ধের প্রতি আকৃষ্ট হওয়াকে স্বভাবতই ঘৃণা করে।

আমরা শিশুর এই অভ্যাসের প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করিলে এবং ইহা লইয়া চিন্তা করিলে এবং চিন্তা করিতে থাকিলে যখন শিশুর এই অভ্যাসের মূলে যাইয়া পৌছি, তখন আমাদের নিকট ইহা সুস্পষ্ট হইয়া যায় যে, যে স্বভাব অন্যের জিনিসের প্রতি এত ঘৃণার সৃষ্টি করে, নিজেকে বিপদাপন্ন পর্যন্ত করে, উহাই সততার মূল। সততার স্বভাবগুণে কেহই সৎ ও সত্যবাদী বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে না, যে পর্যন্ত না তাহার হৃদয়ে অন্যের ধন-সম্পদ সম্পর্কে শিশুর ঘৃণার ন্যায় ঘৃণা জন্মে। কিন্তু শিশু এই অভ্যাস সঠিক স্থান কাল ও পরিস্থিতিতে পালন করে না এবং বুদ্ধি না থাকার ফলে সে অনেক কষ্ট পায়। অতএব, তাহার এই অভ্যাস শুধু একটা স্বভাবজ অবস্থা, ইহা ‘খুল্ক’ বা নৈতিকতার পর্যায়ে পড়ে না, যদিও মানুষের প্রকৃতির মধ্যে সততা ও বিশ্বস্ততার উহাই মূল। শিশু তাহার এই অবোধ ক্রিয়ার ফলে যেমন ধার্মিক ও বিশ্বস্ত হওয়ার আধ্যা লাভ করিতে পারে না, তেমনই ঐ ব্যক্তিও এই চরিত্র গুণে গুণবান নহে, যে এই স্বভাবজ অবস্থাকে যথার্থ স্থানে প্রয়োগ বা ব্যবহার করে না। মোট কথা, বিশ্বস্ত ও সৎ হওয়া অত্যন্ত কঠিন। যে পর্যন্ত মানুষ এই গুণের সব দিক পালন না করে সে আমীন ও দিয়ানতদার (বিশ্বস্ত ও সাধু) হইতে পারে না। এ সম্পর্কে নিম্নে উক্ত আয়তগুলিতে আল্লাহত্তা'লা আমানতের নীতি আদর্শ এইভাবে শিক্ষা দিয়াছেন :

وَلَا تُؤْتُوا السَّمَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ
قِيلَّاً وَإِزْرَاقُهُمْ فِيهَا وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ
قُولًا مَغْرُورًا وَابْشِلُوا إِلَيْهِمْ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ
فَإِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشَدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
وَلَا تَأْكُلُوهُمْ إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا وَمَنْ
كَانَ غَنِيًّا فَلَيَسْتَغْفِفُهُ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ
إِلَيْهِمْ مَا عَرَفَ فَإِذَا دَفَعْتُمُ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشِهدُ ذَا
عَلَيْهِمْ وَكَفَةٌ بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ رَالنَّسَاءِ : ৪-৮
وَلَيَخْشَىَ الَّذِينَ لَوْتَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةٌ ضُعْفًا

حَافُوا عَلَيْنِمْ فَلَيَتَّقُوا اللَّهَ وَلَيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا
 إِنَّ الَّذِينَ يَا كُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَمَى ظُلْمًا إِنَّمَا
 يَا كُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَضْلُونَ سَعِيرًا-

(النساء : ١٠-١١)

অর্থাৎ “যদি তোমাদের মধ্যে এমন কোন ধনী ব্যক্তি থাকে, যাহার বুদ্ধি ঠিক নাই, যেমন এতীম বা নাবালক, এবং আশক্ষাও হয় যে, সে তাহার বুদ্ধিহীনতাবশতঃ তাহার ধন-সম্পদ বিনষ্ট করিবে, তবে তোমরা (কোর্ট অব ওয়ার্ডস্রুপে) তাহার সমস্ত ধন-সম্পত্তি অভিভাবক হিসেবে তোমাদের হস্তে গ্রহণ করিবে এবং সেই ধন-সম্পত্তি, যদ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্য চলে এবং জীবিকা নির্বাহ হয়, সেই বুদ্ধিহীনদিগের হাতে সমর্পণ করিবে না এবং সেই সম্পত্তি হইতে তাহাদের প্রয়োজন অনুযায়ী তাহাদের খাওয়া পরার জন্য দিবে এবং তাহাদিগকে উত্তম কথা এবং কাজের কথা বলিবে। অর্থাৎ, এমন কথা, যদ্বারা তাহাদের বুদ্ধি ও বিচার শক্তি বর্ধিত হয়, আর তাহারা অবস্থা অনুযায়ী শিক্ষা লাভ করে এবং অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ থাকিয়া না যায়। তাহারা বণিকের সন্তান হইলে তাহাদিগকে বাণিজ্য পরিচালনার কৌশল শিখাইবে। অন্য ব্যবসায় থাকিলে সেই ব্যবসায়ে তাহাদিগকে পাকা করিবে। যাহা হউক, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে শিক্ষা প্রদান করিবে এবং সময়ে সময়ে পরীক্ষাও করিবে, তোমরা যাহা শিখাইয়াছ তাহা আয়ত্ত করিয়াছে কিনা। অতঃপর বিবাহের উপযোগী হইলে, অর্থাৎ ১৮ বৎসর বয়ঃক্রমে যখন দেখিবে যে, তাহারা তাহাদের ধন-সম্পত্তি রক্ষার বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, তখন তাহাদের ধন-সম্পত্তি তাহাদিগকে সমর্পণ করিবে। তাহাদের ধন-সম্পদ অপব্যয় করিবে না। বড় হইলে তাহাদের ধন-সম্পদ তাহারা ফিরাইয়া লইবে, এই ভয়ে শীত্র শীত্র তাহাদের ধন-সম্পদের কোন ক্ষতি করিবে না। অভিভাবকত্ত করার জন্য, ধনী ব্যক্তির পক্ষে তাহাদের অর্থ হইতে কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করা উচিত নহে। কিন্তু অভিভাবক যদি বিত্তহীন হয়, তবে ন্যায্য পরিমাণে পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতে পারিবে।”

আরবে অর্থ সংরক্ষকদের এই রীতি প্রসিদ্ধ ছিল যে, এতীমের কার্য-নির্বাহককে এতীমের ধন-সম্পদ হইতে কিছু গ্রহণ করিতে হইলে, যথাসম্ভব এই নিয়ম পালন করিত যে, এতীমের অর্থে বাণিজ্য দ্বারা যে লাভ হইত, তাহা হইতে নিজেও লইত। কিন্তু মূলধন বিনষ্ট করিত না। সুতরাং এখানে এই প্রথার প্রতি ইংগিত করিয়া বলা হইয়াছে, ‘তোমরাও এই প্রকার করিবে।’ অতঃপর

বলিয়াছেন : “এতীমের ধন-সম্পদ প্রত্যর্পণের সময় সাক্ষীর সম্মুখে প্রত্যর্পণ করিবে (৪:৬-৭)। দুর্বল ও অল্প বয়স্ক সন্তান থাকিলে অত্িম সময়ে এমন কোন ওসীয়ত বা উইল করিবে না, যদ্বারা তাহাদের স্বার্থহানি হয়। যাহারা এই প্রকারে এতীমের ধন-সম্পদ ভোগ করে, যাহাতে তাহাদের প্রতি যুলুম করা হয়, তাহারা ধন-সম্পদ ভোগ করে না বরং আগুন ভোগ করে। তাহারা পরিশেষে, দন্ধকারী অগ্নিতে নিষ্কিঞ্চ হইবে’ (৪:১০-১১)।

এখন দেখ, খোদাতা’লা সততা ও বিশ্বস্ততার কত দিক শিক্ষা দিয়াছেন। সুতরাং বর্ণিত সব দিক প্রতিপালিত হইলে, তবেই উহাকে প্রকৃত সততা ও বিশ্বস্ততা বলিবে। নতুবা যদি পুরাপুরি বিচার ও বুদ্ধির সাথে বিশ্বস্ততার সব দিকে লক্ষ্য রাখা না হয়, তবে এই প্রকার সততা ও বিশ্বস্ততার সাথে অনেক প্রকারের গুপ্ত অবিশ্বস্ততা, গোপন খেয়ানতও (আত্মসাৎ) লুকায়িত থাকিবে। তারপর অন্যত্র বলিয়াছেন :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ وَتَذَلُّلُوا بِهَا إِلَيَّ

الْحَكَامِ لِنَأْكُلُوا فِرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأَدْشِيمِ

وَآثِمُمْ تَعْلَمُونَ - ر.البقرة: ١٨٩

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْنَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا - ر.التَّسَاءُ (٥٩)

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ - ر.الأنفال: (٥٩)

أَذْفَنُوا إِنْكَيْلَ وَزِنْوَا

بِالْقِسْطَابِis الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَنْخِسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ

وَلَا تَغْشُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ - ر.الشعراء: (١٨٦-١٨٢)

وَلَا تَتَبَدَّلُوا إِلَيْخِيَّ بِالْطَّيْبِ - ر.النَّاءُ: (٣)

অর্থাৎ “তোমরা আপোসের মধ্যে একে অন্যের ধন-সম্পদ ভোগ করিও না এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ঘুষরূপে কর্তৃপক্ষের নিকট এই উদ্দেশ্য লইয়া পেশ করিবে না যে, এই প্রকারে কর্তৃপক্ষের সাহায্যে অন্যের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করিতে পারিবে (২:১৮৯)। গচ্ছিত ধন (আমানত) প্রকৃত হক্দারকে প্রত্যর্পণ করিবে (৪:৫৯)। খোদা খেয়ানতকারী (গচ্ছিত ধনে হস্তক্ষেপকারী)-দিগকে পসন্দ করেন না (২৬:১৮৪)। তোমরা মাপের সময় পুরা মাপিবে এবং ওজনের সময় পুরা ওজন করিবে। নির্দোষ দাঁড়ি পাল্লা দিয়া ওজন করিবে(১৭:৩৬)।

কোন প্রকারে কাহারও অর্থের ক্ষতি করিবে না। ফেডনা-ফাসাদের সংকল্প লইয়া পৃথিবীতে চলাফেরা করিবে না (২৬:১৮৪)। চুরি, ডাকাতি, পকেট কাটা বা অন্য কোন অবৈধ উপায়ে অন্যের ধন-সম্পদ করায়ও করিবার সংকল্প রাখিবে না।” অতঃপর আরো বলেন : “তোমরা ভাল জিনিসের পরিবর্তে খারাপ বা বাতিল জিনিষ দিবে না” (৪:৩)। অর্থাৎ অন্যের ধন-সম্পদ আস্তসাং করা যেমন অবৈধ, তেমনই মন্দ জিনিষ বিক্রয় করা বা ভালর পরিবর্তে মন্দ দেওয়াও অবৈধ।

এই আয়াতগুলিতে খোদাতা’লা অসততার যাবতীয় দিক বর্ণনা করিয়াছেন এবং এরপ পরিপূর্ণ উপদেশ দিয়াছেন, যাহার পর অসততার কোন দিক আলোচনার বাকী নাই। শুধু এই কথাই বলেন নাই যে, চুরি করিও না, যাহার ফলে কোন নির্বোধ যেন মনে না করে যে, চুরি করা তাহার জন্য হারাম, কিন্তু অন্য সকল প্রকার অবৈধ উপায় হালাল। এই পূর্ণাঙ্গীন উপদেশ দ্বারা যাবতীয় অবৈধ উপায়কে নিষিদ্ধ নির্ধারণ করার মধ্যে সেই প্রজ্ঞাই নিহিত আছে। বস্তুতঃ যদি কেহ সূক্ষ্ম জ্ঞান ও দৃষ্টি দিয়া সততা ও বিশ্বস্ততা সম্বলিত এই চরিত্রগুণ নিজের মধ্যে না পায় এবং ইহার সব দিক পালন না করে, তবে সে আমানত-দিয়ানতের কোন কোন বিষয়ে সৎকর্ম করিলেও, ইহা তাহার নৈতিক গুণ ও সততা বলিয়া গ্রাহ্য হইবে না। বরং উহা বিচার-বুদ্ধি ও জ্ঞান বিবর্জিত এক স্বাভাবিক অবস্থা হইবে মাত্র।

অকল্যাণ পরিহার সংক্রান্ত নৈতিক গুণের তৃতীয় অবস্থাকে আরবীতে ‘হৃদনা ও ‘হাউন’ বলে। অর্থাৎ, অন্যের প্রতি যুলুম করিয়া কাহাকেও দৈহিক কষ্ট না দেওয়া, নিরূপদ্রব মানুষ হওয়া এবং শান্তির সহিত জীবন যাপন করা।” ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, শান্তিপ্রিয়তা একটি উচ্চ পর্যায়ের নৈতিক গুণ এবং ইহা মানবতার জন্য অত্যাবশ্যক। এই নৈতিক গুণের উপযোগী মানব শিশুর মধ্যে যে প্রকৃতিগত শক্তি থাকে, যাহা সুনিয়ন্ত্রিত হইয়া খুলক্ বা নৈতিক গুণে পরিণত হয়, উহা হইতেছে উলফত (فُلْفَت), অর্থাৎ, সুশীলতা। ইহা সুস্পষ্ট যে, শুধু স্বভাবজ অবস্থায়, যখন মানুষের বুদ্ধি ও বিচার ক্ষমতার উন্নেষ হয় না, তখন সে শান্তি কি, বা সংঘাত কি, কিছুই বুঝিতে পারে না। সুতরাং, তখন তাহার মধ্যে মিলামিশার যে অভ্যাস পাওয়া যায়, উহাই শান্তিপ্রিয়তা অভ্যাসের এক শিকড়। কিন্তু বুদ্ধি-বিবেচনা এবং বিশেষ মননশীলতা দ্বারা পরিচালিত হয় না বলিয়া ইহা খুলক্ বা নৈতিক গুণের অন্তর্ভুক্ত নহে। উহা নৈতিক গুণের অন্তর্ভুক্ত তখনই হইবে, যখন মানুষ আকাঞ্চ্ছা দ্বারা আপনাকে নিরূপদ্রব রূপে গড়িয়া তুলিয়া শান্তিপ্রিয়তার নৈতিক গুণকে সঠিক পরিবেশে ব্যবহার করিবে এবং অযৌক্তিক ব্যবহার হইতে নিবৃত্ত থাকিবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ জাল্লা শানুহ এই শিক্ষা দেন :

وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ - (الأنفال: ٢)
 وَالصُّلْحُ خَيْرٌ - (النساء: ١٢٩)
 وَإِنْ جَنَحُوا لِسَلْمٍ فَاجْنِحْ لَهُمْ - (الأنفال: ٧٨)
 عِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَنْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هُنَّا رَفِيقَانِ (الفرقان: ٦٤)
 وَإِذَا أَمْرُوا بِالْتَّغْوِيْمِ رَأَيْكُمْ - (الفرقان: ٧٣)
 إِذْ قُمْ بِالْقِنْ هِيَ أَخْسَنُ فِيَّا الَّذِي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ
 عَدَوَّةٌ كَآنَهُ وَلِيُّ حَمِيمٌ - (رَحْمٌ: ٣٥)

অর্থাৎ, “পরম্পর সন্তাবের সহিত বসবাস করিবে (৮:২)। সন্তাবেই মঙ্গল নিহিত (৪:১২৯)। অন্যেরা শান্তি স্থাপন করিতে চাহিলে, তোমরাও শান্তির জন্য অগ্রসর হইবে ((৮:৬২))। খোদার পুণ্যবান বান্দাগণ শান্তির সহিত পৃথিবীতে চলেন (২৫:৬৪)। যদি তাহারা কাহারও মুখে কোন বৃথা কথা শোনে, যাহা সংঘাতের সূচনা করে এবং বিবাদের ভূমিকা হয়, তাহা হইলে তাহারা গান্ধীর্যের সহিত উহাকে পাশ কাটাইয়া চলিয়া যায় (২৫:৭৩) এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া লড়াই আরম্ভ করে না।” অর্থাৎ যে পর্যন্ত অধিক কষ্ট দেওয়া না হয়, হাঙ্গামায় প্রবৃত্ত হওয়াকে তাহারা ভালোবাসে না। শান্তিপূর্ণ পরিবেশের পরিচয় লাভের ইহাই নীতি। ছোট খাট বিষয়কে কোন গুরুত্ব দিবে না। ক্ষমা করিবে। এই আয়তে ‘লাগ্ব’ (لغو) শব্দ আছে। জানা আবশ্যিক যে, আরবীতে লাগ্ব (لغو) বলিতে সেইরূপ ক্রিয়াকলাপকে বলে, যেমন কোন ব্যক্তি কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে দুষ্টামি করিয়া উক্ফানিমূলক কথা বলে, যদ্বারা কোন প্রকৃত ক্ষতি হয় না। সুতরাং শান্তিপ্রিয়তার লক্ষণ এই যে, এই প্রকার বৃথা কষ্টদানে ভ্রক্ষেপ না করিয়া গান্ধীর্য অবলম্বন করা। কিন্তু কষ্ট দান যদি শুধু লাগ্ব-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া তদ্বারা প্রকৃতই প্রাণ, ধন-সম্পদ বা সম্মান আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে শান্তিপ্রিয়তার নৈতিক গুণের সহিত ইহার কোনও সম্পর্ক থাকিবে না। অবশ্য, এই প্রকার অপরাধ ক্ষমা করিলে ইহাকে সেই নৈতিক গুণ বলা হইবে যাহার নাম আফ্ট (عفو)। (এই বিষয়ে ইন্শা-আল্লাহ্ পরে আলোচনা করা হইবে) অতঃপর বলা হইয়াছে : “দুষ্টামি করিয়া কেহ বাজে কথা বলিলে তোমরা তাহাকে সৎভাবে শান্তিপূর্ণ জবাব দিবে। তখন এই আচরণে শক্তও বন্ধুতে পরিণত হইবে” (৪:৩৫)। বস্তুতঃ, শান্তি ও সন্তাব বজায় রাখিতে গিয়া অন্যায়ের প্রতি ভুক্ষেপ না করার সীমা শুধু এ পর্যন্তই হইবে যদ্বারা প্রকৃতই কোন অনিষ্ট হয় না এবং শক্তির কেবল বৃথাই বাক্য ব্যয় হয়।

অকল্যাণ বর্জনের চতুর্থ প্রকার ‘খুল্ক’ হইল(قُلْ سِنِّي)ন্মতা ও(সদালাগ)।
এই নৈতিক গুণ যে স্বভাবজ অবস্থা হইতে সৃষ্টি হয়, উহাকে বলে তালাকত
(অর্থ, প্রফুল্ল-চিত্ততা)। শিশু যতদিন কথা বলিতে পারে না, ততদিন সে
ন্মতা ও উত্তম বাক্যের স্থলে প্রফুল্ল-চিত্ততা প্রদর্শন করে। ইহাই এ কথার প্রমাণ
যে, ন্মতার মূল, যেখান হইতে এই বৃক্ষ জন্মায়, উহা তালাকত। তালাকত
(প্রফুল্ল-চিত্ততা) একটা শক্তি এবং ন্মতা একটি নৈতিক গুণ, যাহা এই শক্তিকে
যথাস্থানে ব্যবহারে সৃষ্টি হয়। এ সম্পর্কে খোদাতা'লার শিক্ষা এই :

وَقُولُوا لِلشَّاَسِ حُسْنًا۔ رَالبَرْقَة: ٨٤،
لَا يَسْتَحْزَقُونَ مِنْ تَفْوِيمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ
وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نَسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ
وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنْبِرُوا بِالْأَنْقَابِ۔ رَالْحُجَّرَات: ١٢،
إِخْتِنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظِّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظِّنِّ إِثْمٌ وَلَا
تَجْتَسِنُوا وَلَا يَغْتَبِبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ تَوَابُ رَحِيمٌ۔ رَالْحُجَّرَات: ١٣،
وَلَا تَنْقُتْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمَمَ وَالْبَصَرَ
وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُلَةً رَبِّي اسْمَاعِيل: ٣٧

অর্থাৎ, “লোকের নিকট ঐ কথাই বলিবে, যাহা প্রকৃতপক্ষে ভাল। (২৪৪)
এক জাতি অন্য জাতিকে উপহাস বা নিন্দা করিবে না। হইতে পারে যাহাদিগকে
উপহাস করা হয়, তাহারাই ভাল। কোন স্ত্রী লোক কোন স্ত্রীলোককে ঠাট্টা করিবে
না। হইতে পারে যাহাকে ঠাট্টা করা হয়, সে-ই ভাল। কাহারও দুর্নাম করিবে
না। আপন জনের খারাপ নামকরণ করিবে না (৪৯:১২)। সন্দেহের বশে কিছু
বলিবে না। কখনও খোঁচাইয়া খোঁচাইয়া দোষ জিজ্ঞাসা করিবে না। একে অন্যের
কুৎসা করিবে না (৪৯:১৩)। কাহারও বিরুদ্ধে সেই অপবাদ সৃষ্টি বা অভিযোগ
আনয়ন করিবে না, যাহার কোন প্রমাণ তোমাদের নিকট নাই। স্মরণ রাখিবে,
প্রত্যেক ইন্দ্রিয়কে জবাবদিহি করিতে হইবে—কান, চক্ষু, অন্তর প্রত্যেকের নিকট
জিজ্ঞাসা করা হইবে” (১৭৪৩৭)।

কল্যাণ সাধনের উপায়সমূহ

অকল্যাণ পরিত্যাগের কথা বলা শেষ হইয়াছে এবং এখন আমরা ‘ইসালে খায়ের’ বা কল্যাণ সাধনের উপায়সমূহ বর্ণনা করিতেছি।

দ্বিতীয় প্রকার নৈতিক চরিত্রের গুণাবলী হইল কল্যাণ-সাধন সম্পর্কিত। তন্মধ্যে প্রথম নৈতিক গুণ হইল আফ্ট (عفواً)- অর্থাৎ কাহারো অপরাধ ক্ষমা করিয়া দেওয়া। ইহাতে নিম্নরূপ কল্যাণ সাধিত হয়। এক ব্যক্তি অন্যকে কষ্ট দেয় বা তাহার ক্ষতি সাধন করে বলিয়া সে অপরাধী সাব্যস্ত হয়। অপরাধীর শাস্তি হওয়া উচিত। এই শাস্তি আইনের মাধ্যমে দেওয়া যাইতে পারে। অপরাধীর জেল-জরিমানা হইতে পারে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি অন্যভাবেও তাহাকে নিজে সরাসরি শাস্তি দিতে পারে। এমতাবস্থায়, অপরাধী ব্যক্তি ক্ষমা দ্বারা সংশোধনযোগ্য বিবেচিত হইলে, যদি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি অপরাধীকে ক্ষমা করিয়া দেয়, তাহা হইলে উভয়েরই হিত-সাধন হইবে। এক্ষেত্রে কুরআন শরীফের শিক্ষা হইল :

وَالْكَفِيفِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ - رَأْلِ عِمَرَانَ: ١٣٥

جَزُوا سِتَّةً سِتَّةً مِثْلًا هُوَ مَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ

فَاجْرُهُ عَلَى اللَّهِ - الشَّوْرَى: ٤١

অর্থাৎ, “তাহারা সাধু, যাহারা ক্রোধ দমন করিবার স্থানে তাহাদের ক্রোধ দমন করে এবং ক্ষমার উপযোগী ক্ষেত্রে অপরাধ ক্ষমা করে (৩:১৩৫)। অন্যায়ের প্রতিফলের পরিমাণ ততটুকুই যতটুকু অন্যায় করা হইয়াছে। কিন্তু যে ব্যক্তি অপরাধ ক্ষমা করে এবং এমন পরিস্থিতিতে ক্ষমা করে যে, তাহাতে অপরাধীর ইসলাহ (সংশোধন) হয় এবং তাতে কোন অমঙ্গল সৃষ্টি হয় না, অর্থাৎ, ক্ষমা যদি সঠিক ক্ষেত্রে করা হয়, তাহা হইলে ক্ষমাকারী ইহার পুরস্কার পাইবে” (৪:৪১)।

এই আয়াতে বর্ণিত কুরআনী শিক্ষা ইহা নহে যে, উচিত অনুচিত সব ক্ষেত্রে অন্যায়ের প্রতিরোধ না করা এবং দুষ্ট ও অত্যাচারীদিগকে শাস্তি না দেওয়া। বরং শিক্ষা এই যে, ক্ষেত্র ও পরিস্থিতি অনুযায়ী অপরাধ ক্ষমার যোগ্য, না শাস্তির যোগ্য তাহা বিবেচনা করিয়া অপরাধীদের জন্য এবং জনসাধারণের জন্য যাহা প্রকৃতই মঙ্গলজনক, সেই উপায়ই অবলম্বন করিতে হইবে। কোন কোন ক্ষমার ফলে, অপরাধী তওবা (প্রত্যাবর্তন) করে এবং কোন কোন অপরাধী ক্ষমার ফলে আরো দুঃসাহসী হয়। সুতরাং, খোদাতা'লা বলেন, অঙ্গের ন্যায় শুধুই অপরাধ ক্ষমার অভ্যাস করিবে না, বরং অভিনিবেশ সহকারে দেখিবে যে, প্রকৃত পুণ্য কোথায়, ক্ষমায়, না শাস্তি দেওয়ায়? সুতরাং, যাহা ক্ষেত্রপোযোগী, তাহাই করিবে। ব্যক্তির দিক হইতে মানুষকে দেখিলে পরিষ্কার জানা যায় যে, কোন

কোন মানুষ অত্যন্ত প্রতিহিংসা পরায়ণ হইয়া থাকে। এমন কি তাহারা পিতামহ, প্রপিতামহের আমলের প্রতিহিংসা ও স্বরণ রাখে। তেমনই কোন কোন মানুষ ক্ষমা করা ও অন্যায়ের প্রতি দ্রুক্ষাত না করার অভ্যাসে একেবারে চরমে পৌছায়। অনেক সময় এই অভ্যাসের সীমা মহা নির্লজ্জতায় পৌছে এবং এমন লজ্জাক্ষর বিষয়েও ক্ষমা দেখায় ও উপেক্ষা প্রদর্শন করে, যাহা কুকাজের প্রতি ঘৃণা, আত্মসম্মান, চরিত্রের পবিত্রতা ও সতীত্বের সম্পূর্ণ বিরোধী। এমনকি তাহা সাধু জীবনের উপর কলঙ্ক আনয়ন করে। এইরূপ ক্ষমা ও অন্যায়ের প্রতি এইরূপ উপেক্ষা দর্শনে সকলেই ধিক্কার দিতে বাধ্য হয়। এই সকল অপকারিতার কারণে কুরআন করীম প্রত্যেক নৈতিক গুণের জন্য ক্ষেত্র ও সময়ের শর্ত বাঁধিয়া দিয়াছে এবং অস্থানে, অসময়ে, অপাত্রে প্রকাশিত কোন নৈতিক গুণকে কুরআন মঙ্গুর করে না।

স্বরণ রাখিতে হইবে যে, ক্ষমা মাত্রই নৈতিক গুণ বলিয়া আখ্যায়িত হইতে পারে না। উহাকে স্বভাবজ শক্তি বলা যাইতে পারে। ইহা শিশুদের মধ্যেও পাওয়া যায়। শিশুকে কেহ দুষ্টামি করিয়াও আঘাত করিলে, শিশু অল্পক্ষণ পরেই ব্যাপারটি ভুলিয়া যায় এবং পুনরায় সাদরে তাহার নিকট যায়। এইরূপ, মানুষ তাহাকে বধ করিবার সংকল্প করিয়া থাকিলেও সে শুধু মিষ্টি কথায় তুষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং, এইরূপ ক্ষমা কোন প্রকারেই নৈতিক গুণের অন্তর্গত নহে। কোন গুণ তখনই নৈতিক বলিয়া গণ্য হইবে, যখন আমরা উহাকে ক্ষেত্র ও কাল অনুযায়ী ব্যবহার করিব। নচেৎ ইহা শুধু একটি স্বভাবজ প্রবণতা হিসাবেই বিবেচিত হইবে। পৃথিবীতে এমন ব্যক্তি খুব কম আছে, যাহারা স্বভাবজ শক্তি ও নৈতিক গুণের মধ্যে তারতম্য করিতে পারে। আমরা বার বার বলিয়াছি, প্রকৃত নৈতিক গুণের সহিত সর্বদা ক্ষেত্র ও কালের সমন্বয় থাকে। স্বভাবজ শক্তি অস্থানেও প্রকাশিত হয়। চতুর্পদ জন্মের মধ্যে গাভী এবং ছাগ নিরীহ প্রাণী, কিন্তু একই কারণে ইহাদেরকে নৈতিক গুণে ভূষিত বলিয়া আখ্যায়িত করা যায় না। কেননা ইহাদিগকে ক্ষেত্র ও কাল বিচারের বুদ্ধি দেওয়া হয় নাই। খোদার প্রজ্ঞা এবং খোদার সত্য ও পরিপূর্ণ গ্রন্থ প্রত্যেক নৈতিক গুণের ক্ষেত্রে স্থান-কাল-পাত্রের শর্ত আরোপ করিয়াছে।

কল্যাণ সাধন সম্পর্কিত নৈতিক গুণাবলীর মধ্যে দ্বিতীয় হইতেছে ন্যায়-পরায়ণতা তৃতীয় কৃপা (حُسْن) এবং চতুর্থ আত্মীয়তা সুলভ ঔদায়, (ذِي الْقَرْبَى) যেরূপ আল্লাহতা'লা বলিয়াছেন :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ
ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ - (النحل، ٩١)

“আল্লাহতা’লার আদেশ, পুণ্যের বদলে পুণ্য কর এবং যদি আদল (ন্যায়পরায়ণতা) হইতে বাড়িয়া এহ্সান (দয়া-পরোপকারী) করার সুযোগ ও ক্ষেত্র পাও, তাহা হইলে সেখানে এহ্সান কর এবং যদি এহ্সান হইতে বাড়িয়া আত্মীয়সুলভ স্বভাবজ আবেগে কল্যাণ করার ক্ষেত্র পাও, তাহা হইলে সে স্থানে স্বভাবজ সহানুভূতিতে কল্যাণ কর। খোদাতা’লা তোমাদিগকে স্থান-কাল- পাত্রের উপযোগিতার সীমা লংঘন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। বুদ্ধি-বিবেচনা ও বিবেক যেখানে সায় দেয় না, সেখানে এহ্সান করা, কিংবা যেখানে সায় দেয় সেখানে এহ্সান না করা, কিংবা যোগ্য ক্ষেত্রে আত্মীয়সুলভ করণ প্রদর্শনে বিরত থাকা, মহান আল্লাহ নিষেধ করিয়াছেন। আবার বাড়াবাড়ি করিয়া অথবা করণ প্রদর্শনও নিষিদ্ধ করিয়াছেন” (১৬:৯১)। এই আয়াতে কল্যাণ বা কল্যাণ সাধনের ইসালে থায়রের তিনটি স্তরের কথা বলা হইয়াছে।

প্রথম স্তর হইল কল্যাণের বদলে কল্যাণ করা। ইহা নিম্নস্তর এবং নিম্নস্তরের ভাল মানুষও এই গুণ অর্জন করিতে পারে। মানুষ তাহারই মঙ্গল করে, যে তাহার মঙ্গল করিয়া থাকে।

দ্বিতীয় স্তর অপেক্ষাকৃত কষ্টকর। উহা এই যে, প্রথমেই নিজে পুণ্য করা এবং কাহারও প্রাপ্য ছাড়াই তাহার প্রতি এহ্সান করিয়া উপকার করা। ইহা মধ্যবর্তী স্তরের গুণ। অধিকাংশ লোক গরীবদের প্রতি এহ্সান (দয়া-দাক্ষিণ্য ও পরোপকার) করিয়া থাকে। এহ্সানের মধ্যে এক গুণ ক্রটি থাকে। এহ্সানকারী মনে করে যে, সে এহ্সান করিয়াছে এবং সে কমপক্ষে তাহার এহ্সানের বদলে কৃতজ্ঞতা বা দোয়া কামনা করে। যদি এহ্সান প্রাপ্তি কোন ব্যক্তি তাহার বিরোধী হইয়া যায়, তখন সে তাহাকে অকৃতজ্ঞ আখ্যা দেয়। কখনও কখনও এহ্সানপ্রাপ্তি ব্যক্তির উপর ক্ষমতাত্ত্বিক বোৰ্কা চাপাইয়া দেয় এবং স্বীয় এহ্সান স্মরণ করায়। আল্লাহতা’লা এহ্সানকারীদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেনঃ

لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْتِنْ وَالْأَذْهَابِ - (البقرة: ٢٤٥)

“হে এহ্সানকারীগণ! তোমাদের সদকাসমূহের ভিত্তি অকপটতার উপর হওয়া চাই। এহ্সানসমূহকে স্মরণ করাইয়া মনে দুঃখ দিয়া, উহার পুণ্যকে ধ্বংস করিও না (২:২৬৫)।” সদ্কা শব্দটি সিদ্ধক (অকপট) হইতে উদ্ভৃত। সুতরাং যদি হৃদয়ে সিদ্ধক এবং এখলাস (নিষ্ঠা) না থাকে, তাহা হইলে সেই সদ্কা আর সদ্কা থাকে না, বরং উহা কপটতার কাজ হইয়া থাকে। অতএব এহ্সানকারীর মধ্যে এক ক্রটি থাকে যে, সে কখনও ক্রোধাত্তিত হইয়া স্বীয় এহ্সান স্মরণ করাইয়া দেয়। সেই জন্য খোদাতা’লা এহ্সানকারীগণকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন।

কল্যাণ সাধনের তৃতীয় পর্যায় সম্বন্ধে খোদাতা’লা বলেন যে, এহ্সান করার কথা একটুও স্মরণ করিবে না এবং কৃতজ্ঞতার প্রতি কোন দৃষ্টিপাত করিবে না। বরং এমন এক সহানুভূতির প্রেরণা নিয়া পরোপকার করিবে, যেমন অতি ঘনিষ্ঠ

আঞ্চলিক প্রতি করা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, শুধু মনের আবেগেই মাতা পুত্রের প্রতি কল্যাণময় আচরণ করেন। ইহা কল্যাণ সাধনের চূড়ান্ত পর্যায়, উহা ডিঙাইয়া উন্নতি করা সম্ভবপর নহে। কিন্তু খোদাতালা কল্যাণ সাধনের এই সব বিভাগকেই স্থান-কাল-পাত্রের সহিত সংবন্ধ করিয়াছেন। আলোচনাধীন আয়তে তিনি পরিষ্কার বলিয়াছেন যে, এই সদাচারগুলি যথাস্থানে ব্যবহৃত না হইলে, এইগুলি অনাচারে পরিণত হইবে। ন্যায়পরায়ণতা (عل) অশ্লীলতা (فُحش) রূপান্তরিত হইবে। অর্থাৎ, সীমার বাহিরে গেলেই ইহা অপবিত্র রূপ ধারণ করিবে। তেমনি এহসান-এর পরিবর্তে মুন্কার এর রূপ প্রকাশ পাইবে। অর্থাৎ, বিচার-বুদ্ধি ও বিবেক উহাকে প্রত্যাখ্যান করিবে এবং উহার স্বরূপ এমন হইয়া যাইবে যে, আঞ্চলিক-সুলভ মমতা (بُنْيٰ) বিদ্রোহে পরিণত হইবে। অর্থাৎ, পরিস্থিতির অনুপযোগী সহানুভূতির আবেগ এক কৃৎসিত অবস্থার সৃষ্টি করিবে। প্রকৃতপক্ষে, বাগই (بنی) শব্দ দ্বারা অতিবৃষ্টিকে বুঝায়, যাহা সীমার অধিক বর্ষণ করে এবং ক্ষেতসমূহকে ধ্বংস করে। আবার, ন্যায্য দাবীর খর্বতাকেও বাগই বলা হয় এবং ন্যায্য দাবীর বা অধিকারের আধিক্যও বাগই (بنی)।

বস্তুতঃ এই তিনটিই, সঠিক ক্ষেত্রে প্রকাশিত না হইলে কুচরিত্বে পরিণত হইবে। এই জন্যই এই তিনটি গুণের সহিত স্থান-কাল-পাত্রের শর্ত লাগান হইয়াছে। এখানে স্বরণ রাখিতে হইবে যে, কেবল আদল, কেবল এহসান, কেবল আঞ্চলিক-সুলভ ব্যবহার নৈতিক গুণ বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না বরং মানুষের মধ্যে এইগুলি সবই স্বত্ত্বাবজ্ঞাত অবস্থা এবং প্রকৃতিগত শক্তি, যাহা শিশুর মধ্যেও জ্ঞান উন্মোচনের পূর্বে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু নৈতিক গুণ হওয়ার জন্য বুদ্ধি বিবেচনা ও বিবেক প্রয়োগের শর্ত বিদ্যমান। আরো শর্ত এই যে, প্রত্যেক সহজাত শক্তিকে সঠিক ক্ষেত্রে ও সঠিক সময়ে ব্যবহার করিতে হইবে।

এহসান সম্বন্ধে কুরআন শরীফে আরও জরংরী নির্দেশ বা হেদায়াতসমূহ রহিয়াছে। ঐ সবগুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিবার জন্য পূর্বে (الفَلَام) ‘আল’ শব্দ ব্যবহার করিয়া স্থান-কাল-পাত্রের দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। যেমন, তিনি বলিয়াছেন : **يَا يَهَا الَّذِينَ أَمْتَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طِبَّابِتِ مَا كَسَبُتُمْ.**

وَلَا تَيْمِنُوا الْخَيْثَثِ مِنْهُ - (البقرة: ١٧٨)

لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمِنْ وَالْأَذْرِ كَالَّذِي

يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ - (البقرة: ١٧٩)

وَآخِرِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ - (المরاث: ١٩٦)

إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشَرِّبُونَ مِنْ كَانَ مِزَاجَهَا كَافُورًا -

عَيْنَاهُ يَشَرِّبُ بِمَا عَبَادَ اللَّهُ يُفَجِّرُهُ نَهَا تَفْجِيرًا -

وَيُطِيعُونَ الطَّعامَ عَلَى حِبَّتِهِ مِسْكِينًا وَبَرِيًّا

وَآسِيًّا - إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ كَلَّا نُرِيدُ

مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا - (الدَّهْر: ١٠٠)

وَأَتَّى النَّاسَ عَلَى حِبَّتِهِ ذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَ

الْمَسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي

الرِّقَابِ - (البَقْرَة: ١٧٨)

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا أَتْمَدُّ يَسِّرُ قُوَّا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَ

كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً - (الْفَرقَان: ٤٨)

وَالَّذِينَ يَصِلُّونَ مَا أَمْرَاهُمْ بِهِ أَنْ يُؤْصَلَ

وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ (الرَّعْد: ٤٢)

وَفِي آمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلْسَّائِلِ وَالْمُخْرُومِ - (الذِّرَى: ٢٠)

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالصَّرَاءِ - (آلِ عُمَرَ: ١٣٥)

وَأَنْفَقُوا أَمْتَارَ ثِنَهُمْ سِرَّاً وَعَلَانِيَةً - (الرَّعْد: ٤٣)

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِيلِينَ

عَلَيْهِمَا وَالْمَوْلَفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالغُرْمِينَ

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيَضَهُ مِنَ اللَّهِ

وَاللَّهُ عَلِيهِمْ حَكِيمٌ - (تَوْبَة: ٤٠)

َنَسْتَأْلُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحْبَبُونَ - رَأَى عُمَرٌ : ٩٣

وَاتِّذَا الْقُرْبَى حَقَّةً وَالْمَسِكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ

وَلَا يَبْدِئُ زَانِيَرًا - بَنَى اسْرَائِيلَ : ٤٧

بِالْوَالِدَيْنِ إِخْسَانًا وَبِذِهَبِ الْقُرْبَى وَالْيَتَمَّيْ

وَالْمَسِكِينَ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ

وَالصَّاحِبِ بِالْجُنُبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ

آيَمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا

نَخْوَرًا - إِلَّاَذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ

بِالْبَخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ -

النَّسَاءُ : ٣٨-٣٧

অর্থাৎ “হে ইমানদারগণ তোমরা ঐ ধন হইতে লোকদিগকে বদান্যতা, কৃপা বা সদকা ইত্যাদির আকারে দাও, যাহা তোমাদের পবিত্র উপার্জন।” অর্থাৎ যাহার মধ্যে চুরি, ঘুষ, গচ্ছিত ধনের তসরুপ বা বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা অর্জিত সম্পদ, কিংবা যুলুম-লক্ষ টাকার মিশ্রণ নাই। অপবিত্র অর্থ হইতে দান করিবে, এই সংকল্প হইতে তোমাদের হৃদয় যেন দূরে থাকে (২:২৬৮)। এবং দ্বিতীয় বিষয় এই যে, তোমাদের দান খয়রাত ও বদান্যতার খেঁটা দিয়া গ্রহীতার মনে কষ্ট দিয়া পুণ্য নষ্ট করিবে না। অর্থাৎ, অনুগৃহীত ব্যক্তিকে ইহা বা উহা দিয়াছ একথা কখনও বলিবে না এবং তাহাকে দুঃখ দিবে না। কারণ ইহার দ্বারা তোমাদের এহ্সান পও হইয়া যাইবে। আর এই পন্থাও অবলম্বন করিবে না যে, তোমরা তোমাদের অর্থ লোক দেখানোর জন্য ব্যয় কর (২:২৬৫)। খোদার সৃষ্টি জীবের প্রতি এহ্সান (স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উপকার) করিবে। কারণ খোদা এহ্সানকারীদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেন (২:১৯৬)। যাহারা প্রকৃত পরোপকার করে, তাহাদিগকে কর্পূর মিশ্রিত পানীয়ের পাত্র হইতে পান করান হইবে”

(৭৬৪৬-৭)। অর্থাৎ, পার্থিব জ্বালা, হতাশা এবং অপবিত্র অভিলাষ তাহাদের হৃদয় হইতে দূরীভূত করা হইবে। কর্পুর 'কাফারা' (ক্ষেত্র) হইতে ব্যৎপন্ন। আরবী ভাষায় 'ক্ষেত্র' চাপা দেওয়া বা আবৃত করাকে বুঝায়। অর্থাৎ তাহাদের অবৈধ উত্তেজনাসমূহকে দমিত করা হইবে। এবং তাহারা পবিত্র-চিত্ত হইয়া যাইবে এবং তাহারা মা'রেফাতের (তত্ত্ব-জ্ঞানের) শীতলতা লাভ করিবে।

তারপর বলিয়াছেন : “এই ব্যক্তিগণ (কিয়ামতে) সেই প্রস্তবণের পানি পান করিবে, যাহা তাহারা নিজের পুণ্য দ্বারা স্বহস্তে প্রবাহিত করিতেছে।” এখানে বেহেশ্ত তত্ত্বের এক গভীর রহস্যও ব্যক্ত হইয়াছে। যাহারা বুঝিতে চাহে, তাহারা বুঝিতে পারে। তারপর বলিয়াছেন : প্রকৃত সাধু কর্মাদের স্বভাব এই যে, তাহারা শুধু খোদার প্রতি ভালবাসার কারণে, যে খাদ্য নিজেরা ভালবাসে, তাহাই মিসকীন, এতীম এবং কয়েদীগণকে খাওয়ায় এবং বলে, “আমরা তোমাদের প্রতি কোন অনুগ্রহ করিতেছি না, বরং এই কাজ আমরা শুধু এই জন্য করিতেছি যে, খোদা যেন আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। তাঁহারই সন্তোষের জন্য এই খেদমত। আমরা ইহাও চাহি না যে, তোমরা আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বেড়াইবে” (৭৬৪৯-১০)। এই ইঙ্গিত এই কথার দিকে করা হইয়াছে যে, তৃতীয় প্রকারের যে কল্যাণ সাধন, যা শুধু সহানুভূতির আবেগেই করা হয়--তাহারা সেই গন্তব্যই অবলম্বন করে। খাঁটি সাধুতার রীতি এই যে, খোদার সন্তুষ্টি অর্জনার্থে নিজের নিকটাঘীয়দিগকে আপন অর্থ হইতে সাহায্য করে এবং এই অর্থ হইতে এতীমদের দায়িত্ব পালন, তাহাদের ভরণ-পোষণ এবং শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে খৰচ করিয়া থাকে এবং মিসকিনদিগকে দারিদ্র্য ও অনাহার হইতে রক্ষা করে, পথিক ও প্রার্থীদের সেবা করে এবং বন্দী ও দাসদের মুক্তির জন্য এবং ঝণীদের ঝণ-শোধের জন্যও তাহারা অর্থ দান করে (২০১৭৮)। নিজ খরচের ব্যাপারে অপব্যয়ও করে না এবং কার্পণ্যও করে না (২৫৪৬৮)। বরং মিতাচার পালন করে, জোড়া দেওয়ার স্থানে জোড়া দেয় এবং খোদাকে ভয় করে (১৩৪২২)। তাহাদের ধনে প্রার্থী ও মূকদেরও অধিকার আছে (৫১৪২০)।” মূক অর্থে কুকুর, বিড়াল, পাখী, গো-মহিষ, গর্দভ, ছাগ ইত্যাদি জীবদেরকে বুঝায়। তাহারা অভাব ও অল্প আয়ের অবস্থায় এবং দুর্ভিক্ষের সময়ে দানশীলতা সম্পর্কে হৃদয়কে কুণ্ঠিত করে না, বরং অভাবের সময়েও সাধ্যানুসারে দান করিতে থাকে (৩৪১৩৫)। কোন সময়ে তাহারা গোপনে দান করে এবং কোন সময়ে প্রকাশ্যে দেয় (১৩৪২৩)। কপটতা ও লোক দেখানো দান হইতে বাঁচার জন্য গোপনে দেয় এবং এই উদ্দেশ্যে প্রকাশ্যেও দান করে যাহাতে অন্যেরাও প্রেরণা প্রাপ্ত হয়। খয়রাত ও সদ্কা প্রভৃতিতে যে অর্থ দেওয়া হয়, তাহাতে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, প্রথমে সকল অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে দিতে হইবে। অবশ্য যারা খয়রাতের অর্থ আদায় ও বন্টনের দায়িত্ব গ্রহণ করে বা উহার শৃঙ্খলা রক্ষা করে তাহারাও খয়রাতের অর্থ হইতে কিছু পাইতে পারে। কাহাকেও মন্দপথ হইতে বাঁচাইবার

জন্যও এই অর্থ হইতে কিছু দেওয়া যাইতে পারে। তেমনই দাস-মুক্তি (যুদ্ধবন্দী মুক্তি) ঝণগ্রস্ত ও বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিদের সাহায্যার্থে এবং অন্য প্রকারে, যাহা শুধু খোদার জন্য হয়, ঐ অর্থ খরচ হইবে (১৯৬০)। তোমরা প্রকৃত সাধুতা কখনও লাভ করিতে পার না, যে পর্যন্ত না তোমরা মানবতার সহানুভূতিতে ঐ অর্থ ব্যয় কর যাহা তোমাদের নিকট প্রিয় (৩৯৩)। দরিদ্রের হক্ক আদায় কর, মিসকিনদিগকে দাও, পথিকদের সেবা কর এবং অপব্যয় হইতে আত্মরক্ষা কর(১৭৮২৭)।” অর্থাৎ, বিবাহ-শাদীতে এবং নানা প্রকার বিলাসিতার ক্ষেত্রে, সন্তানের জন্মের উপলক্ষ্যে, রস্ম-রেওয়াজ (সামাজিক কদাচার) পালনে যত অপব্যয় করা হয়, তাহা হইতে আত্মরক্ষা করিবে। “তোমরা মাতা-পিতার প্রতি উত্তম ব্যবহার করিবে। নিকট আত্মীয়, এতীম, মিসকিন এবং প্রতিবেশীর মধ্যে যাহারা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত এবং প্রতিবেশীদের মধ্যে যাহারা তোমাদের আত্মীয় নহে, পথিক, চাকর, ভৃত্য, ঘোড়া, ছাগল, গাড়ী, মহিষ এবং তোমাদের অধিকারভূক্ত অন্য জীব-জন্মের প্রতি উত্তম ব্যবহার করিবে। কারণ খোদা, যিনি তোমাদের সকলেরই খোদা, এই সব নিয়ম ও অভ্যাস পদ্ধতি করেন। তিনি বেপরোয়া ও স্বেচ্ছাচারীদিগকে ভালবাসেন না। তিনি এমন লোক চাহেন না, যাহারা নিজে কৃপণ এবং লোকদেরকে কৃপণতা শিক্ষা দেয় এবং নিজেদের অর্থ গোপন করে”(৪৩৭৪৩৮)। অর্থাৎ, অভাবগ্রস্তকে বলে, আমাদের নিকট কিছু নাই।

প্রকৃত বীরত্ব

মানুষের সকল স্বভাবজ অবস্থাসমূহের মধ্যে **شُجَّاعٌ** (শুজাআত) একটি অবস্থা, যাহা বীরত্বের অনুরূপ। দুঃখপায়ী শিশুও এই শক্তির কারণে কখনও কখনও অগ্রিমে হাত দিতে চায়। ইহা মানব-শিশুর স্বভাবজ অবস্থা। এই অবস্থা প্রথমে মানবস্বভাবের বিক্রিমের ক্ষেত্রেও থাকে; মানুষ ভীতি-প্রদর্শক কোন দৃষ্টান্ত হইতে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় না করা পর্যন্ত কোন কিছুই ভয় পায় না। এই অবস্থায় মানুষ অকুতোভয়ে ব্যাপ্ত ও অন্যান্য হিংস্র জন্মের সঙ্গে লড়াই করে এবং বহু ব্যক্তির বিরুদ্ধে একাকী যুদ্ধ করার জন্য বাহির হয়। লোকে ভাবে সে মহাবীর। কিন্তু ইহা শুধু একটা স্বভাবজ অবস্থা, যাহা হিংস্র প্রাণীদের মধ্যেও থাকে। বরং ইহা কুকুরের মধ্যে দেখা যায়। প্রকৃত বীরত্ব স্থান ও কালের সহিত সংবন্ধ। উন্নত চারিত্রিক গুণ হইল সঠিক ক্ষেত্রে সঠিক সময়ে অনুষ্ঠিত কাজের নাম, যাহা খোদাতা'লার পবিত্র গ্রন্থে নিম্নরূপে বর্ণিত হইয়াছে :

وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالصَّرَاءِ وَجِئِينَ الْبَأْسِ مِنَ الْبَرَّةِ: (১৮:১৮)

وَالَّذِينَ صَبَرُوا وَابْتَغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ - (الرَّعد: ১৮)

أَلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا

لَكُمْ فَاخْشُوْهُمْ فَرَزَادُهُمْ إِيمَانًا ۝ قَالُوا حَسِبْنَا

إِنَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ۔ رَأْلَ عَمْرَنَ (١٧٨)

وَلَا تَحْوُّنُوا كَمَا لَذِينَ نَحْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ

بَطْرًا وَرِعَاءَ النَّاسِ ۔ رَانِفَالَ (٤٩)

অর্থাৎ, “তাহারাই বীর, যুদ্ধ উপস্থিত হইলে বা কোন বিপদ ঘটিলে যাহারা তাহাদের পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে না (২৪১৭৮)। তাহাদের জেহাদও কঠিন সময়ে খোদার সন্তুষ্টির জন্য হইয়া থাকে (১৩৪২৩)। তাহারা তাঁহার খোদার চেহারার নৈকট্যের অব্যবশকারী হইয়া থাকে, বীরত্ব প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে নহে। তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন করা হয় যে, লোকেরা তোমাদিগকে শাস্তি দেওয়ার জন্য একতা বদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং তোমরা লোকদেরকে ভয় কর। কিন্তু ভীতি প্রদর্শনে তাহাদের ইমান আরও বর্ধিত হয় এবং তাহারা বলেঃ খোদা আমাদের জন্য যথেষ্ট (৩৪১৭৮)। অর্থাৎ, তাহাদের বীরত্ব কুকুর ও হিংস্র জন্মুর ন্যায় নহে, যাহা শুধু স্বভাবজাত উত্তেজনার উপর নির্ভর করে এবং এক দিকে চলে। বরং তাহাদের বীরত্বের দুইটি দিক আছে। কখনও তাহারা আপন ব্যক্তিগত বীরত্ব দ্বারা নিজ প্রত্বন্তি ও উত্তেজনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং উহাকে দমন করে। আবার কখনও যখন দেখে যে, শক্র সহিত সংগ্রাম করাই সমীচীন, তখন শুধু প্রত্বন্তির তাড়নায় নহে, বরং সত্যের সাহায্যের নিমিত্তে শক্র সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু নিজ ব্যক্তিত্বের ভরসায় নহে, বরং খোদার উপর ভরসা করিয়া বীরত্ব প্রদর্শন করে এবং তাহাদের বীরত্বে কোন কপটতা বা আতঙ্করিতা থাকে না এবং (তাহারা) অন্ধ প্রত্বন্তির অনুগমন করে না বরং সব দিক দিয়াই খোদার সন্তুষ্টিকেই অগ্রগণ্য রাখে” (৮৪৮)।

এই আয়াতগুলিতে ইহা বুঝান হইয়াছে যে, প্রকৃত বীরত্বের মূল ধৈর্য ও স্থিরতা। প্রত্বন্তির যাবতীয় উত্তেজনা, কিংবা শক্রবৎ বিপদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে দৃঢ় থাকা এবং কাপুরুষদের ন্যায় পলায়ন না করাই বীরত্ব। সুতরাং, মানুষের শৌর্য এবং হিংস্র জন্মুর সাহসিকতার মধ্যে প্রভেদ অনেক। পশু একটি দৃষ্টিকোণ দিয়া ক্রোধ ও উত্তেজনার বশবর্তী হইয়া কাজ করে। পক্ষান্তরে প্রকৃত বীরত্বসম্পন্ন মানুষ কোন ক্ষেত্রে সংগ্রাম করা অথবা সংগ্রাম ত্যাগ করা, যাহা সমীচীন, তাহাই করে।

সত্যবাদিতা

মানুষের স্বভাবজাত অবস্থাসমূহের মধ্যে সত্যবাদিতা তাহার স্বভাবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রবৃত্তিমূলক কোন স্বার্থবোধ তাহাকে প্ররোচণা না যোগায়, ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষ মিথ্যা বলিতে চায় না এবং মিথ্যার আশ্রয় লইতে হৃদয়ে এক প্রকার ঘৃণা ও সংকোচ বোধ করে। এই কারণেই যে ব্যক্তির মিথ্যাচরণ প্রমাণিত হয়, মানুষ তাহার প্রতি স্বভাবতই অসন্তুষ্ট হয় এবং তাহাকে হীন দৃষ্টিতে দেখে। কিন্তু এই স্বভাবজ অবস্থা নৈতিকতার পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। কেননা, শিশু এবং পাগলও উহা পালন করিতে পারে। সুতরাং মূল কথা, যে পর্যন্ত না মানুষ হীন বাসনা, স্বার্থবোধ, ক্ষতির ভয়, সম্মানের ভয় ইত্যাদি বিষয় জলাঞ্জলি দেয় যাহা তাহার সত্যবাদিতায় বাধা জন্মায়, সে পর্যন্ত সে প্রকৃত সত্যবাদী হইতে পারে না। কারণ মানুষ যদি কেবল এমন সব বিষয়ে সত্য কথা বলে যাহাতে তাহার কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু মানসম্বন্ধ বিপন্ন হইলে বা ধন-সম্পদ বা প্রাণের ক্ষতির আশংকা দেখা দিলে মিথ্যা কথা বলে এবং সত্য বলিতে পরানুরূপ হয়, তবে সেক্ষেত্রে পাগল ও শিশু অপেক্ষা তাহার শ্রেষ্ঠত্ব কি? পাগল ও নাবালক শিশু কি এই প্রকার সত্য বলে না? পৃথিবীতে সম্ভবতঃ এমন কেহই নাই যে কোন প্ররোচণা ছাড়া অকারণে মিথ্যা বলে। অতএব, যে সত্যবাদিতা কোন ক্ষতির আশংকার সময়ে ত্যাগ করা হয়, তাহা প্রকৃত নৈতিকতার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া কখনও গণ্য হইতে পারে না। সত্যবাদিতা প্রমাণের ইহাই সর্বাপেক্ষা সঠিক ও কঠিন সময় ও ক্ষেত্র, যখন নিজের প্রাণ, ধন-সম্পদ বা সম্মান বিপন্ন হয়। এ সম্পর্কে খোদার শিক্ষা হইল :

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا

قَوْلَ الزُّورِ - (الحج: ٣١)

وَلَا يَأْبِ الشَّهَادَةَ إِذَا مَا دُعُوا - (البقرة: ٢٨٣)

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَثِيمٌ

قَلْبُهُ - (البقرة: ٢٨٤)

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاغْدِلُوا وَلَوْكَانَ ذَا قُرْبَى - (الأنعام: ١٥٣)

كُوُنُوا قَوَّا مِينَ بِالْقِسْطِ شُمَّدَاءِ اللَّهِ وَتَوَعَّلَ آنْفُسُكُمْ

آ وَالْوَالِدَيْنَ وَالْأَقْرَبَيْنَ - (النساء: ١٣٦)

وَلَا يَجِدُ مَنْكُمْ شَانٌ تَوْمِ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا . (المائدة: ٩)

وَالصَّدِيقِينَ وَالظَّاهِرِ - (الاحزاب: ٣٧)

وَتَوَاصُوا بِالْحَقِّ مُؤْتَوْ اصْنَاعًا بِالصَّبَرِ - (العصر: ٤)

لَا يَشَمَّدُونَ الزُّورَ - (الفرقان: ٧٣)

অর্থাৎ “প্রতিমা পূজা এবং মিথ্যাবাদিতা হইতে বিরত হও (২২:৩১)।”
অর্থাৎ, মিথ্যাও এক প্রতিমা। ইহার উপর ভরসাকারী খোদার উপর ভরসা করা ছাড়িয়া দেয়; সুতরাং মিথ্যা বলায় তাহাকে খোদাকে হারাইতে হয়। আল্লাহত্তা’লা আবার বলিয়াছেন : “যখন তোমরা সত্য সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য আহুত হও, যাইতে অস্বীকার করিও না (২:২৮৩) এবং সত্য সাক্ষ্য গোপন করিও না। যে সত্য গোপন করে তাহার হৃদয় পাপী(২:২৮৪)। যখন তোমরা বল, তখন ঐ কথাই বলিবে, যাহা সম্পূর্ণ সত্য কথা এবং ন্যায় বিচারের কথা (৬:১৫৩)। কোন নিকট সম্পর্কের ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দান করিতে হইলেও সত্য ও ন্যায়পরায়ণতার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। তোমাদের প্রত্যেক সাক্ষ্য খোদার জন্য হওয়া উচিত। মিথ্যা বলিবে না, যদিও সত্য বলায় তোমাদের আগের ক্ষতি হয়, তোমাদের মাতা-পিতার অনিষ্ট হয়, কিংবা অন্য নিকটাঞ্চীয় ব্যক্তি, যেমন পুত্র পরিজন ক্ষতিগ্রস্ত হয় (৪:১৩৬)। কোন জাতির শক্রতা যেন তোমাদিগকে সত্য সাক্ষ্য দানে প্রতিরোধ না করে (৫:৯)। সত্যবাদী পুরুষ এবং সত্যপরায়ণা স্ত্রীলোক মহাপুরুষার লাভ করিবে (৩৩:৩৬)। তাহাদের আচরণ অন্যকেও সত্যপরায়ণতার উপদেশ ও উৎসাহ দেয় (১০৩:৪), এবং মিথ্যাবাদীদের আসরে তাহারা বসে না” (২৫:৭৩)।

স্বৰ বা ধৈর্য

মানুষের স্বভাবজ বিষয়সমূহের মধ্যে স্বৰ বা ধৈর্য অন্যতম। বিপদাপদ, রোগ-শোক ও দুঃখ-কষ্ট মানুষের নিত্য সহচর। সময়ে তাহাকে ধৈর্য ধারণ করিতে হয়। মানুষ অনেক উদ্বেগ, অস্থিরতা, কান্না-কাটি ইত্যাদির পর অবশ্য ধৈর্য ধারণ করে। কিন্তু জানা আবশ্যিক, খোদাতা’লার পবিত্র গ্রন্থের দিক হইতে এই ধৈর্য নৈতিকতার অঙ্গর্গত নহে। বরং উহা এমন একটা অবস্থা, যাহা ক্লান্তির পর আপনা আপনিই প্রকাশ পায়। অর্থাৎ, মানুষের স্বভাবজ আচরণের মধ্যে ইহাও একটি অবস্থা। বিপদ উপস্থিত হইলে, প্রথম প্রথম সে কাঁদে, চিন্কার করে, মাথা ঠুকে, অবশেষে অনেক আবেগ প্রকাশের পর উত্তেজনার উপশম হয়, চরমে পৌছাইয়া পিছাইয়া পড়িতে বাধ্য হয়।

সুতরাং এই উভয় অবস্থাই প্রাকৃতিক। নেতৃত্ব গুণের সহিত ইহাদের কোন সম্মতি নাই। বরং এই সম্পর্কিত নেতৃত্ব গুণ হইল,- যখন কোন জিনিস হস্তচ্যুত হইতে থাকে, তখন ঐ জিনিস খোদাতা'লার আমানত বা গচ্ছিত সামগ্ৰী মনে করিয়া কোনও প্রকার অভিযোগ করিবে না এবং বলিবে, ‘যাহা খোদার ছিল, উহাই খোদা লইয়াছেন। আমরা তাঁহার ইচ্ছায় সন্তুষ্ট।’ এই নেতৃত্ব গুণ সম্বন্ধে খোদাতা'লার পৰিত্ব কালাম কুরআন শরীফ আমাদিগকে এই শিক্ষা দেয় :

وَلَنْبُلُونَكُمْ بِشَئٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ
مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالْعُمَرِ وَبَشِّيرٌ
الصَّابِرِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُّصِيبَةٌ
قَالُوا إِنَّا بِهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجُونَ - أُولَئِكَ
عَلَيْهِمْ صَلَوةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ
هُمُ الْمُهْتَدُونَ - (البقرة: ١٥٨-١٥٧)

অর্থাৎ, “হে মোমেনগণ, আমরা তোমাদিগকে এই প্রকারে পরীক্ষা করিতে থাকিব যে, কখনও তোমরা কোন ভয়ংকর অবস্থার সম্মুখীন হইবে, কখনও দারিদ্র্য ও অনশন তোমাদিগকে ক্লিষ্ট করিবে, কখনও তোমাদের অর্থ-হানি ঘটিবে, কখনও জীবন বিপন্ন হইবে, কখনও তোমাদের শ্রম বিফল হইবে এবং চেষ্টার বাস্তুত ফল লাভ হইবে না, কখনও তোমাদের সন্তান বিয়োগ ঘটিবে। কিন্তু তাহাদিগকে সুসংবাদ দাও, যখন তাহাদের বিপদ ঘটে, তখন তাহারা বলে, আমরা আল্লাহরই জন্য, আমরা তাঁহার আমানত, তাঁহারই করায়ত। সুতরাং ইহাই সুসঙ্গত যে, আমরা যাহার আমানত, তাঁহারই নিকট আমাদের প্রত্যাগমন। ইহাদেরই উপরে খোদার আশিস রহিয়াছে এবং ইহারাই খোদার পথ প্রাপ্ত হইয়াছে” (২:১৫৬-১৫৮)।

বস্তুতঃ এই চারিত্বিক গুণের নাম ধৈর্য এবং আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি সন্তুষ্টি। অধিকত্তু, এক হিসাবে এই নেতৃত্ব গুণের নাম ন্যায়পরায়ণতা। কারণ, যখন খোদাতা'লা মানুষের জীবন ব্যাপীয়া তাহার ইচ্ছানুযায়ী কাজ করেন এবং সহস্র সহস্র বিষয় তাহার ইচ্ছামত প্রকাশ করেন এবং মানুষের চাহিদা অনুযায়ী তাহাকে এত সব নেয়ামত দান করিয়াছেন যে, মানুষ তাহা গণনা করিয়া শেষ করিতে পারে না, তখন ইহা কি ন্যায়-বিচারের কথা হইবে যে, তিনি কখনও তাঁহার ইচ্ছাকে মানাইতে চাহিলে মানুষ পশ্চাদপদ হইবে এবং তাঁহার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট হইবে না, আপত্তি করিবে এবং ধর্মহীন ও বিপথগামী হইবে ?

সহানুভূতি

মানুষের স্বাভাবিক বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত একটি অতি প্রয়োজনীয় সহজাত অবস্থা আছে, উহা হইল সৃষ্টি জীবের প্রতি সহানুভূতির আবেগ। স্বজাতির পক্ষ সমর্থনে উৎসাহ ও প্রেরণা স্বভাবতই প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীর মধ্যে পাওয়া যায়। অধিকাংশ মানুষ স্বজাতি-প্রীতির স্বভাবজ উদ্দেজনায় বিজাতিগণের উপর যুলুম করিয়া বসে। দেখিলে মনে হয়, তাহারা অন্যদের মানুষ বলিয়া গণ্য করে না। সুতরাং এই অবস্থাকে নৈতিক গুণ বলা যায় না। ইহা কেবল একটা প্রকৃতিদণ্ড উদ্দেজন। চিন্তা করিলে দেখা যায়, এই স্বভাবজ অবস্থা কাক প্রভৃতি পক্ষীদের মধ্যেও পাওয়া যায়। একটি কাকের মৃত্যুতে সহস্র সহস্র কাক জমা হয়। কিন্তু এই অভ্যাস মানব চরিত্রে নৈতিকতার রূপ তখনই ধারণ করে, যখন এই সহানুভূতি ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচার সমর্থিত পদ্ধায় সঠিক পরিস্থিতি ও পরিবেশ মোতাবেক প্রকাশিত হয়। তখন ইহা এক মহান চারিত্রিক গুণ হইয়া যায়। আরবীতে ইহা ‘মাওয়াসাত’ (مواسات) এবং ফারসীতে হামদর্দী নামে পরিচিত। ইহারই প্রতি আল্লাহ্ জাল্লা শানুর কুরআন শরীফে নির্দেশ করিতেছেন :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالشَّفْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا

عَلَى الْأَذْيَمِ وَالْعُدَوانِ - (المائدة : ٣)

وَلَا تَنْهَمُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ - (النَّسَاءَ : ١٠٥)

وَلَا تَكُنْ تِلْحَافِينَ حَصِيمًا - (النَّسَاءَ : ١٠٧)

وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ

لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ حَوَانًا أَثِيمًا - (النَّسَاءَ : ١٠٨)

অর্থাৎ, “স্বজাতির প্রতি সহানুভূতি ও সাহায্য শুধু পুণ্য কাজের ব্যাপারে করিতে হইবে। অত্যাচার ও সীমাতিক্রমের ব্যাপারে কখনও তাহাদের সাহায্য করিবে না (৫:৩)। স্বজাতির প্রতি সহানুভূতিতে সদা উৎসাহী থাকিবে। ক্লান্ত হইবে না (৪:১০৫)। বিশ্বাস-ঘাতকদের পক্ষ সমর্থনে লড়াই করিবে না (৪:১০৬); যাহারা বিশ্বাসঘাতকতা হইতে নিবৃত্ত হয় না খোদাতা'লা সেই বিশ্বাসঘাতকদের সহিত ভালবাসা রাখেন না” (৪:১০৮)।

এক পরম উর্ধ্বতন অস্তিত্বের অব্বেষণ

মানুষের প্রকৃতির জন্য অপরিহার্য স্বভাবজ অবস্থাবলীর অন্যতম অবস্থা হইতেছে এক পরম উর্ধ্বতন অস্তিত্বের অব্বেষণ, যাহার জন্য মানুষের হৃদয়ের অস্তঞ্চলে এক নিভ্রত আকর্ষণ বিদ্যমান রহিয়াছে। এই অব্বেষণের লক্ষণ তখন হইতেই অনুভূত হওয়া শুরু হয়, যখন শিশু মাত্গভ হইতে বাহিরের আলো বাতাসে আসে। কারণ শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র সর্বপ্রথম যে আত্মিক বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে তাহা হইল, সে মায়ের প্রতি আকৃষ্ট হইতে থাকে এবং সে স্বভাবতঃ মায়ের প্রতি ভালবাসা পোষণ করে। তারপর, যতই তাহার চেতনার বিকাশ হইতে থাকে এবং স্বভাবের কুঁড়ি যতই প্রস্ফুটিত হইতে থাকে ততই তাহার মধ্যে সুন্দর ভালবাসার আকর্ষণ ও উহার আপন রূপ স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতরভাবে প্রদর্শন করিতে থাকে। অতঃপর, তাহার অবস্থা এই দাঁড়ায় যে, সে মাত্কোল ছাড়া আর কোথাও আরাম পায় না। তাহার পূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্য মাত্রাপের আবেষ্টনে সীমাবদ্ধ হইয়া যায়। তাহাকে তাহার মাতার কাছ হইতে পৃথক করিয়া দূরে রাখিলে, তাহার সকল সুখ বিষাদে পরিণত হয়। তাহার সম্মুখে নানা প্রকার আনন্দ সভার স্তূপীকৃত করা হইলেও, সে প্রকৃত আনন্দ আপন মাত্কেরেই দেখিতে পায় এবং তাহাকে ছাড়িয়া সে কোন কিছুতে আরাম পায় না। মায়ের প্রতি এই যে স্নেহের টানের সৃষ্টি হয়, ইহা কি বস্তু?

বস্তুতঃ ইহা সেই আকর্ষণ যাহা প্রকৃত উপাস্যের উদ্দেশ্যে শিশুর প্রকৃতিতে স্থাপন করা হইয়াছে। বরং সকল ক্ষেত্রেই যেখানে মানুষ প্রেম-সম্পর্ক স্থাপন করে, সেখানে প্রকৃতপক্ষে সেই আকর্ষণই কাজ করিতে থাকে। প্রত্যেক স্থানে সে যে প্রেমাবেগ ব্যক্ত করে, প্রকৃতপক্ষে উহা সেই প্রেমেরই প্রতিবিস্তরূপ। অন্য কথায়, বিভিন্ন বস্তুসমূহকে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া সে এক হারান জিনিষের সন্ধান করিয়া ফিরে। উহার নাম সে এখন ভুলিয়া গিয়াছে। সুতরাং ধন-সম্পদ, সন্তান বা স্ত্রীর প্রতি অনুরাগ বা সুমিষ্ট গানের প্রতি তাহার প্রাণের আকর্ষণ প্রকৃতপক্ষে সেই হারান প্রেমাস্পদেরই অব্বেষণ। যেহেতু মানুষ সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সন্তাকে, যিনি আগনের মতই প্রত্যেকের মধ্যে নিহিত এবং সকলেরই নিকট গুণ, যাহাকে চর্মচক্ষে দেখিতে পারা যায় না, যাহাকে অসম্পূর্ণ বুদ্ধির দ্বারা পাওয়া যায় না, সেই জন্য তাহাকে জানার ব্যাপারে মানুষ অনেক বড় বড় ভ্রমে নিপতিত হইয়াছে। ভুল করিয়া তাহার প্রাপ্য অন্যদের দেওয়া হইয়াছে। খোদা এ ব্যাপারে কুরআন শরীফে বড়ই সুন্দর উপমা দিয়াছেন। পৃথিবী একটা শীশমহলের মত। উহার যমীনের ভিত অতি স্বচ্ছ স্ফটিকে নির্মিত। অতঃপর, সেই স্ফটিকের নীচে পানি প্রবাহিত করা হইয়াছে, যাহা মহাবেগে প্রবাহিত হইতেছে। যখন দৃষ্টি স্ফটিকের উপর পড়ে, তখন স্ফটিককে পানি বলিয়া ভ্রম হয়। এই অবস্থার মানুষ স্ফটিকের উপর দিয়া যাইতে সেইরূপ ভয় পায়, যেরূপ পানির উপর দিয়া যাইতে

ভয় হয়। অথচ উহা প্রকৃতপক্ষে স্ফটিক, তবে পরিষ্কার ও স্বচ্ছ। তেমনিভাবে আকাশে যে সকল বৃহদায়তন গ্রহ-নক্ষত্রসমূহ দেখা যায়, যথা সূর্য, চন্দ্র ইত্যাদি, এইগুলিও সেই স্বচ্ছ স্ফটিক; অথচ খোদা ভ্রমে সেগুলির পূজা করা হয়। ইহাদের তলদেশে এক মহাশক্তি কাজ করিতেছে। উহা কাঁচের আড়ালে পানির ন্যায় মহাবেগে প্রবাহিত। সৃষ্টির পূজারীগণ তাহাদের দৃষ্টিভ্রমের দরুন ঐ কাঁচগুলির উপরই সেই কর্মকে আরোপ করে, যাহা উহার তলদেশে অবস্থিত শক্তি প্রকাশ করিয়া চলিয়াছে। ইহাই নিম্নোক্ত আয়াতে করীমার তফসীর।

إِنَّهُ صَرْحٌ مَّرْدُّ مِنْ قَوَارِبِهِ - (الملل : ٤٥)

“নিশ্চয় উহা পালিশ করা কাঁচ নির্মিত মহল” (২৭:৪৫)।

প্রকৃতপক্ষে খোদাতা'লার অস্তিত্ব উজ্জ্বল হওয়া সত্ত্বেও একান্ত গুণ। এই কারণে, তাঁহাকে জান্য আমাদের চোখের সম্মুখস্থিত প্রাকৃতিক বিধান যথেষ্ট ছিল না। এই প্রকার বিধানের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিগণ শত শত আশ্চর্যে ভরা এই সুনিয়ন্ত্রিত এবং সুসমর্থিত শৃঙ্খলাকে গভীর দৃষ্টিতে অবলোকন করিয়া আসিয়াছে। উপরন্তু জ্যোতিষ, পদাৰ্থ বিদ্যা, বিজ্ঞান এবং দর্শনে একুপ মহাপাণ্ডিত অর্জন করিয়াছে, যেন আকাশ ও পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে, তথাপি তাহারা সন্দেহ ও সংশয়ের অন্ধকার হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই। তাহাদের অধিকাংশ ব্যক্তিই নানা প্রকার ভ্রমের মধ্যে নিপত্তি হইয়াছে আর বাজে ও অমূলক কল্পনার বশবর্তী হইয়া দূর হইতে দূরে চলিয়া গিয়াছে। আর যদিওবা সেই অস্তিত্ব সম্পর্কে তাহাদের কোন ভাবোদয় হইয়াও থাকে, তাহা শুধু এই পর্যন্ত যে, এই উচ্চাঙ্গীন ও উত্তম জড় বিধানকে দেখিয়া তাহাদের মনে হইয়াছে যে, প্রজ্ঞা পরিচালিত এই আজিমুশ্শান শৃঙ্খলার এক স্রষ্টা থাকিতে হইবে। কিন্তু আসলে এই ধারণা অপূর্ণ এবং এই জ্ঞান ক্রটিপূর্ণ। কারণ, এই কথা বলা যে, এই সুবিন্যস্ত ব্যবস্থার জন্য একজন খোদার প্রয়োজন, কখনও ঐ কথার সমান নহে যে, ঐ খোদা প্রকৃতই আছেন। বস্তুতঃ ইহা তাহাদের শুধু একটা আনুমানিক জ্ঞান, যাহা মনে প্রশান্তি আনিতে পারে না, সংশয়কেও মন হইতে সম্পূর্ণরূপে অপসারণ করিতে পারে না। এবং ইহা এমন পানপাত্রও নহে, যাহা মানুষের স্বভাবজ সামগ্রিক জ্ঞান-পিপাসাকে পরিত্পত্তি করিতে পারে। বরং এইরূপ অসম্পূর্ণ জ্ঞান অত্যন্ত বিপজ্জনক। কারণ, অনেক বাক্-বিত্তনার পরেও পরিণাম তুচ্ছ এবং ফলশূন্যই থাকিয়া যায়।

সুতরাং খোদাতা'লা যেভাবে নিজের কর্মের মধ্যে আপনাকে প্রকাশিত করিয়াছেন, সেইভাবে তিনি যে পর্যন্ত আপন অস্তিত্বকে আপন বাক্য দ্বারা প্রকাশিত না করেন, সে পর্যন্ত শুধু কর্ম প্রত্যক্ষ করিয়াই পরিত্পত্তি হওয়া সম্ভব নহে। দৃষ্টান্ত স্থলে বলা যায়, যদি আমরা এমন কোন বদ্ধ কুর্তুরি দেখি যাহা আশ্চর্যজনকভাবে ভিতর হইতে রুক্ষদ্বারা থাকে, তাহা হইলে এই অবস্থায় আমরা নিশ্চয় প্রথমে ইহা মনে করিব যে, ভিতরে কোন মানুষ আছে এবং সে ভিতরের দিক হইতে শিকল দিয়াছে। কারণ, বাহির হইতে ভিতরে শিকল দেওয়া সম্ভবপর

নহে। কিন্তু দীর্ঘকাল ব্যাপী বৎসরের পর বৎসর যাবৎ বার বার ডাকা সত্ত্বেও এই ব্যক্তির দিক হইতে কোন সাড়া না আসিলে, ভিতরে কোন লোক থাকার পক্ষে যে সিদ্ধান্ত আমাদের ছিল, তাহা অবশ্যে পরিবর্তিত হইয়া যাইবে এবং আমরা এই কথা মনে করিব যে, ভিতরে কেহ নাই। বিশেষ কোন কৌশলে ভিতরের শিকল আটকান হইয়াছে। এই অবস্থাই এই দার্শনিকগণের, যাহারা শুধু কাজ দেখিয়াই তাহাদের জ্ঞান সমাপ্ত করিয়াছে। ইহা বড়ই ভ্রান্তির কথা যে, খোদাকে মৃতের ন্যায় মনে করা হয়, যেন তাঁহাকে কবর হইতে বাহির করাই কেবল মানুষের কাজ। খোদা যদি এমনই হইয়া থাকেন যে, মানুষের চেষ্টা তাঁহাকে আবিষ্কার করিয়াছে, তবে এই প্রকার খোদা সম্বন্ধে আমাদের সব আশা ভরসাই বৃথা। বরং খোদা তিনিই, যিনি সর্বদা আদি হইতে স্বয়ং **المَوْجُود** ('আমি আছি')। বলিয়া মানুষকে তাঁহার দিকে আহ্বান করিয়া আসিতেছেন। ইহা অমার্জনীয় অপরাধ হইবে, যদি আমরা এই প্রকার ধারণার বশবর্তী হই যে, তাঁহার তত্ত্ব-জ্ঞানের প্রকাশে তাঁহার উপর মানুষের দয়ার অবদান রহিয়াছে। দার্শনিকরা না থাকিলে তিনি যেন চির নিখোঝ রহিয়া যাইতেন। এবং এ কথা বলা যে, খোদা কি প্রকারে কথা বলিতে পারেন, তাঁহার কি জিহ্বা আছে?— ইহাও এক ভয়াবহ দুঃসাহস। কারণ, তিনি কি জড় হস্ত ব্যতিরেকে যাবতীয় গ্রহ নক্ষত্রাজি এবং পৃথিবী সৃষ্টি করেন নাই? তিনি কি ভৌতিক চক্ষু ব্যতীত জগতকে দেখেন না? তিনি কি দৈহিক কর্ণ ছাড়া আমাদের আওয়াজ শোনেন না? সুতরাং ইহা কি জরুরী নহে যে, তিনি এইভাবে কথাও বলেন? ইহা কখনও সত্য নহে যে, খোদার কথা বলা সম্ভুক্ত নহে, পশ্চাতে রহিয়া গিয়াছে। আমরা তাঁহার বাক্যালাপ ও সম্বোধনের উপর কোন কাল বা সময় নির্দিষ্ট করিয়া মোহর লাগাইতে পারি না। নিঃসন্দেহে তিনি পূর্বের ন্যায় এখনও অব্রেষণকারীদেরকে ইলহামের প্রস্তবণ দ্বারা সমৃদ্ধ করিতে প্রস্তুত। এখনও তাঁহার আশিষসমূহের দরজা তেমনি খোলা আছে, যেমন ইতিপূর্বে খোলা ছিল। অবশ্য, প্রয়োজন শেষ হওয়ায়, শরীয়ত ও বিধান শেষ হইয়াছে এবং সকল রেসালত ও নবুওয়ত আপন উচ্চতম শিখরে উপনীত হইয়া, আমাদের নেতা ও প্রভু সাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের সত্তায় পূর্ণত্বে পৌছিয়া গিয়াছে।

আঁ হ্যরত (সাঃ)-এর আরবে আবির্ভূত হওয়ার তাৎপর্য

এই শেষ জ্যোতিঃ আরব হইতে প্রকাশিত হওয়াও তাৎপর্যহীন ছিল না। আরবগণ এই বনী ইসমাইল জাতির লোক, যাহারা বনী ইসরাইল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ঐশ্বী প্রজায় ফারান-এর মরণভূমিতে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। 'ফারান' শব্দের অর্থ দুই পলাতক অর্থাৎ যাঁহাদিগকে স্বয়ং হ্যরত ইব্রাহীম (আঃ) বনী ইসরাইল হইতে পৃথক করিয়াছিলেন, তওরাতের বিধানের মধ্যে যাঁহাদের কোন অংশ ছিল না। যেমন লিখিত আছে যে, ইস্হাকের সহিত ইসমাইল কোন অংশের ভাগী হইবে না।

সুতরাং, যাহাদের সহিত সম্পর্ক ছিল, তাহারা তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিল। অন্য কাহারও সঙ্গে ইহাদের কোন সম্পর্ক ছিল না এবং কোন আত্মায়তাও ছিল না। অন্য সব দেশেই এবাদত ও নিয়ম কানুনের মধ্যে কিছু কিছু প্রথা পাওয়া যাইত, যাহা হইতে সন্ধান মিলিত যে, অতীতের এক সময়ে তাহাদিগের নিকট নবীগণের শিক্ষা পৌছিয়াছিল। কিন্তু শুধু আরব দেশই এরূপ ছিল, যাহা এইসব শিক্ষা হইতে একেবারেই অজ্ঞ ছিল এবং ইহা সমগ্র পৃথিবী হইতে পিছনে রহিয়া গিয়াছিল। এই জন্যই সর্বশেষে ইহার পালা আসিল। ইহার নবুওয়তকে সার্বজনীন করা হইল, যাহাতে অন্যান্য সকল দেশকে ইহা পুনরায় আশিসমত্তি করে এবং যে সকল ভাস্তির উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা দূর হইয়া যায়। সুতরাং এহেন পরিপূর্ণ গ্রন্থ – যাহা মানুষের ইসলাহের (সংশোধনের) সকল কার্য স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছে এবং যাহা পূর্ববর্তী ধর্ম পুস্তকগুলির ন্যায় শুধু এক জাতির সঙ্গেই সম্পর্ক রাখে না বরং সকল জাতির ইসলাহ কামনা করে এবং মানবতার শিক্ষার সকল পর্যায় বর্ণনা করিয়াছে এবং অসভ্যদিগকে মানবোচিত আচরণ শিক্ষা দিয়াছে, তাহার পর আর কোন গ্রন্থের অপেক্ষা করিতে হইবে?

দুনিয়ার উপরে কুরআন করীমের অনুগ্রহ

কুরআনই সমগ্র বিশ্বের উপর এই এহসান বা কৃপা করিয়াছে যে, ইহা স্বভাবজ অবস্থা এবং উন্নত চরিত্রের মধ্যে প্রভেদ দেখাইয়াছে এবং ইহা স্বভাবজ অবস্থা হইতে বাহির করিয়া উন্নত চরিত্রের সর্বোচ্চ শৃঙ্খ পর্যন্ত পৌছাইয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, বরং আরও যে স্তরে উপনীত হইবার ছিল, অর্থাৎ আধ্যাত্মিক স্তরসমূহ পর্যন্ত পৌছার জন্য পবিত্র তত্ত্ব-জ্ঞানের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছে। শুধু উদ্ঘাটনই করে নাই, বরং লক্ষ লক্ষ মানুষকে সেখান পর্যন্ত পৌছাইয়া দিয়াছে। এইরূপে যে তিন প্রকার শিক্ষা লইয়া ইতিপূর্বে আমি আলোচনা করিয়াছি, সেগুলিকে সুন্দরতমভাবে বর্ণনা করিয়াছে। সুতরাং, ধর্মীয় শিক্ষায় গড়িয়া তোলার জন্য যত প্রকার শিক্ষার প্রয়োজন, সবই উহার মধ্যে বিদ্যমান বলিয়া উহা এই দাবী করে যে, উহাই ধর্মীয় শিক্ষাকে পূর্ণতায় পৌছাইয়া দিয়াছে। যেমন, খোদাতা'লা বলেনঃ

أَنْبَوْمَ أَكْتَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَثْمَنْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَيْنِ

وَرَضِيْنِتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا۔ (المائدة: ٩٠)

অর্থাৎ, “আজ আমি তোমাদের ধর্মকে পূর্ণ করিয়া দিয়াছি এবং আমার নেয়ামতকে তোমাদের উপর সম্পূর্ণ করিয়া দিয়াছি এবং আমি তোমাদের জন্য ইসলামকে ধর্মরূপে নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি” (৫:৪)। অর্থাৎ, ধর্মের শেষ পর্যায় উহাই, যাহা ‘ইসলামের’ অর্থের মধ্যেই পাওয়া যায়। শুধু খোদার

জন্যই হইয়া যাওয়া এবং আপন মুক্তির প্রত্যাশা করা স্বীয় সত্তার কুরআনী দ্বারা, অন্য পদ্ধায় নহে, বরং উক্ত সংকল্প ও আকাঞ্চ্ছাকে কার্যতঃ প্রমাণ করিয়া দেখানোই হইল সেই কেন্দ্র বিন্দু, যেখানে সর্বপ্রকার পরমোৎকর্ষের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে।

সুতরাং, যে খোদাকে দার্শনিকেরা সনাক্ত করিতে পারেন নাই, কুরআন সেই সত্য খোদার সন্ধান দিয়াছে। খোদার সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান প্রদানের জন্য কুরআন দুইটি উপায় অবলম্বন করিয়াছে। প্রথম ঐ উপায়, যাহার মাধ্যমে যুক্তি-ভিত্তিক প্রমাণ উপস্থাপনের ফলে মানুষের বুদ্ধি অত্যন্ত শক্তিশালী ও উজ্জ্বল হইয়া উঠে এবং মানুষ ভুল হইতে রক্ষা পায়। দ্বিতীয় হইল ঝুহানী উপায়, যাহা আমরা তৃতীয় প্রশ্নের (মানব জীবনের উদ্দেশ্য কি এবং উহা লাভ করার উপায় কি) উত্তরে একটু পরেই ইন্শা-আল্লাহত্তালা, আলোচনা করিব।

মহান স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ

এখন দেখ, যুক্তি-ভিত্তিক উপায়ে কুরআন শরীফ খোদার অস্তিত্বের কত উত্তম ও অঙ্গুলনীয় প্রমাণ পেশ করিয়াছে। যেমন, এক স্থানে বলা হইয়াছে :

رَبِّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى - (أَطْهَ، ৫১)

অর্থাৎ, “তিনিই হইতেছেন সেই খোদা, যিনি প্রত্যেক জিনিষকে উপযোগী অবস্থা দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। তারপর, সেই জিনিষকে উহার অভীষ্ট উন্নতি লাভের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন” (২০:৫১)। এখন এই আয়াতের অর্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া মানুষ হইতে আরম্ভ করিয়া জল-স্তলের সকল প্রাণী ও পাখীর গড়নের প্রতি লক্ষ্য করিলে খোদার অসীম শক্তি বা কুদরত স্মরণে আসে। প্রত্যেক জিনিষের গড়ন উহার অবস্থার উপযোগী প্রতিভাত হয়। পাঠক, আপনি নিজেই চিন্তা করুন। কেননা, বিষয়টি খুব ব্যাপক।

দ্বিতীয় প্রমাণ, খোদাত্তালার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কুরআন শরীফ খোদাত্তালাকে সব কারণের আদি কারণ নির্দিষ্ট করিয়াছে। যেমন খোদা বলিয়াছেন :-

وَأَنَّ إِلَيْكَ الْمُتَشَفِّعُ - (الْجَمَ: ৪৩)

অর্থাৎ, “কার্য ও কারণের সমগ্র শৃঙ্খল তোমার স্রষ্টা ও প্রতিপালকের নিকট পৌছিয়া শেষ হয়”-(৫৩:৪৩)। এই যুক্তির বিস্তৃত ব্যাখ্যা জানিতে হইলে গভীর চিন্তার আবশ্যক। যত কিছু আছে সবই কার্য ও কারণের শৃঙ্খলে আবদ্ধ। এই জন্য পৃথিবীতে নানা জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্য হইয়াছে। কেননা, সৃষ্টির কোন অংশ এই শৃঙ্খলের বহির্ভূত নয়। কোনটা কোনটার জন্য সূত্র এবং কোনটা শাখা বা

প্রশাখা। ইহা সুম্পষ্ট যে, কোন একটি কারণ হয় স্বীয় সত্ত্বায় প্রতিষ্ঠিত নয়তো উহার অস্তিত্ব অন্য কোন কারণ হইতে উদ্ভূত হবে। তারপর, দ্বিতীয় কারণ অন্য কারণের উপর নির্ভরশীল এবং এই প্রকারেই সমগ্র শৃঙ্খল নির্মিত। ইহা হইতে পারে না যে, এই সমীম জগতে কার্য ও কারণের শৃঙ্খল কোথাও যাইয়া শেষ হইবে না। আর অসীম হইলেও প্রয়োজনের খাতিরে মানিতে হয় যে, এই শৃঙ্খল নিশ্চয় কোন না কোন শেষ কারণে পৌছিয়া শেষ হইয়াছে। অতএব, এই সকল শৃঙ্খল যাঁহার কাছে গিয়া শেষ হইয়াছে তিনিই খোদা। চক্ষু মেলিয়া দেখঃ

وَأَنْ إِلَيْ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ - (النَّجْمٌ : ٤٣)

এই আয়াত সংক্ষিপ্ত কথায় কি সুন্দরভাবে উপরোক্তাখিত যুক্তি প্রদান করিতেছে ! ইহার অর্থ, সব শৃঙ্খল তোমার স্ফটা পালনকর্তায় পৌছিয়া শেষ হইয়াছে।

তারপর, আপন অস্তিত্ব সম্পর্কে তিনি আরও একটি যুক্তি দিয়াছেন। যেমন,
বলিয়াছেনঃ **لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا إِلَيْهِ**

سَابِقُ النَّهَارٍ وَكُلُّ فِلَكٍ يَسْبِحُونَ - (রিস٢ : ٤١)

অর্থাৎ, “সূর্য চন্দ্রের নাগাল পায় না, এবং চন্দ্রের প্রকাশকারী রাত্রি সূর্যের প্রকাশকারী দিনকে কিছুমাত্র আচ্ছন্ন করিতে পারে না” (৩৬:৪১)। অর্থাৎ, ইহাদের কেহই আপন আপন নির্দিষ্ট সীমা লংঘন করে না। যদি পর্দার অন্তরালে ইহাদের কোন পরিচালক না থাকিত, তবে এই সমগ্র শৃঙ্খল ভাসিয়া চুরমার হইয়া যাইত। জ্যোতিষ্ক সম্পর্কে গবেষণাকারীরা এই যুক্তি দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইতে পারে। কারণ আকাশের নক্ষত্রপুঁজের মধ্যে এত বিশাল ও অগণিত গোলকপিণ্ড আছে যে, উহাদের সামান্য বিচ্যুতির ফলে সমগ্র জগৎ ধ্বংস হইতে পারে। বিশ্ব প্রকৃতির কী অপূর্ব মহিমা ! ইহারা পরম্পর ধাক্কা খায় না, কেশাঘ পরিমাণ গতি পরিবর্তন করে না। ইহারা এত দীর্ঘ কালব্যাপী কর্মরত থাকিয়াও বিন্দুমাত্র ঘৰ্ষিত হয় নাই। ইহাদের কল-কজার মধ্যে কোন বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই। উর্ধ্বে কোন রক্ষাকারী না থাকিলে কি প্রকারে এত বড় কারখানা অসংখ্য বর্ষব্যাপী আপনা-আপনি চলিতেছে? এইসব প্রজ্ঞার দিকে ঈঙ্গিত করিয়া খোদাতালা অন্যত্র বলিয়াছেনঃ

أَفِي اللَّهِ شَفَّٰ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ - (ابْرَاهِيمٌ : ١١)

অর্থাৎ, “খোদার অস্তিত্ব সম্পর্কে কি করিয়া সন্দেহ হইতে পারে, যিনি এমন আকাশ-মণ্ডল এবং এমন পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন ? (১৪:১১)

অতঃপর, তিনি তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে একটি সূক্ষ্ম যুক্তি দিয়াছেন এবং উহা
হইল :

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ. وَيَبْقَى وَجْهٌ رَّبِّكَ

ذُو الْجَلْلِ وَالْأَكْرَامِ - الرَّحْمَن ٢٧-٢٨

অর্থাৎ, “প্রত্যেক জিনিষ লয়শীল এবং যিনি অবিনশ্বর, তিনি হইলেন খোদা, মহাপ্রতাপাদ্বিত ও মহামর্যাদাবান” (৫৫:২৭-২৮)। এখন দেখ, যদি আমরা ধরিয়া লই যে, পৃথিবী রেণু রেণু হইয়া যাইবে এবং নক্ষত্রনিচয় ভাঙিয়া টুকরা টুকরা হইয়া যাইবে এবং উহাদের লয়ের নিমিত্ত এমন এক বায়ুর প্রবাহ সৃষ্টি হইবে যে, এই সব কিছুই নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে, তবু বুদ্ধি ও যুক্তি একথা মানিবে ও স্বীকার করিবে, বরং সুস্থ বিবেক ইহাই জরুরী জ্ঞান করিবে যে, এই সম্যক লয়ের পরেও একটা কিছু বাকী থাকিবে, যাহা লয় হইবে না, পরিবর্তন স্বীকার করিবে না এবং আপনার প্রথম অবস্থায় অবিকল থাকিবে। অতএব তিনিই সেই খোদা, যিনি সমগ্র লয়শীল অস্তিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন এবং স্বয়ং লয়ের হস্ত হইতে নিরাপদ রহিয়াছেন।

তারপর, তিনি আরও এক প্রমাণ আপন অস্তিত্ব সম্বন্ধে কুরআন শরীফে পেশ করিয়াছেন :

أَنْتَ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى - الاعراف ١٧٣

অর্থাৎ, “আমি আত্মাদিগকে বলিলাম : আমি কি তোমাদের প্রভু নহি? তাহারা বলিলঃ কেন নহে”? (৭:১৭৩)। এই আয়াতে খোদাতা’লা সংলাপের মাধ্যমে রূহের প্রকৃতি বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি আত্মার প্রকৃতিতে এই বৈশিষ্ট্য রাখিয়াছেন যে, কোন আত্মা উহার প্রকৃতির দিক হইতে খোদাতা’লাকে অস্বীকার করিতে পারে না। অস্বীকারকারীরা শুধু তাহাদের চিন্তায় প্রমাণ না পাওয়ায় অস্বীকার করে। কিন্তু এই অস্বীকার সত্ত্বেও তাহারা একথা স্বীকার করে যে, প্রত্যেক ঘটনার কারণ থাকে। কারণ ছাড়া কিছু ঘটে না। পৃথিবীতে এমন কোন অজ্ঞ নাই যে, দেহে কোন রোগ প্রকাশ পাইলে সে এই কথার উপর জোর দেয় যে, এই রোগের আড়ালে এই রোগ প্রকাশের কোন হেতু নাই। যদি বিশ্ব এই কার্য ও কারণের শৃঙ্খলভুক্ত না হইত, তবে ঘটনার পূর্বে কখনও এই প্রকার বলা সম্ভবপর হইত না যে, অমুক তারিখে তুফান হইবে, বা চন্দ্র সূর্যের গ্রহণ হইবে, কিংবা অমুক সময়ের মধ্যে রোগীর মৃত্যু হইবে, অমুক সময়ে একটি ব্যাধির সহিত অমুক এক ব্যাধি আসিয়া সংযুক্ত হইবে। যদিও এই সব তত্ত্ববিদ খোদার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, তবু প্রকারান্তরে স্বীকার না করিয়া পারেন না যে, তাহারাও আমাদের মত ক্রিয়ার কর্তা, নিমিত্ত বা কারণ অব্যবহণ করেন। সুতরাং, ইহাও এক প্রকার স্বীকার, যদিও সম্পূর্ণ স্বীকার নয়। ইহা ছাড়া, যদি কোন প্রক্রিয়া দ্বারা কোন নিরীশ্বরবাদীর চেতনা লোপ করা যায়, যেন সে এই হীন

জীবনের চিত্তা ধারা হইতে সম্পূর্ণ বিছিন্ন হইয়া পড়ে এবং তাহার ইচ্ছা শক্তি নিষ্ক্রিয় হইয়া মহান সুস্থির করতলগত হয়, তবে সে তদবস্থায় খোদার অস্তিত্ব স্বীকার করিবে, অস্বীকার করিবে না। এ বিষয়ে বড় বড় গবেষকগণের সাক্ষ্য রহিয়াছে। বস্তুতঃ এই অবস্থার প্রতিই উল্লিখিত আয়াতে ইঙ্গিত আছে। স্বষ্টার অস্তিত্বে ‘অস্বীকার’ শুধু ইতর হীন আসক্তির জীবন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। নতুবা, মূল মানব প্রকৃতি ‘স্বীকারে’ ভরপুর।

মহান স্বষ্টার গুণাবলী

স্বষ্টার অস্তিত্ব সম্মত এই কয়েকটি যুক্তি নমুনা হিসাবে লিখিত হইল। অতঃপর ইহাও জানা আবশ্যক যে, যে খোদার দিকে আমাদিগকে কুরআন শরীফ আহ্বান করে, উহাতে তাঁহার নিম্নরূপ গুণাবলী লিখিত আছে :

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلِمُ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ - (الْحَسْرَة: ٢٣)
مِلِكُ يَوْمِ الدِّينِ.

الْمَلِكُ الْقَدُّوسُ السَّلَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَمِّمُ الْعَزِيزُ الْجَبَارُ
الْمُتَكَبِّرُ - (الْعَشْرَة: ٢٣)

هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لِكُلِّ الْأَسْمَاءِ
الْحَسْنَى - (الْحَسْرَة: ٢٥)

يُسْبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ
الْعَظِيمُ - (الْحَسْرَة: ٢٥)

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ - (الْبَقْرَة: ١٤٩)

رَبُّ الْعَلَمِينَ الرَّحِيمُ مِلِكُ يَوْمِ الدِّينِ (الفা�ത্তে: ٤-٣)

أَجَيْبُ دَعْوَةِ الدَّاعِ إِذَا دَعَاهُنَّ - (الْبَقْرَة: ١٨٧)

الْحَقُّ الْفَقِيرُ - (آلِ عُمَر: ٣)

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
أَنَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ
وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهَ كُفُواً أَحَدٌ۔ (الإخلاص ۱)

অর্থাৎ, “সেই খোদা এক-অদ্বিতীয় ও অংশীবিহীন, তিনি ব্যতীত কেহই আরাধনার ও আনুগত্যের যোগ্য নহে” (৫৯:২৩)। ইহা এই জন্যই বলিয়াছেন যে, তিনি অংশীবিহীন না হইলে সম্ভবতঃ তাঁহার শক্তির উপর শক্তির শক্তি প্রবল হইতে পারিত। এই অবস্থায় ঐশ্বী মর্যাদা বিপন্ন হইত। এবং তিনি যে বলিয়াছেন : “তিনি ব্যতীত কেহই আরাধ্য নাই,” ইহার অর্থ হইল, তিনি এমন কামেল (পরিপূর্ণ) খোদা যাঁহার গুণাবলী ও কামালত এরূপ উচ্চ ও মহান যে, বিশ্ব চরাচরে কামেল গুণাবলীর জন্য কোন খোদার নির্বাচন করিতে চাহিলে, কিংবা মনে মনে শ্রেয়ঃ হইতে শ্রেয়তর এবং উচ্চ হইতে উচ্চতর কোন খোদার গুণাবলী কল্পনা করিতে গেলে, যাঁহাকে ছাড়াইয়া কেহ উত্তম হইতে পারে না, তিনিই আল্লাহ, যাঁহার আরাধনায় কোন বস্তুকে শরীক করা অন্যায়। অতঃপর তিনি বলিয়াছেন : “তিনি আলেমুল গায়েব”। অর্থাৎ, তাঁহার সত্তাকে একমাত্র তিনিই জানেন। তাঁহার সত্তাকে কেহ পরিবেষ্টন করিতে পারে না। চন্দ্ৰ-সূর্য এবং প্রত্যেক সৃষ্টি বস্তুর আপাদ মস্তক আমরা দর্শন করিতে পারি, কিন্তু খোদার আপাদ মস্তক দর্শনে আমরা অক্ষম। পুনরায় তিনি বলিয়াছেনঃ “তিনি আলেমুশূশ্ব শোহাদাহ”। অর্থাৎ কোন জিনিষ তাঁহার দৃষ্টির অগোচর নহে। ইহা হইতে পারে না যে, তিনি খোদা বলিয়া অভিহিত হইয়া বস্তু জগৎ সম্বন্ধে উদাসীন। তিনি বিশ্বের অণুপরমাণু পর্যন্ত দেখেন। কিন্তু মানুষ তাহা পারে না। তিনি জানেন, কখন তিনি এই জগত বিধানকে ভাঙ্গিয়া ফেলিবেন এবং কেয়ামত আনিবেন এবং পুনরুত্থান ঘটাইবেন। তিনি ছাড়া কেহ জানে না যে, এরূপ কখন হইবে। সুতরাং, তিনিই খোদা যিনি সকল প্রকারের সময়কেই জানেন। তিনি আবার বলিয়াছেন : “হৃয়ার রহমান”। অর্থাৎ তিনি প্রাণী সকলের অস্তিত্ব ও উহাদের কর্মের পূর্বে শুধু আপন দয়ায়, কোন স্বার্থের জন্য নহে বা কাহারও কর্ম ফলেও নহে, তাহাদের জন্য আরামের সামগ্ৰী যোগাইয়া থাকেন। যেমন, সূর্য ও পৃথিবী এবং অন্য সব জিনিষ আমাদের অস্তিত্ব লাভের পূর্বে আমাদের কর্মের অস্তিত্বের পূর্বে, আমাদের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। এই দানের নাম খোদা নিজ গ্রন্থে রহমানীয়ত এবং এই কাজের দিক হইতে নিজের নাম রহমান রাখিয়াছেন। তিনি পুনরায় বলিয়াছেন : “আরু রহীম”। তিনি খোদা, যিনি উত্তম কাজের উত্তম পুরস্কার দেন। কাহারও শ্রমকে নষ্ট করেন না। এই কাজের দিক হইতে তিনি রহীম এবং এই গুণের নাম রহীমীয়ত। তারপর তিনি বলিয়াছেনঃ “মালেকে ইয়াওমেন্দীন”(১:৪)। অর্থাৎ “সেই খোদা প্রত্যেকের পুরস্কার বা শান্তি স্বহস্তে ধারণ করেন”। তাঁহার এমন কার্য নির্বাহক নাই, যাহাকে তিনি

আকাশ ও পৃথিবীর শাসন ক্ষমতা সঁপিয়া দিয়া স্বয়ং পৃথক হইয়া বসিয়া আছেন এবং নিজে কিছুই করেন না। এমনও নহে যে, সেই কার্য নির্বাহকই যত পুরস্কার ও শাস্তি দেয় বা ভবিষ্যতে দিবে। তারপর তিনি বলিয়াছেন :

آلِلِكَ الْفَدُّوْسُ

আল্ মালেকুল কুদুস”। অর্থাৎ, “সেই খোদা বাদশাহ, যাহার কোনই কলঙ্ক নাই” (৫৯:২৪)। ইহা সুস্পষ্ট যে, মানুষের বাদশাহাত কলঙ্কহীন নহে। দৃষ্টান্ত স্থলে, যদি কোন বাদশাহের সব প্রজা কষ্ট পাইয়া বা বিভাড়িত হইয়া দেশ ত্যাগ করিয়া অন্য দেশ অভিমুখে পলায়ন করে, তবে তাহার বাদশাহী কায়েম থাকিতে পারে না। কিংবা যদি সব প্রজা দুর্ভিক্ষ প্রগতি হয়, তাহা হইলে রাজস্ব কোথা হইতে আসিবে? যদি প্রজাগণ বাদশাহের সহিত তর্ক আরম্ভ করিয়া দেয় যে, তাহার ও প্রজাদের মধ্যে এমন কি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পার্থক্য আছে, তাহা হইলে তিনি তাহাদের নিকট নিজের কি বিশেষ যোগ্যতা সাব্যস্ত করিবেন? বস্তুতঃ খোদাতা’লার বাদশাহী এ প্রকারের নহে। তিনি মুহূর্তে সব দেশ লয় করিয়া অন্য সৃষ্টি আনয়ন করিতে পারেন। যদি তিনি এইরূপ ক্ষমতাবান সৃষ্টা ও শক্তিমান প্রতিপালক না হইতেন, তাহা হইলে তাহার বাদশাহাত নির্যাতন ছাড়া চলিতে পারিত না। কারণ তিনি একবার বিশ্ববাসীকে ক্ষমা এবং মুক্তি দান করিয়া অন্য জগৎ কোথা হইতে আনিতেন? মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে পৃথিবীতে পুনঃ প্রেরণের জন্য আবার ধর পাকড় ও নির্যাতনের পথে কি প্রদত্ত ক্ষমা ও মুক্তিকে অত্যাহার করিতে হইত না? তদবস্থায়, তাহার ঐশ্বী-কর্মকাণ্ডে পার্থক্য ঘটিত এবং তিনি পৃথিবীর বাদশাহগণের ন্যায় এক কলঙ্ক কালিমা লিপ্ত বাদশাহ হইয়া পড়িতেন, যাহারা দেশের জন্য আইন-কানুন তৈরি করে, যাহারা কথায় কথায় বিগড়াইয়া যায় এবং নিজ স্বার্থ রক্ষার জন্য যখন দেখিতে পায় যে, নির্যাতন ছাড়া গতি নাই, তখন তাহারা নির্যাতনকে মাত্-স্তনের দুধের ন্যায় মনে করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, রাজকীয় আইনে একটি জাহাজকে বাঁচাইতে একটি নৌকার সকল আরোহীকে ধূংসের মুখে নিষ্কেপ করাকে ও সত্য সত্যই বিনষ্ট করাকে, সিদ্ধ রাখা হইয়াছে। কিন্তু খোদার পক্ষে এই প্রকার অসহায় হওয়া অনুচিত। সুতরাং যদি খোদা সর্বশক্তিমান ও অনন্তিত্ব হইতে সৃষ্টিকারী না হইতেন, তাহা হইলে তিনি হয় দুর্বল রাজাদের ন্যায় মহিমার পরিবর্তে অত্যাচারের দ্বারা কাজ লইতেন, অথবা বিচারক হইয়া খোদায়ীকেই বিদায় দিতেন। পরন্তু খোদার জাহাজ সকল মহিমার সহিত প্রকৃত বিচারের উপরে চলিতেছে। তিনি আবার বলিয়াছেন, ‘আস্সালাম’ অর্থাৎ, সেই খোদা, যিনি ক্রটি-বিচুতি, বিপদ-আপদ ও কঠোরতা হইতে নিরাপদ, বরং শাস্তিদাতা। ইহার অর্থও স্পষ্ট। কারণ যদি তিনি নিজেই বিপদগ্রস্ত হইতেন, লোকের হাতে মারা পড়িতেন এবং তাহার ইচ্ছা-শক্তি ব্যর্থ হইত, তাহা হইলে এই মন্দ নমুনাকে দেখিয়া মন কি প্রকারে এই বলিয়া সাম্ভূনা লাভ করিতে পারিত যে, এহেন খোদা আমাদিগকে নিশ্চয় আপদ মুক্ত করিবেন?

আল্লাহতা'লা মিথ্যা উপাস্যদের স্বক্ষে বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوهُ^۱

ذُبَابًا وَلَوْا جَمَعَوْا إِلَيْهِ وَإِنْ يَشْبِهُمْ الدُّبَابُ

شَيْئًا لَا يَسْتَقِدُهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَ

الْمَطْلُوبُ مَا قَدَرُوا اللَّهُ حَقٌّ قَدِيرٌ^۲ إِنَّ اللَّهَ

لَقِوْيٌ عَزِيزٌ۔ ر.الحجج ۷۵-۷۶

“যে সব মানুষকে তোমরা খোদা বানাইয়া বসিয়া আছ, তাহারা সকলে মিলিয়া একটি মাছি সৃষ্টি করিতে চাহিলেও, কখনও তাহা পারিবে না, এমনকি একে অপরকে সাহায্য করিলেও না। বরং যদি মাছি তাহাদের কোন জিনিষ ছিনাইয়া লইয়া যায়, তবে সেই মাছি হইতে সেই বস্তু ফেরৎ আনিবার শক্তি ও তাহাদের হইবে না” (২২:৭৪-৭৫)। তাহাদের উপাসকগণ বুদ্ধি ও শক্তিতে দুর্বল। খোদাতো তিনি, যিনি সকল শক্তিমান হইতেও অধিক শক্তিশালী এবং সকলের উপর প্রাধান্য বিস্তারকারী। কেহ তাঁহাকে ধরিতে বা বধ করিতে পারে না। যাহারা ভর্মে নিপত্তি, তাহারা খোদার ঘর্যাদা বুঝে না এবং জানে না যে, খোদা কেমন হওয়া উচিত। তারপর বলিয়াছেন : “খোদা শান্তি দাতা, স্বীয় কামালাত ও তৌহীদের প্রমাণ প্রতিষ্ঠাকারী”। ইহা এই কথার প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে যে, প্রকৃত খোদার মান্যকারী ব্যক্তি কোন মজলিসে লজ্জিত হইতে পারে না এবং সে খোদার সম্মুখেও লজ্জিত হইবে না। কারণ তাহার কাছে শক্তিশালী যুক্তি থাকে। কিন্তু কৃত্রিম খোদায় বিশ্বাসী বড়ই বিপদে থাকে। সে যুক্তি দেওয়ার পরিবর্তে নির্বর্থক আজেবাজে কথাকে গোপন তত্ত্ব আখ্যা দেয়, যাহাতে হাস্যাস্পদ হইতে না হয় এবং প্রমাণিত ভাস্তিসমূহকে ঢাকা দিতে চাহে। তিনি আরও বলিয়াছেন :

الْمُمْكِنُونَ الْعَزِيزُ الْعَبَارُ الْمُتَحَكِّمُ. ر.الحضر ۳۴

অর্থাৎ “তিনি সকলের রক্ষক, পরাক্রমশালী, নষ্ট হওয়া কাজকেও সুসম্পন্নকারী; তাঁহার সক্তা চূড়ান্তভাবে অভাবের অতীত” (৫৯:২৪)। তিনি আরও বলিয়াছেন :

هُوَ اللَّهُ الْحَالِقُ الْبَارِقُ الْمُصِرِّمُ لِهِ الْأَسْتَأْوُ. ر.الحضر ۳۵

অর্থাৎ “তিনি এমন খোদা যে, তিনি সকল দেহেরও স্রষ্টা এবং সকল আঘাতও স্রষ্টা; গর্ভাশয়ে রূপশিল্পী তিনিই। যত ভাল ভাল নাম ধারণা করা সম্ভব, সব তাঁহারই” (৫৯:২৫)। তিনি একই সঙ্গে আরও বলেন :

يُسْتَخْلَفُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ

الْحَكِيمُ - (الْعَشْرَةُ)

অর্থাৎ “আকাশমণ্ডলের অধিবাসীরাও তাহার নাম পবিত্রতার সঙ্গে স্মরণ করে এবং পৃথিবীর অধিবাসীরাও করে” (৫৯:২৫)। এই আয়াতে ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, মহাকাশের গ্রহ-নক্ষত্রে বসতি আছে এবং ঐ সকল অধিবাসীরাও খোদার হেদায়াতসমূহের অন্তর্ভুক্ত। পুনরায় বলেন :

عَلَىٰ كُلِّ شَئْءٍ قَدِيرٌ - (البقرة : ١٤٩)

অর্থাৎ, “খোদা সর্বশক্তিমান” (২:১৪৯)। এই নাম উপাসকগণের জন্য বড়ই শান্তি প্রদায়ক। কারণ, খোদা যদি দুর্বল হন এবং সর্বশক্তিমান না হন, তবে এরূপ খোদার নিকট আমরা কি আশা করিব? তারপর বলেন :

رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّغِيبُ مِنْ يَوْمِ الدِّينِ الْعَاصِمِ (٤٠)

أَعْجَبَ دَغْرَةً الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ - (البقرة : ١٨٧)

অর্থাৎ, “তিনিই খোদা, যিনি সকল জগতের পালনকর্তা, রহমান, রহীম এবং বিচার দিনের স্বয়ং মালিক। এই দিনের কর্তৃত্ব তিনি কাহারও হাতে দেন নাই। প্রত্যেক আহ্বানকারীর আহ্বান শ্রবণকারী এবং জবাবদানকারী। অর্থাৎ, প্রার্থনা মঞ্জুরকারী” (১:২-৪, ২:১৮৭)। আবার বলিয়াছেন :

أَنْعَىٰ الْقَيْمَرُ - (آل عمرَان : ١٣)

অর্থাৎ, “সদা বিদ্যমান, সকল প্রাণের প্রাণ এবং সব অস্তিত্বের আশ্রয়” (২:২৫৬)। ইহা বলার কারণ, তিনি অনাদি ও অনন্ত না হইলে তাহার জীবন সম্বন্ধে আশঙ্কা রহিত যে, আমাদের পূর্বেই না তাহার মৃত্যু হইয়া যায়। তারপর বলেনঃ “সেই খোদা এক-অদ্বিতীয় খোদা। তিনি কাহারও পুত্র নহেন, এবং কেহ তাহার পুত্র নহে। কেহ তাহার সমকক্ষ নহে এবং কেহ তাহার স্বজাতীয় নহে” (১:২: ২-৫)।

স্মরণ রাখিতে হইবে, খোদাতা'লার তৌহীদ (একত্ব) সম্বন্ধে সঠিক বিশ্বাস রাখা এবং ইহাতে কম-বেশী না করাই হইল সঠিক বিচার, যাহা মানুষ তাহার প্রকৃত মালিকের সম্বন্ধে করিয়া থাকে। এই সকল বিষয় নৈতিক শিক্ষার অন্তর্গত যাহা কুরআন শরীফের শিক্ষায় সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহাতে মূল সূত্র হইল, খোদাতা'লা সমগ্র নৈতিক গুণকে ঐ অবস্থায় নৈতিক গুণ নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন, যখন উহা বাস্তব ও ন্যায্য সীমা অপেক্ষা কম বা অধিক না হয়। স্পষ্ট কথা, উহাই প্রকৃত সাধুতা, যাহা দুই সীমানার মধ্যে থাকে। অর্থাৎ, আধিক্য ও ন্যূনতা এবং কম-বেশীর সীমানা অতিক্রম করার মাঝামাঝি অবস্থায় থাকে। যে অভ্যাস মধ্যপন্থার দিকে আকৃষ্ট করে এবং মধ্যপন্থা কায়েম করে, উহাই উন্নত নৈতিকতা সৃষ্টি করে। পরিবেশ ও পরিস্থিতি জানা একটি মধ্যপন্থা।

দৃষ্টান্তস্থলে, কৃষক সময়ের পূর্বে বা পরে তাহার বীজ বপন করিলে, সে উভয় অবস্থায় মধ্যপদ্ধতি পরিত্যাগ করে। পুণ্য, সত্য এবং প্রজ্ঞা সব মধ্যপদ্ধায় রহিয়াছে এবং মধ্যপদ্ধতি রহিয়াছে পরিস্থিতি নির্ধারণে। অথবা এই প্রকারে বুঝিতে হইবে যে, সত্য সর্বদা দুই প্রতিদ্বন্দ্বী মিথ্যার মধ্যভাগে থাকে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, সঠিক সুযোগ অনুসরণেই মানুষ সর্বদা মধ্যপদ্ধায় থাকে। খোদাকে চিনিবার ব্যাপারে মধ্যপদ্ধার পরিচয় এই যে, খোদার গুণ বর্ণনায় নেতিবাচক গুণাবলীর দিকে অধিক ঝুঁকিবে না এবং খোদাকে জড় দেহধারী জিনিষের অনুরূপ বলিয়া নির্ধারণ করিবে না। কুরআন শরীফ স্রষ্টার গুণাবলী বর্ণনায় এই পদ্ধাই অবলম্বন করিয়াছে। যেমন উহা বলে যে, খোদা দেখেন, শোনেন, জানেন, বলেন, বাক্যালাপ করেন, তেমনি উহা অন্যদিকে সৃষ্টির সাদৃশ্য হইতে রক্ষা করার জন্য বলে :

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ - رَالشَّرِيكَ

فَلَا تَضِيرُ بِنَوَّا إِلَيْهِ الْأَمْثَالُ - رَالنَّجَاعَ

অর্থাৎ, “খোদার সত্তায় ও গুণে তাহার কোন অংশীদার নাই। তাহার সংগে সৃষ্টির উপমা দিবে না” (৪২:১২, ১৬:৭৫)। সুতরাং, খোদার সত্তাকে উপমিত এবং উপমাতীত এই উভয়ের মাঝামাঝি রাখাই মধ্যপদ্ধতি। বস্তুতঃ ইসলামের শিক্ষা সবই মধ্যপদ্ধার শিক্ষা। সূরা ফাতেহাও মধ্যপথে চলার হেদায়াত দান করে। কারণ, খোদাতালা বলেন :

عَيْرِ الْغَضْبُ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

কোপগ্রস্তদিগের **مَغْضُوبُ** দ্বারা তাহাদিগকে বুঝায় (১:৭), যাহারা খোদাতালার মোকাবেলায় ক্রোধ রিপুর বশবর্তী হইয়া পশুবৃত্তিসমূহের অনুসরণ করিয়া চলে এবং পথভ্রষ্টগণ **ضَالِّينَ** দ্বারা তাহাদিগকে বুঝায়, যাহারা পশু-বৃত্তিনিচয়ের অনুগমন করে। মধ্যপদ্ধতি সেই পথ, যাহা **أَنْعَمَتْ عَلَيْهِمْ** (যাহারা পুরুষারপ্রাপ্ত) বাক্যাংশে উল্লেখ করা হইয়াছে। বস্তুতঃ এই আশিসপ্রাপ্ত উম্মতের জন্য কুরআন শরীফে মধ্যপদ্ধার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। তওরাতে খোদাতালা প্রতিশোধের উপর জোর দিয়াছিলেন এবং ইঞ্জিলে ক্ষমার উপর জোর দিয়াছিলেন। এই উম্মতকে পরিস্থিতি চেনার এবং মধ্যপদ্ধার শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। যেমন, খোদাতালা বলেন :

وَكَذِلِكَ جَعَنَّكُمْ أُمَّةً وَسَطًا - رَالبَرَقَةَ

অর্থাৎ, “আমরা তোমাদিগকে মধ্যপদ্ধার উপর আমলকারী করিয়াছি এবং তোমাদিগকে মধ্যপদ্ধতি অবলম্বনের শিক্ষা দিয়াছি। অতএব, ধন্য তাহারা, যাহারা মধ্য পথে চলে।” (২:১৪৪)

خَيْرٌ لِّلْمُؤْمِنِ أَوْ سَطْهَا -

‘মধ্য পদ্ধাই সর্ব বিষয়ে উৎকৃষ্ট।’

রুহানী (আধ্যাত্মিক) অবস্থাসমূহ

তৃতীয় বিভাগ অর্থাৎ ‘রুহানী অবস্থা’ কি? জানা আবশ্যিক, ইতিপূর্বে আমরা বলিয়াছি যে, কুরআন শরীফের হেদায়াত অনুসারে রুহানী অবস্থার উৎস হইতেছে ‘নাফ্সে মুত্মাইন্নাহ’ (প্রশান্ত আত্মা), যাহা মানুষকে উত্তম চরিত্র লাভের মর্যাদা হইতে খোদা লাভের মর্যাদায় পৌছায়। যেমন, আল্লাহ জাল্লা শান্ত বলেন :

يَا بَيْتَهَا النَّفْسُ الْمُطْسَئَةُ - ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ رَاضِيَةً

قَرْضِيَّةً - فَادْخُلْنِ فِي عِبْدِيَّ - وَادْخُلْنِ جَنَّتِي -

الفجر : ٣١-٢٨

অর্থাৎ, “হে খোদার সহিত শান্তিপ্রাপ্ত আত্মা, আপন প্রভু পরওয়ারদিগারের নিকট ফিরিয়া আইস। তিনি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট এবং তুমি তাঁহাতে সন্তুষ্ট। সুতরাং তুমি আমার বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাও এবং আমার বেহেশ্তে প্রবেশ কর” (৮৯:২৮-৩১)।

এই স্থলে রুহানী অবস্থা ব্যক্ত করিবার জন্য এই মহা সম্মানিত আয়াতের একটু বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেওয়া শ্রেয়ঃ মনে করি। স্মরণ রাখিতে হইবে, মানুষের উচ্চ পর্যায়ের রুহানী অবস্থা এই পার্থিব জীবনে ইহাই যে, সে খোদাতা’লার নিকট হইতে শান্তি পাইয়া যায় এবং তাহার সম্যক শান্তি, সুখ ও তৃপ্তি খোদার মধ্যেই নিবন্ধ হইয়া যায়। ইহাই সেই অবস্থা যাহাকে অন্য কথায় বেহেশ্তী জীবন বলা হয়। এই অবস্থায় মানুষ তাহার পূর্ণ আন্তরিকতা, হৃদয়ের পরিব্রহ্মতা ও বিশ্বস্ততার বিনিময়ে নগদ বেহেশ্ত পাইয়া যায়। অন্যেরা প্রতিশ্রুত বেহেশ্তের অপেক্ষা করে, পক্ষান্তরে ঐ অবস্থাপ্রাপ্ত মানুষের বেহেশ্ত বর্তমানেরই অন্তর্ভুক্ত। এই পর্যায়ে পৌছিয়া মানুষ বুঝিতে পারে যে, যে এবাদতের বোকা তাহার মাথার উপর চাপান হইয়াছিল, প্রকৃতপক্ষে উহাই এমন এক খাদ্য, যদ্বারা তাহার আত্মা পুষ্টি লাভ করিয়া থাকে এবং যাহার উপর তাহার আধ্যাত্মিক জীবন বিশেষভাবে নির্ভরশীল। ইহার ফলপ্রাপ্তির জন্য অন্য কোন জগতের অপেক্ষা করিতে হয় না। এখানেই ইহা লাভ হইয়া থাকে। সেই সব ধিক্কার, যাহা নাফ্সে লাউওয়ামাহ মানুষকে তাহার অপবিত্র জীবনের জন্য দিয়া থাকে এবং ইহা সত্ত্বেও তাহার মধ্যে সাধু আগ্রহ ও আকাঞ্চ্ছা ভাল মত জাগ্রত করিতে পারে না, কুপ্রবৃত্তির প্রতি ও প্রকৃত ঘৃণার সংগ্রাম করিতে সক্ষম হয় না এবং পুণ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পুরাপুরি শক্তিদানেও সফল হয় না, তাহা সেই পবিত্র প্রেরণায় পরিবর্তিত হইয়া যায়, যাহা নাফ্সে মুত্মাইন্নাহ্ উদ্গমের সূচনা করে। এই পর্যায়ে পৌছিলেই সেই সময় আসে, যখন মানুষ পূর্ণ সফলতা লাভ করে। তখন তাহার যাবতীয় নীচ প্রবৃত্তি আপনাআপনি নিজীব হইতে থাকে, এবং তাহার আত্মায় এমন এক শক্তিসংগ্রামী বায়ু-প্রবাহ চলিতে থাকে, যাহার ফলে সে পূর্বেকার দুর্বলতা

অনুতাপের দ্রষ্টিতে দেখে। তখন মানুষের স্বভাবে এক মহা বিপ্লব সংঘটিত হয়। অভ্যাসসমূহে এক মহা পরিবর্তন সাধিত হয় এবং মানুষ তাহার পূর্বাবস্থা হইতে অনেক দূরে সরিয়া যায়। সে ধোত এবং পরিষ্কৃত হয়। খোদা স্বহস্তে পুণ্যের আকর্ষণ তাহার হৃদয়ে ঢালিয়া দেন এবং অসাধুতার সব ময়লা স্বহস্তে তাহার হৃদয়ের বাহিরে নিক্ষেপ করিয়া দেন। সত্যের সেনাবাহিনী সর্বেব তাহার হৃদয় কন্দরে উপস্থিত হয় এবং তাহার প্রকৃতির সকল মিনার-চূড়ায় ন্যায়পরায়ণতার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়। সত্যের জয় হয়। মিথ্যা পলায়ন করে ও স্বীয় অন্ত ফেলিয়া দেয়। হেন ব্যক্তির হৃদয়ে খোদার হাত স্থাপিত হয়। সে প্রত্যেক পদক্ষেপে খোদার ছায়ায় চলিতে থাকে। যেমন, খোদাতা'লা নিম্নে উন্নত আয়াতগুলিতে এই সব কথার প্রতি ইংগিত করিতেছেন :

أُولَئِكَ لَتَبْ نَفْلُوْبِعِمْ الْإِيْسَانَ وَأَيَّدَهُمْ

بِرْ رَجِعِ مِنْهُ - (المجادلة: ١٢)

حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيْسَانَ وَزَيْنَةَ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّةَ

إِلَيْكُمُ الْكُفَّرَ وَالْفُسْقَ وَالْعِصْبَيَانَ أُولَئِكَ هُمْ

الرَّشِيدُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ

عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ - رَحْمَرَت: ٨-٩

جَاءَهُمْ الْعَقْ وَزَهْقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ

زَهْقًا - (بَنْيَ آسَر: ٨٢)

অর্থাৎ, “খোদা মোমেনদের হৃদয়ে স্বহস্তে ঈমান লিখিয়া দিয়াছেন এবং রূহল কুদুস দ্বারা তাহাদের সাহায্য করিয়াছেন (৫৮:২৩)। হে মোমেনগণ! তিনিই ঈমানকে তোমাদের কাছে প্রিয় করিয়াছেন। ইহার রূপ ও সৌন্দর্য তোমাদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছেন। কুফরী, কুকার্য ও পাপের প্রতি তোমাদের চিন্তে ঘৃণার সৃষ্টি করিয়াছেন। তোমাদের হৃদয়ে কুপথসমূহের কদর্য ও ঘৃণিত হওয়াকে দৃঢ়ভাবে অঙ্গিত করিয়াছেন। এই সব কিছু খোদার ফয়ল ও রহমতে হইয়াছে(৪৯:৮-৯)। সত্য আসিয়াছে এবং অসত্য পলায়ন করিয়াছে। মিথ্যা কবে সত্যের সম্মুখে টিকিতে পারিয়াছে” (১৭:৮২) ?

বস্তুতঃ, এই সব ইঙ্গিতই সেই আধ্যাত্মিক অবস্থার প্রতি, যাহা ত্তীয় পর্যায়ে মানুষ লাভ করিয়া থাকে। সত্যিকার দৃষ্টিশক্তি মানুষ কখনও লাভ করিতে পারে না, যে পর্যন্ত না সে এই অবস্থা প্রাপ্ত হয়, আর খোদাতা'লা যে বলিয়াছেন : “আমি তাহাদের হৃদয়ে স্বহস্তে ঈমান লিখিয়া দিয়াছি এবং রূহল কুদুস দ্বারা

তাহাদিগকে সাহায্য করিয়াছি” উহা এই কথার প্রতি ইংগিত করে যে, মানুষ সত্যিকার পবিত্রতা ও শৃঙ্খলা কখনও লাভ করিতে পারে না, যে পর্যন্ত না স্বর্গীয় সাহায্য তাহার সঙ্গী হয়। ‘নাফ্সে লাউওয়ামাহ’ পর্যায়ে মানুষের এই অবস্থা থাকে যে, সে বার বার তওবা করে এবং বার বার পতিত হয়। বরং অনেক সময় সে আত্মশুন্দি সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া পড়ে। স্বীয় ব্যাধিকে চিকিৎসার অতীত মনে করে। দীর্ঘকাল পর্যন্ত এমনই থাকে। অতঃপর, নির্দিষ্ট সময় পূর্ণ হইলে, রাত্রিকালে বা দিবাকালে সহসা এক আলোক তাহার উপর অবতীর্ণ হয়। এই আলোকে ঐশ্বী-শক্তি থাকে। এই আলোকের অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে এক আশ্চর্য পরিবর্তন তাহার মধ্যে সাধিত হয় এবং অদৃশ্য হস্তের এক শক্তিশালী প্রভাব অনুভূত হয়। এক আশ্চর্য জগৎ তাহার সামনে উপস্থিত হয়। তখন মানুষ বুঝিতে পারে যে, খোদা আছেন এবং তাহার চোখে এক জ্যোতিঃ আসে, যাহা ইতিপূর্বে ছিল না। কিন্তু এই পথকে কীভাবে লাভ করা যাইবে এবং এই আলোকে কী প্রকারে পাওয়া যাইবে? ইহার জন্য জানা উচিত যে, এই হেতুময় জগতে প্রত্যেক ক্রিয়ার পিছনে কারণ আছে এবং প্রত্যেক গতির পিছনে গতিদাতা আছে। প্রত্যেক জ্ঞান অর্জনের এক পন্থা আছে। উহাকে ‘সিরাতে মুস্তাকীম’ (সেরল-সুদৃঢ় পথ) বলে। পৃথিবীতে এমন কোন বস্তু নাই, যাহা পাওয়ার জন্য আদি হইতে নির্ধারিত প্রকৃতির নিয়ম কানুনের অনুগমন ছাড়া লাভ করা যায়। প্রাকৃতিক নিয়ম এই শিক্ষাই দেয় যে, প্রত্যেক বস্তুকে পাওয়ার এক ‘সিরাতে মুস্তাকীম’ আছে। উহার অর্জন স্বত্বাবতঃ সেই পথের অনুসরণের উপর নির্ভরশীল। দৃষ্টান্ত স্থলে, যদি আমরা কোন অন্ধকার প্রকোষ্ঠে থাকি এবং সূর্যালোকের প্রয়োজন হয়, তবে আমাদের জন্য ‘সিরাতে মুস্তাকীম’ হইতেছে প্রকোষ্ঠের সেই অর্গন খুলিয়া দেওয়া, যাহা সূর্যের দিকে রহিয়াছে। তবেই তৎক্ষণাত্মে সূর্যালোক ভিতরে প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে আলোকিত করিয়া দিবে। সুতরাং, স্পষ্ট কথা এই যে, খোদার সত্য এবং প্রকৃত আশিসসমূহ পাওয়ার জন্যও অনুরূপভাবে কোন খিড়কি থাকিবে এবং পবিত্র রূহানীয়ত লাভেরও কোন বিশেষ পন্থা থাকিবে এবং উহা ইহাই যে, রূহানী ব্যাপারে আমরা যেন ঠিক তেমনিভাবে ‘সিরাতে মুস্তাকীম’ অব্বেষণ করি, যেমন আমরা আমাদের পার্থিব সফলতার জন্য ‘সিরাতে মুস্তাকীম’ অব্বেষণ করিয়া থাকি। কিন্তু সে কি এই পন্থা যে, আমরা শুধু আমাদের বুদ্ধির বলে এবং নিজেদের মনগড়া উপায়ে খোদার নৈকট্য অব্বেষণ করিব? শুধু কি আমাদের নিজ তৈরী ন্যায়শাস্ত্র এবং দর্শনশাস্ত্রের দ্বারা তাঁহার সেই দুয়ার আমাদের নিকট খুলিবে, যাহার উদ্ঘাটন তাঁহার শক্তিশালী হস্তের উপর নির্ভরশীল? না নিশ্চিতরূপে জানিও যে, **النَّفْوُمْ تُرْلِي**। তাহা কিছুতেই সম্ভব নহে। চিরঝীবী ও জীবনদাতা এবং চিরস্থায়ী ও স্থিতিদাতা খোদাকে আমরা শুধু আমাদেরই চেষ্টা তদ্বীর দ্বারা কখনও পাইতে পারি না। বরং ইহার জন্য ‘সিরাতে মুস্তাকীম’ শুধু ইহাই যে, আমরা আমাদের জীবনকে আমাদের যাবতীয় শক্তিসহ খোদাতালার পথে ওয়াক্ফ (উৎসর্গ) করিয়া খোদা মিলনের জন্য দোয়ায় মগ্ন হই, যাহাতে খোদাকে খোদার সাহায্যেই পাইতে পারি।

একটি অতি প্রিয় দোয়া

সর্বাপেক্ষা প্রিয় দোয়া, যাহা আমাদিগকে উপযুক্ত পরিবেশ এবং যথার্থ পরিস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞান দান করে এবং আমাদের প্রকৃতির রূহানী আবেগের নকশা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করে, উহা সেই দোয়া, যাহা দয়ালু খোদা তাঁহার পবিত্র গ্রন্থ কুরআন শরীফে, ‘সূরা ফাতিহায়’ আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন এবং উহা এই :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْعَمْدَلِهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

“যত পবিত্র গুণগান হইতে পারে, সবই সেই আল্লাহর প্রাপ্য, যিনি জগত সমূহের সৃষ্টিকর্তা এবং স্থিতিদাতা” (১:১-২)।

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ -

“সেই খোদা যিনি আমাদের কর্মের পূর্বে আমাদের জন্য রহমতের সকল সামগ্রী সরবরাহকারী এবং আমাদের কর্মের পর রহমতের সঙ্গে পুরক্ষার দানের ব্যবস্থাকারী” (১:৩)।

مُلِكِ يَوْمِ الدِّينِ

“সেই খোদা যিনি প্রতিদান দিবসের একমাত্র মালিক এবং সেই দিনকে তিনি অন্য কাহারও নিকট সোপর্দ করেন নাই” (১:৪)।

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ -

“হে এই সকল প্রশংসার আধার! আমরা তোমারই আরাধনা করি এবং আমরা সকল কাজের তৌফীক তোমারই নিকটে চাই” (১:৫)।

এখানে “আমরা” শব্দ দ্বারা আরাধনার স্বীকৃতি এই কথার দিকে ইঙ্গিত করিতেছে যে, আমাদের সকল অভ্যন্তরীণ শক্তি তোমারই আরাধনায় নিয়োজিত এবং তোমারই আন্তর্নায় অবনত। কারণ মানুষ নিজের অভ্যন্তরীণ শক্তিসমূহের দিক হইতে এক জামাত, এক উম্মত এবং এই হিসাবে সম্পর্কিত সকল শক্তির ‘উৎস’ খোদাকে সিজদা করাই সেই অবস্থা, যাহাকে ইসলাম বলা হয়।

إِنَّا لِقَرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ - صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

“আমাদিগকে তোমার সরল-সুদৃঢ় পথ দেখাও এবং উহার উপরে আমাদের পদক্ষেপ দৃঢ় করিয়া ত্রি সকল ব্যক্তির পথ দেখাও যাহাদের উপর তোমার পুরক্ষার ও সশান রহিয়াছে এবং যাহারা তোমার অনুগ্রহ ও কল্যাণের পাত্র হইয়াছে” (১:৬)।

غَيْرِ الْمُعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ -

“আমাদিগকে ত্রি সকল লোকের যাবতীয় পথ হইতে রক্ষা কর যাহাদের উপর তোমার ক্রেত্ব নিপতিত হইয়াছে এবং যাহারা তোমার কাছে পৌছিতে পারে নাই এবং পথ ভুলিয়া গিয়াছে” আমীন! হে খোদা, তুমি এইরূপই কর” (১:৭)।

এই আয়াতগুলিতে বুঝান হইয়াছে যে, খোদাতা'লার পুরক্ষার, যাহা অন্য কথায় ফয়েয (আশিসসমূহ) বলিয়া কথিত, তাহাদেরই উপর অবতীর্ণ হয়, যাহারা তাহাদের জীবন খোদার পথে কুরবানী করে এবং তাহাদের সম্পূর্ণ অঙ্গত তাঁহার পথে ওয়াকফ ও উৎসর্গ করিয়া তাঁহার সন্তুষ্টিতে নিমগ্ন হইয়া যায়। এজন্য আবার দোয়াও করিতে থাকে যে, আত্মিক সম্পদ, খোদার নৈকট্য ও মিলন এবং তাঁহার সহিত বাক্যালাপ ও সম্বোধনের মধ্যে যাহা কিছু মানুষ পাইতে পারে, তাহা সবই যেন তাহারা পায়। উপরন্তু এই দোয়ার সঙ্গে তাহাদের সম্যক অভ্যন্তরীণ শক্তি নিয়োজিত করিয়া তাহারা আরাধনা করিতে থাকে এবং গুনাহ হইতে বাঁচে, আল্লাহর দুয়ারে পড়িয়া থাকে, আর অন্যায় হইতে যথাসাধ্য আত্মরক্ষা করে এবং ঐশ্ব-ক্রোধের পথসমূহ হইতে দূরে থাকে। সুতরাং, যেহেতু তাহারা উচ্চ সাহস এবং বিশ্বস্তার সহিত খোদাকে অব্রেষণ করে, সেই জন্য তাহারা তাঁহাকে পায় এবং খোদাতা'লার পবিত্র বল তত্ত্ব-জ্ঞানের সুধা পানে পরিত্থ হয়। এই আয়াতে যে এন্টেকামত (ধৈর্য)-এর কথা বলা হইয়াছে, ইহা এই কথার দিকে ইংগিত দিতেছে যে, প্রকৃত ও পরিপূর্ণ আশিস, যাহা আধ্যাত্মিক জগৎ পর্যন্ত পৌছায়, তাহা পূর্ণ ধৈর্য ও স্তৈর্যের সহিত সংবন্ধ। পূর্ণ ধৈর্য ও স্তৈর্যের দ্বারা এমন সত্যনির্ণয় ও বিশ্বস্ত অবস্থাকে বুঝায়, কোন পরীক্ষা যাহার মধ্যে বিচ্যুতি ঘটাইতে পারে না। অর্থাৎ, সংযোগ যেন এমন প্রকারের দৃঢ় হয়, যাহাকে না তলোয়ার কাটিতে পারে, না কোন আগুন তাহার ক্ষতি সাধন করিতে পারে না অন্য কোন বিপদ অনিষ্ট সাধন করিতে পারে। প্রিয় আত্মীয়গণের মৃত্যু যেন সেই বন্ধন ছিন্ন করিতে না পারে। প্রিয় বন্ধুর বিচ্ছেদও যেন উহার মধ্যে কোন শিথিলতা আনিতে না পারে। অপমানের ভয়ও যেন কোন প্রভাব বিস্তার করিতে না পারে। নিদারণ দুঃখ ও কষ্টে জর্জরিত হইয়া মৃত্যু বরণ করিতেও যেন হৃদয়ে বিন্দুমুক্ত ভীতির সম্পর্ক না হয়। সুতরাং, এই দুয়ার নিতান্ত সংকীর্ণ। এই পথ অতিশয় দুর্গম। ইহা কত ভয়াবহ বিপদ সংকুল! হায়! শত বার হায়!

ইহারই দিকে আল্লাহ জাল্লা শান্ত নির্মে উদ্বৃত আয়াতগুলিতে ইঙ্গিতে করিতেছেন :

قَلْ إِنْ كَانَ أَبَاكُمْ وَأَبْنَاكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ
 وَآزْوَاجَكُمْ وَعَشِيرَاتَكُمْ وَأَمْوَالُ إِقْرَارِ قَمْوُهَا
 وَتِجَارَةُ تَخْشَونَ كَسَادَهَا وَمَسِكَنُ تَرْضَوْنَهَا
 آخَبَتْ إِنِّيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادِ فِي
 سَبِيلِهِ فَتَرَبَصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ
 لَا يَهِدِي الْقَوْمَ الْفَسِيقِينَ - (توبه : ۱۲۳)

অর্থাৎ, “তাহাদিগকে বলঃ যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের পুত্র, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের আত্মীয়-স্বজন, তোমাদের শ্রমলক্ষ্মণ-সম্পত্তি এবং তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, যাহা বন্ধ হওয়াকে তোমরা ভয় কর এবং তোমাদের ঘর-বাড়ী, যাহা তোমরা প্রসন্ন কর, তাহা খোদা হইতে এবং তাঁহার রসূল হইতে এবং খোদার পথে নিজেদের জীবন পণ করিয়া সংগ্রাম করা হইতে অধিকতর প্রিয় হয়, তবে তোমরা ঐ সময় পর্যন্ত অপেক্ষা কর, যে পর্যন্ত না খোদা তাঁহার আদেশ প্রকাশ করেন। আর খোদা দুষ্কৃতকারীদিগকে কখনও তাঁহার পথ প্রদর্শন করেন না” (৯:২৪)।

এই আয়াতগুলি হইতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, খোদার সন্তুষ্টিকে জলাঞ্জলি দিয়া যাহারা তাহাদের আত্মীয়-স্বজন ও ধন-সম্পদকে ভালবাসে তাহারা খোদার দৃষ্টিতে দুষ্কৃতকারী। তাহারা নিশ্চয় ধৰ্মস হইবে। কারণ তাহারা অন্যকে খোদার উপর প্রাধান্য দিয়াছে।

ইহা সেই তৃতীয় পর্যায়, যাহাতে ঐ ব্যক্তি খোদাপ্রাপ্ত হয়, এমনভাবে সংবন্ধ হয় যে, সহস্র সহস্র বিপদ বরণ করিয়া খোদার দিকে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সহিত অগ্রসর হয়। তখন খোদা ব্যতীত তাহার কেহ থাকে না; যেন সকলেই মরিয়া গিয়াছে। সুতরাং সত্য কথা ইহাই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা না মরি, ততক্ষণ পর্যন্ত জীবিত খোদার দর্শন সম্ভব নহে। খোদার প্রকাশের দিন উহাই, যখন আমাদের পার্থিব জীবনের উপর মৃত্যু আসে। আমরা অঙ্গ, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা অপর সকল বস্তুর উপর হইতে আমাদের দষ্টি উঠাইয়া লই। আমরা মৃত, যে পর্যন্ত না আমরা খোদার হাতে মৃত্যু হই। যখন আমাদের মুখ সঠিকভাবে তাহার সম্মুখে সংস্থাপিত হইবে, তখনই প্রকৃত এন্টেকামত বা দৃঢ়তা যাহা সমগ্র বাসনা-কামনার উপর বিজয়ী হয়, আমাদের লাভ হইবে; তৎপূর্বে নহে এবং ইহাই সেই এন্টেকামত, যদ্বারা হীন পার্থিব জীবনের উপর মৃত্যু আসে।

আমাদের এন্টেকামত হইতেছে উহাই যেমন, তিনি বলিয়াছেন :

بَلِّيْ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ۔ - (البقرة: ١١٣)

অর্থাৎ, কুরবানীর পশ্চর ন্যায় আমার সম্মুখে গর্দান রাখ (২:১১)। এই উপায়ে আমরা তখনই এন্টেকামতের পর্যায়ে পৌছিব। যখন আমাদের অস্তিত্বের সাকল্য অংশ এবং আমাদের আত্মার যাবতীয় শক্তি তাঁহারই কাজে নিয়োজিত হইবে। এবং আমাদের মৃত্যু, আমাদের জীবন তাঁহারই জন্য হইয়া যাইবে। যেমন, তিনি বলেন :

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِنِي وَمَمَّا تِلْهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ - (النافع: ٣)

অর্থাৎ, “বল : আমার ন্যায়, আমার কুরবানী, আমার জীবিত থাকা এবং আমার মরিয়া যাওয়া সবই খোদার জন্য” (৬:১৬৩)। যখন খোদার সহিত মানুষের প্রেম এই সীমান্য পৌছিয়া যায়, তখন তাহার জীবন ও মরণ নিজের

জন্য না হইয়া বরং খোদার জন্য হইয়া যায়। তখন সেই খোদা, যিনি সর্বদা প্রেমিকদের সহিত প্রেম করেন, তাঁহার প্রেম তাহার উপর অবতীর্ণ করেন। এই দুই প্রেমের সম্মিলনে মানুষের মধ্যে এক আলোক সৃষ্টি হয়, যাহা দুনিয়া চিনিতে পারে না এবং বুঝিতে পারে না। সহস্র সহস্র পরম সত্যনিষ্ঠ, সিদ্ধীক ও খোদার মনোনীত ব্যক্তি এই কারণেই নিহত হইয়াছেন যে, জগন্মাসী তাঁহাদিগকে চিনে নাই। এই কারণেই তাঁহারা প্রতারক ও স্বার্থপর বলিয়া আখ্যায়িত হইয়াছেন। কারণ পৃথিবীবাসী তাঁহাদের আলোকময় মুখশ্রী দর্শন করিতে পারে নাই। যেমন খোদা'তালা বলেন :

يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبَصِّرُونَ رَالاعْرَافَ (١٩٩)

অর্থাৎ, “অস্বীকারকারীরা তোমার দিকে তাকায় বটে, কিন্তু তাহারা তোমাকে দেখিতে পায় না” (৭:১৯৯)।

বস্তুতঃ, যখন সেই আলোকের সৃষ্টির দিন হইতে এক মর্তবাসী ব্যক্তি স্বর্গবাসী মানুষে পরিণত হইয়া যায় তখন যিনি সর্বসন্তার মালিক, তিনি তাহার অত্তরে কথা বলেন এবং আপন স্বর্গীয় দীপ্তি প্রকাশ করেন। পরিত্র প্রেমভরা সেই হৃদয়কে স্বীয় সিংহাসন বানাইয়া লন। যখন হইতে এই ব্যক্তি আলোকময় পরিবর্তন প্রাপ্ত হইয়া এক নৃতন মানুষে পরিণত হন, তখন হইতে তিনিও তাহার জন্য এক নৃতন খোদা হইয়া যান এবং নৃতন রীতিনীতি ও নৃতন ব্যবহার প্রকাশ করেন। এমন নহে যে, তিনি সত্যই নৃতন খোদা হইয়া যান বা তাঁহার আচরণ নৃতন হয়, বরং উহা খোদার সাধারণ আচরণ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া থাকে, যাহার সহিত পৃথিবীর দর্শন শান্ত পরিচিত নহে। এহেন ব্যক্তির সম্মুখেই আল্লাহত্তা'লা বলিয়াছেন :

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَسْرِئِنَ نَفْسَهُ أَبْتِغَاءَ

مَرَضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ رَالبَقْرَةَ (٣٨)

অর্থাৎ, মানুষের মধ্যে তাহারা উচ্চ পর্যায়ের মানুষ, যাহারা খোদার সন্তুষ্টিতে বিলীন হইয়া যায়। তাহারা নিজেদের প্রাণ বিক্রয় করিয়া খোদার সন্তুষ্টি ক্রয় করে। ইহারাই সেই সকল লোক যাহাদের উপর খোদার রহমত (২:২০৮)। এইভাবে যে ব্যক্তি আধ্যাত্মিক অবস্থার মর্যাদায় পৌছিয়া যায় সে খোদার পথে বিলীন হইয়া যায়।

খোদাতা'লা এই আয়াতে বলেন যে, সেই ব্যক্তিই যাবতীয় দুঃখ হইতে মুক্তি পায়, যে আমার পথে, আমার সন্তুষ্টির পথে প্রাণ বিক্রয় করে এবং প্রাণপণে এই অবস্থারাই প্রমাণ দেয় যে, সে খোদার। এবং সে তাহার সমগ্র অস্তিত্বকে এমন জিনিস বলিয়া জানে, যাহা স্রষ্টার আনুগত্য ও সৃষ্টির সেবার জন্যই তৈয়ার করা হইয়াছে। তারপর, প্রত্যেক প্রকার শক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত সত্যিকার সৎকর্মসমূহ এবং উৎসাহ, আগ্রহ ও মনোযোগ সহকারে সম্পাদন করে যে, সে যেন আপন আনুগত্যের দর্পণে তাহার প্রকৃত প্রেমাস্পদকে দর্শন করিতে থাকে।

তিন প্রকারের জ্ঞান :

এই আয়াতগুলিতে আল্লাহত্তা'লা পরিষ্কারভাবে বলিয়াছেন যে, ইহলোকেই দুষ্ক্রিয়পরায়ণ লোকগণের জন্য নারকীয় জীবন গোপনভাবে থাকে। চিন্তা করিলে তাহারা তাহাদের দোষখ ইহলোকেই দেখিতে পাইবে। এখানে আল্লাহত্তা'লা জ্ঞানকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন। যথা, ইলমুল একীন (যৌক্তিক জ্ঞান), আইনুল একীন (প্রত্যক্ষ জ্ঞান) এবং হাকুল একীন (অভিজ্ঞতালক্ষ নিশ্চিত জ্ঞান)। সর্বসাধারণের বুঝিবার জন্য এই তিন প্রকার জ্ঞানের দ্রষ্টান্ত এইরূপ : যদি কোন ব্যক্তি দূর হইতে কোথাও কোন ধোঁয়া দেখে তখন ধোঁয়া হইতে তাহার ধারণা অগ্নির দিকে চলিয়া যায় এবং এই ভাবিয়া সে সেখানে অগ্নির অস্তিত্ব নির্ধারণ করে যে, অগ্নি ও ধোঁয়ার মধ্যে অচেদ্য ও উত্প্রোত সম্পর্ক বিদ্যমান। যেখানে ধোঁয়া থাকিবে সেখানে অবশ্যই অগ্নি ও থাকিবে। এই জ্ঞানের নামই ইলমুল একীন বা যৌক্তিক জ্ঞান। তারপর অগ্নিশিখা দর্শনে যে জ্ঞান হয়, তাহার নাম আইনুল একীন বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং ঐ অগ্নিতে নিজে প্রবেশ করিলে যে জ্ঞান হয়, উহার নাম হাকুল একীন বা অভিজ্ঞতা লক্ষ নিশ্চিত জ্ঞান। এখন আল্লাহত্তা'লা বলেন, জাহান্নামের যুক্তিমূলক একীন ইহলোকেই সম্ববপর। বরযখলোকে আইনুল একীন লাভ হইবে এবং হাশরে (পুনরুত্থান লোকে) ঐ জ্ঞান হাকুল একীনের পূর্ণ পর্যায়ে পৌঁছিবে।

তিন জগৎ :

এখানে জানা প্রয়োজন যে, কুরআন করীমের শিক্ষার দিক দিয়া তিন জগৎ সাব্যস্ত হয় :

প্রথম জগৎ (ইহলোক)। ইহার নাম আলমে কাসাব (উপার্জনের জগৎ) এবং নাশায়াতে উলা (প্রথম সৃষ্টি)। এই জগতেই মানুষ পুণ্য বা পাপ করে। যদিও আলমে বা'স বা পুনরুত্থানের জগতে পুণ্যের উন্নতি আছে, কিন্তু তাহা শুধু খোদার অনুগ্রহে, মানুষের উপার্জনের তাহাতে কোন দখল নাই।

(২) দ্বিতীয় জগতের নাম বরযখ। মূলতঃ **بَنْخ** (বরযখ) আরবী ভাষায় দুই জিনিসের অন্তর্বর্তী বস্তুর জন্য ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে যেহেতু এই যামানা পুনরুত্থান জগৎ ও ইহজগতের মধ্যে অবস্থিত সেহেতু ইহার নাম বরযখ। কিন্তু শব্দটি আদিকাল হইতেই এবং দুনিয়ার সৃষ্টি অবধি মধ্যবর্তী জগতের জন্য ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে। এই কারণে এই শব্দে অন্তর্বর্তী জগতের অস্তিত্বের এক আজিমুশ্শান সাক্ষ্য নিহিত আছে। আমরা মিনানুর রহমান **مِنْ الرَّحْمَنِ** পুস্তকে প্রমাণ করিয়াছি যে, আরবী শব্দগুলি খোদার মুখ নিঃসৃত শব্দ। পৃথিবীতে শুধু ইহাই একমাত্র ভাষা, যাহা পরিত্র খোদার ভাষা এবং প্রাচীন ও যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল উৎস। ইহা সব ভাষার জননী। ইহা খোদার ওহীর প্রথম ও

তাহার ইচ্ছা খোদাতা'লার ইচ্ছার রঙে রঞ্জিন হইয়া যায়। তাহার যাবতীয় তৃষ্ণি তাঁহার আদেশ পালনেই স্থিতিশীল হইয়া যায়। তাহার সকল সৎকর্ম কষ্টসাধ্য পথে না হইয়া, মনের সাধা ও বিমল আনন্দের আকর্ষণে সাধিত হয়। ইহাই সেই নগদ বেহেশ্ত, যাহা রূহানী মানুষ প্রাপ্ত হয়। ভবিষ্যতে সে যে বেহেশ্ত পাইবে, প্রকৃতপক্ষে উহা ইহারই প্রতিচ্ছায়া ও স্মারক হইবে। উহাকে পরলোকে খোদাতা'লার কুদরত সাকারে দৃশ্যমান করিয়া দিবেন। ইহারই প্রতি সংকেত করিয়া আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু বলেন :

وَلِمَنْ خَاتَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتِنَ - (الرَّحْمَن: ٣٧)

وَسَقَهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا - (الدَّهْر: ١٢)

إِنَّ الْأَبْرَارَ يُشَرَّبُونَ مِنْ كَامِسٍ كَانَ مِرَاجِهَا كَافُورًا هَبَّى

يَشْوِبُ بِمَا عَبَادُوا شَوِّيْفَجَرُونَهَا تَفْجِيرًا - (الدَّهْر: ٢٠)

وَيُسْقَوْنَ فِيمَا كَاسَّا كَانَ مِرَاجِهَا زَنجِيلًا - (الدَّهْر: ١٨)

عَيْنَا فِيهَا تَسْهِيْلًا سَلْسِيْلًا - (الدَّهْر: ١٩)

إِنَّا آغْتَذْنَا بِلُكْفِرِينَ سَلِسِلَا وَآغْلَلَّا وَ

سَعِيرًا - (الدَّهْر: ٥) وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ

أَعْنَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْنَى وَأَقْلَلَ سِيْلًا - (بَنْيُ سَلَيْل: ٣)

অর্থাৎ, “যে ব্যক্তি খোদাতা'লাকে ভয় করে এবং তাঁহার মহাপ্রতাপাদ্ধিত গৌরবময় মর্যাদার ভয়ে সন্তুষ্ট, তাহার জন্য দুইটি বেহেশ্ত আছে” এক, এই দুনিয়ায় এবং দ্বিতীয়, আখেরাতে (৫৫:৪৭)। যাহারা খোদায় নিমগ্ন হইয়াছে খোদা তাহাদিগকে সেই শরবত পান করাইয়াছেন, যাহা তাহাদের হৃদয়, চিন্তাধারা এবং সংকল্পসমূহকে পবিত্র করিয়া দিয়াছে (৭৬:২২)। সাধু ব্যক্তিগণ ঐ শরবত পান করিতেছে; উহা কর্পূর মিশ্রিত। তাহারা যে প্রস্তবণ হইতে পান করে, উহা তাহারা নিজেরাই খনন করে” (৭৬:৬-৭)।

কর্পূর ও আদা মিশ্রিত শরবতের তত্ত্বকথা

ইতিপূর্বে আমি বলিয়াছি যে, অত্র আয়াতে ২৭৮ কর্পূর শব্দ এই জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে যে, আরবী ভাষায় **كَرْبَلَة** (কাফারা) শব্দ দমন করা এবং ঢাকিয়া দেওয়াকে বুঝায়। সুতরাং, ইহা এ কথার দিকে ইঙ্গিত করিতেছে যে, তাহারা এমন আন্তরিকতাসহ সংসারের মায়া কাটাইয়া আল্লাহত্তা'লার দিকে রঞ্জু হইয়াছে যে, তাহাদের দুনিয়ার প্রতি আসক্তি একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। ইহা প্রকৃতির নিয়ম যে, সব আবেগ ও উত্তেজনা অস্তরের খেয়াল হইতেই উৎপন্ন হয়। যখন মন এইসব অযোগ্য চিন্তাধারা হইতে অনেক দূরে সরিয়া পড়ে এবং উহাদের সহিত উহার কোনও সম্পর্ক থাকে না, তখন ঐ সব উত্তেজনাও ক্রমশঃ প্রশমিত হইতে থাকে এবং অবশেষে, সম্পূর্ণরূপে অস্তর্হিত হইয়া যায়। সুতরাং এখনে খোদাতা'লার উদ্দেশ্য ইহাই। তিনি এই আয়াতে ইহাই বুঝাইতেছেন যে, তাঁহার দিকে যাহারা সম্পূর্ণরূপে প্রণত হইয়াছে, তাহারা নীচ প্রবৃত্তির উত্তেজনা হইতে অনেক দূরে প্রস্থান করিয়াছে এবং খোদার দিকে এমনভাবে ঝুঁকিয়াছে, যেন পার্থিব বিষয়ে উৎসাহ ও উদ্দীপনা তাহাদের চিন্ত হইতে অনেক দূরে প্রস্থান করিয়াছে এবং তাহাদের প্রবৃত্তির আসক্তিসমূহ এমনভাবে দমিত হইয়াছে, যেমন কর্পূর বিষাক্ত পদাৰ্থসমূহের বিষকে দমন করে।

তারপর বলিয়াছেন যে, ঐ ব্যক্তিগণ এই কর্পূর মিশ্রিত পাত্র হইতে পান করার পর তাহারা **جَبِيل** (আদা) মিশ্রিত পাত্র হইতে পান করে (৭৬:১৮-১৯)। এখন জানা আবশ্যিক, আরবী শব্দ যাঙ্গাবিল, দুইটি শব্দ যোগে গঠিত। অর্থাৎ, ‘যানা’ **جَنَّة** ও জবল **جَبَل** শব্দদ্বয় দ্বারা গঠিত। আরবী ভাষায় ‘যানা’ শব্দ দ্বারা উপরে উঠা বুঝায় এবং ‘জবল’ পর্বতকে বলে। সম্মিলিত অর্থ পর্বতের উপরে উঠা। এখন জানা কর্তব্য, কোন বিষাক্ত ব্যাধির নিরাময়ের পর সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ পর্যন্ত মানুষকে দুইটি অবস্থা অতিক্রম করিতে হয়। একটি অবস্থা, যখন প্রদাহের প্রচণ্ডতা প্রায় সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয় এবং রোগের মারাত্মক উগ্রতা নিবারিত হইয়া রোগী আরোগ্যমুখী হয় এবং সাংঘাতিক উপসর্গ সম্বলিত আক্রমণ কল্যাণ ও নিরাপত্তার সহিত কাটিয়া যায় এবং যে মারাত্মক ঘটিকা উঠিয়াছিল, উহা প্রশমিত হইয়া যায়, কিন্তু এখনও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে দুর্বলতা বর্তমান থাকে, রুগ্ণী জোরের কোন কাজ করিতে পারে না এবং চলিতে গেলে দুর্বলতায় মৃতের ন্যায় ঢলিয়া পড়িয়া যাইতে চাহে। দ্বিতীয় অবস্থা, যখন স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসে। দেহে সম্পূর্ণ বল সঞ্চার হয় এবং শক্তি ফিরিয়া পাওয়ায় বিনা কষ্টে পর্বত আরোহণের সাহস জন্মে। প্রফুল্লচিত্তে উচ্চ শৃঙ্গের উপর দিয়া দৌড়াইতে থাকে। অর্থাৎ আধ্যাত্মিক যাত্রা পথের তৃতীয় পর্যায়ে এই অবস্থা লাভ হয়। এইরূপ অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহত্তা'লা উপরোক্তিতে আয়াতে ইংগিত করেন যে, শেষ পর্যায়ে খোদা-প্রাপ্ত মানুষ যাঙ্গাবিল বা আদা মিশ্রিত পাত্র হইতে পান করে। অর্থাৎ, আধ্যাত্মিকতার পূর্ণ শক্তি লাভ করিয়া বড় বড় শৃঙ্গারোহণ করে। অনেক দুঃসাধ্য কার্য তাহাদের হস্তে সুসম্পন্ন হয়। খোদার পথে তাহারা আস্থাদানের অনেক বিস্ময়কর নির্দশন প্রদর্শন করে।

যাঞ্জাবিলের ক্রিয়া

এস্টলে বলা প্রয়োজন, চিকিৎসা বিজ্ঞানের দিক হইতে যাঞ্জাবিল একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। হিন্দীতে ইহাকে শুঁষ্ঠ বলে। ইহা অত্যন্ত জৈব-তাপ বর্ধক এবং ভেদ রোধক। ইহার নাম যাঞ্জাবিল রাখার ইহাই কারণ। অন্য কথায়, ইহা দুর্বলকে এমন শক্তিশালী করে এবং এরূপ সতেজ করিয়া তোলে যে, সে পর্বত আরোহণে সক্ষম হয়। আলোচ্য আয়াতগুলি পেশের মাধ্যমে, যাহার একটিতে কর্পুর এবং অন্যটিতে শুঁষ্ঠ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, খোদাতা'লা বান্দাগণকে ইহাই বুৰাইতে চাহিয়াছেন যে, মানুষ নীচ প্রবৃত্তি হইতে পুণ্যের দিকে পদক্ষেপ করিলে, প্রথমে এই ক্রিয়ার ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, উহাতে বিষাক্ত পদার্থের দমন হয় এবং নীচ প্রবৃত্তির উভেজনা হ্রাস পাইতে থাকে, যেমন কর্পুর বিষাক্ত দোষ দমন করে। এই কারণেই ইহা বিসৃষ্টিকা ও মেয়াদী জুরে উপকার করে। তারপর যখন বিষাক্ত পদার্থের তীব্রতা সম্পূর্ণরূপে হ্রাস পাইতে থাকে এবং দুর্বলতা সম্পৃক্ত এক প্রকার কমজোর স্বাস্থ্য লাভ হয়, তখন দ্বিতীয় অবস্থায় সেই দুর্বল রোগী শুঁষ্ঠ মিশ্রিত সুধা পানে শক্তিশালী হইয়া উঠে। যাঞ্জাবিলের শরবত হইতেছে খোদাতা'লার সৌন্দর্যের জ্যোতির্বিকাশ, যাহা আত্মার খোরাক। এই জ্যোতির্বিকাশ দ্বারা মানুষ শক্তিশালী হইয়া উঠিলে, উচ্চ শিখরে আরোহণের যোগ্যতা লাভ করে। তখন খোদাতা'লার পথে এমন আশ্চর্য দুর্লভ কাজ সম্পাদন করে, তঙ্গ প্রেমানুরাগ হৃদয়ে না থাকিলে যাহা কখনও কাহারও পক্ষে প্রদর্শন করা সম্ভব নহে। সুতরাং, খোদাতা'লা এই দুইটি অবস্থা বুৰাইবার জন্য আরবী ভাষার দুইটি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। একটি হইল কর্পুর, যদ্বারা নিম্নে দাবাইয়া রাখা বুৰায় এবং অন্যটি হইল যাঞ্জাবিল, যদ্বারা উধৰে আরোহণকারীকে বুৰায়। এই পথে এই দুইটি অবস্থাই 'সালেক' বা আধ্যাত্মিক পথচারীদের জন্য নির্ধারিত আছে।

আয়াতের অবশিষ্টাংশ এই :

إِنَّ آفَتَنَّا بِلِكْفِرِينَ سَلِلَا وَأَغْلَلَوْ

سَعِيرًا - (الدهر: ৫)

অর্থাৎ, “আমরা অবিশ্বাসীদের জন্য, যাহারা সত্য প্রহণে অনিচ্ছুক, শিকল তৈরী করিয়াছি এবং গলার হাড়কাঠ ও এক জুলন্ত অগ্নির দহন” (৭৬:৫)। এই আয়াতের অর্থঃ যাহারা সত্যিকার আন্তরিকতাসহ খোদাতা'লাকে অব্রেষণ করে না, তাহাদের প্রতি খোদার দিক হইতে অভিসম্পাত হইতে থাকে। তাহারা সংসারের বাঁধনে এমনইভাবে জড়িত হইয়া যায়, যেন তাহাদের পা শিকলাবন্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহারা পার্থিব কাজে এতই অধিমুখী হয়, যেন তাহাদের গলায় হাড়কাঠ পড়িয়া গিয়াছে, যাহা তাহাদিগকে আকাশের দিকে মাথা তুলিতে দেয় না। তাহাদের হৃদয়ে লোভ লিঙ্গার আগুন জুলিতে থাকে, যেন তাহাদের ইল্লিত অর্থ, ইল্লিত সম্পত্তি ও ইল্লিত দেশ হস্তগত হইয়া যায়, তাহাদের শক্র উপর যেন তাহারা জয়লাভ করিতে পারে এবং তাহারা যেন প্রভৃত অর্থ ও সম্পদের

অধিকারী হয়। সুতরাং যেহেতু খোদাতা'লা দেখিতে পান যে, তাহারা অযোগ্য এবং কুক্রিয়াসক্ত, সেই জন্য তিনি এই তিনি বিপদেই তাহাদিগকে আবন্ধ করিয়া দেন। এখানে আরও ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, যখন মানুষের দিক হইতে কোন কার্য প্রকাশিত হয়, তখন খোদাও তাহার দিক হইতে অনুরূপ এক ক্রিয়া প্রকাশ করেন। যেমন মানুষ যখন তাহার প্রকোষ্ঠের সব দরজা বন্ধ করিয়া দেয়, তখন মানুষের এই কার্যের পর খোদাতা'লার দিক হইতে এই ক্রিয়া হইবে যে, তিনি সেই প্রকোষ্ঠে অঙ্ককার সৃষ্টি করিবেন। কারণ, খোদাতা'লার প্রাকৃতিক নিয়মে আমাদের কার্যের অনিবার্য ফলস্বরূপ যাহা যাহা নির্ধারিত হইয়াছে, ঐ সবই খোদাতা'লার ক্রিয়া। কেননা, তিনিই সব কারণের আদি কারণ। অনুরূপভাবে যদি কেহ বিষ পান করে, তবে তাহার এই কার্যের পর খোদাতা'লার যে ক্রিয়া প্রকাশ পাইবে, তাহা হইল, তাহার মৃত্যু ঘটিবে। তেমনই যদি কেহ এমন অনুচিত কর্ম করে, যাহা কোন সংক্রামক ব্যাধির কারণ হয়, তবে তাহার এই কর্মের পর খোদাতা'লার যে ক্রিয়া প্রকাশিত হইবে উহা এই যে, সেই সংক্রামক ব্যাধি তাহাকে আক্রমণ করিবে। সুতরাং আমাদের পার্থিব জীবনে যেমন স্পষ্ট দেখা যায় যে, আমাদের প্রত্যেক কার্যের এক অনিবার্য ফল আছে এবং সেই ফল খোদাতা'লার ক্রিয়া, তেমনই ধর্ম সম্পর্কেও ইহাই বিধান। খোদাতা'লা নিম্ন বর্ণিত দুইটি উদাহরণ দ্বারা পরিষ্কার বলেন :

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَّهُمْ سُبْلَنَا - (العنكبوت: ٢٠)

فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ - (الصف: ٧)

অর্থাৎ, “যাহারা এই কর্ম করে যে, তাহারা খোদাতা'লার অব্বেষণে পুরাপুরি চেষ্টা করে, এই কর্মের জন্য আমাদের এই ক্রিয়া অনিবার্য যে, আমরা তাহাদিগকে আমাদের পথ প্রদর্শন করিব (২৯:৭০) এবং যাহারা কুটিলতা অবলম্বন করে এবং সোজা পথে চলিতে চাহে না, তদবস্থায় আমাদের ক্রিয়া তাহাদের বেলা এই হইবে যে, আমরা তাহাদের হৃদয়কে বক্র করিয়া দিব (৬১:৬)।” তারপর, এই অবস্থাকেই আরও অধিক স্পষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে তিনি বলেন :

مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَغْنِى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَغْنَى

وَأَضَلَّ سَبِيلًا - رَبَّنِي إِسْرَائِيل : ٧٣

অর্থাৎ, “যে ব্যক্তি ইহ জগতে অঙ্ক রহিয়াছে, সে পরলোকেও অঙ্কই রহিবে; বরং অঙ্ক হইতেও মন্দ হইবে” (১৭:৭৩)। ইহা এ কথার প্রতি ইঙ্গিত যে, পুণ্যবান বান্দাগণ খোদার দীদার (দর্শন) ইহলোকেই পাইয়া থাকেন। তাহারা এই জগতেই সেই প্রিয়ের দর্শন লাভ করেন, যাহার জন্য তাহারা সর্বস্ব বিসর্জন দেন। বস্তুতঃ, এই আয়াতের ভাবার্থ ইহাই যে, বেহেশ্তী জীবনের ভিত্তি এই

জগতেই স্থাপিত হয় এবং জাহানামের অন্ধত্বের মূলও এই জগতেরই পচা ও অন্ধ জীবন।” তারপর বলেন :

وَبَشِّرُوا الَّذِينَ أَمْنَأُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ

جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ۔ (الْقَرْآن: ১৪)

অর্থাৎ, “যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, তাহারা ঐ সব বাগানের উত্তরাধিকারী, যেগুলির তলদেশ দিয়া নদ-নদীসমূহ প্রবাহিত” (১৪:২৬)। এই আয়াতে খোদাতা’লা ঈমানকে বাগানের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন, যাহার তলদেশ দিয়া নদ-নদীসমূহ বহিয়া যায়।

সুতরাং, ইহা স্পষ্ট যে, এখানে এক উচ্চ পর্যায়ের দার্শনিক তত্ত্বের রঙে বলা হইয়াছে যে, বাগানের সঙ্গে নদ-নদীর যে সম্পর্ক সেই সম্পর্কই সৎকর্মের সহিত ঈমানের। কোন বাগান যেমন পানি ছাড়া সবুজ থাকিতে পারে না, তেমনই কোন ঈমান সৎকর্ম ছাড়া জীবিত ঈমান বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না। যদি ঈমান থাকে এবং সৎকর্ম না থাকে, তবে সেই ঈমান তুচ্ছ। যদি সৎকর্ম থাকে এবং ঈমান না থাকে, তবে উহা কেবল লোক দেখানো কর্ম। ইসলামী বেহেশ্তের ইহাই হকিকত বা মূল তত্ত্ব। উহা ইহজগতের ঈমান ও সৎকর্মের প্রতিচ্ছায়া। উহা কোন নতুন জিনিস হইবে না, যাহা বাহির হইতে আসিয়া মানুষের নিকট উপস্থিত হইবে। বরং মানুষের বেহেশ্ত মানুষের অভ্যন্তর হইতে বহিগত হইয়া থাকে। প্রত্যেকের বেহেশ্ত তাহার ঈমান এবং আমলে সালেহ (সময়োপযোগী সৎকর্ম)। এই জগতেই এগুলির উপভোগ শুরু হইয়া যায় এবং গুণ্ঠভাবে ঈমান ও সৎকর্মের বাগান দৃষ্টিগোচর হয়। এবং নহরসমূহও পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু পরজগতে এইসব বাগান সুস্পষ্টরূপে অনুভূত হইবে। খোদার পবিত্র শিক্ষা আমাদিগকে ইহাই জানায় যে, সত্য-পবিত্র-সুদৃঢ় এবং পরিণত ঈমান, যাহা খোদা এবং তাহার গুণাবলী ও তাহার ইচ্ছার সহিত সঙ্গতিপূর্ণ, তাহা সুরম্য ফলদার বৃক্ষরাজিপূর্ণ বেহেশ্ত, এবং আমলে সালেহ সেই বেহেশ্তের নদ-নদী। যেমন, তিনি বলেন :

صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةً طَيِّبَةً أَضْلَهَا

ثَابِتٌ وَكَرِيمًا فِي السَّمَاءِ تُؤْتَى أَكْلَهَا

كُلَّ حَيْنٍ - رابِّهِيم: ১৫-১৬

অর্থাৎ, “উহাই ঈমানের বাক্য, যাহা সর্বপ্রকার বাড়াবাড়ি ও কমবেশী এবং বিভ্রম বিচ্ছুতি এবং মিথ্যা ও হাসি-ঠাট্টা হইতে পবিত্র এবং সবদিক দিয়া যাহা পূর্ণ। উহা ঐ বৃক্ষের সহিত তুল্য, যাহা সব কলঙ্ক কালিমা হইতে পবিত্র, যাহার শিকড় ভূমির অভ্যন্তরে সংস্থাপিত এবং শাখা-প্রশাখা আকাশে বিস্তারিত। উহা সর্বদাই ফল দেয় এবং উহার উপর এমন কোন সময় আসে না, যখন উহার

শাখায় ফল না থাকে” (১৪:২৫-২৬)। এই বিবৃতিতে খোদাতা’লা ঈমানের বাক্যকে সদা ফলপ্রসূ বৃক্ষের সহিত তুলনা দ্বারা উহার তিনটি লক্ষণ বর্ণনা করিয়াছেনঃ

১। প্রথম লক্ষণ, উহার শিকড় দ্বারা ইহাই বুঝায় যে, উহার প্রকৃত মর্ম মানুষের হৃদয়-ভূমিতে বন্ধমূল হউক। অর্থাৎ, মানুষের প্রকৃতি এবং মানুষের বিবেক যেন উহার সত্যতা ও মৌলিকত্ব গ্রহণ করিয়া লয়।

২। দ্বিতীয় লক্ষণ এই যে, এই বাক্যের শাখা-প্রশাখা আকাশে বিস্তৃত হউক। অর্থাৎ, যৌক্তিকতা যেন উহার সঙ্গে থাকে এবং আকাশের প্রাকৃতিক বিধান, যাহা খোদার কার্য, যেন এই ক্রিয়াকে অনুমোদন করে। অর্থাৎ, ইহার সত্যতা ও বিশুদ্ধতার যুক্তি যেন প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা প্রমাণিত হয়। তদুপরি, এই সকল যুক্তি যেন এমন উচ্চাপের হয় যে, উহাদের অবস্থান মনে হয় যেন আকাশে, যেখানে আপত্তির হাত পৌঁছিতে পারে না।

৩। তৃতীয় লক্ষণ, উহার ভোজ্য ফল চিরস্থায়ী হইবে, কখনও শেষ হইবে না। অর্থাৎ, ধারাবাহিক সাধনার ফলে উহার আশিস ও প্রভাব সর্বদা সব যুগে প্রত্যক্ষভাবে অনুভূত হইতে থাকিবে। এমন নহে যে, কোন যুগ বিশেষে প্রকাশিত হইয়া পরে বন্ধ হইয়া যাইবে। আরও বলেনঃ

مَثْلُ كَلِمَةٍ حَيْثَةٍ كَشَجَرَةٍ حَيْثَةٍ وَاجْتَنَّتْ

مِنْ قَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ - (ابراهيم: ১৮)

অর্থাৎ, “অপবিত্র বাক্য ঐ বৃক্ষের অনুরূপ, যাহা ভূমি হইতে উৎপাটিত হইয়াছে। অর্থাৎ, মানব প্রকৃতি উহা গ্রহণ করে না এবং কোন প্রকারেই উহা স্থায়ী হয় না। যুক্তি-প্রমাণের দিক হইতেও নহে, প্রাকৃতিক বিধানের দিক হইতেও নহে এবং বিবেকের দিক হইতেও নহে” (১৪:২৭)। উহা শুধু কেস্সা-কাহিনীর আকারে রহিয়া যায়। তারপর পরলোকে ঈমানের পবিত্র বৃক্ষসমূহকে কুরআন শরীফ আঙ্গুর, আনার এবং ভাল ফলের সহিত তুলনা দিয়া বলিয়াছে যে, তখন উহা ঐ সকল ফলের আকারে দৃশ্যমান হইবে। তেমনই, বেঙ্গমানীর মন্দ বৃক্ষের নাম পরলোকে ‘যাকুম’ রাখা হইয়াছে। আল্লাহতা’লা বলেনঃ

أَذِلَّكَ حَيْرٌ تُرْزَعًا أَمْ شَجَرَةُ الرَّقْوْمِ إِنَّ

جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُبُ

فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ - (صفت: ৭৫-৭৩)

طَعْنَاهَا كَانَةُ رَءُوسُ الشَّيْطَانِ - (صفت: ৭৩)

إِنَّ شَجَرَتَ الرَّقْوُدِ طَعَامُ الْأَشْيَعِ كَالْمُقْلِ

يَغْلِي فِي الْبُطُونِ كَفْلُ الْحَمِيمِ - (الْدَّخَانُ: ٤٧-٤٨)

ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ - (الْدَّخَانُ: ٥٠)

অর্থাৎ, “তোমরা বল : বেহেশ্তের উদ্যান ভাল, না যাকুম বৃক্ষ, যাহা যালেমদের জন্য বিপদস্বরূপ ? উহা এক বৃক্ষ, যাহা জাহানামের মূল হইতে উৎপন্ন হয়” (৩৭:৬৩-৬৬)। অর্থাৎ, অহঙ্কার ও আত্মশংগা হইতে সৃষ্টি হয়। ইহার কলি ও ফুল যেন শয়তানের মাথা। শয়তানের অর্থ, যাহার ধৰ্মস অনিবার্য। ইহা ‘শায়খ’ ধাতু হইতে উদ্ভৃত। সুতরাং, সার কথা এই যে, ইহা খাওয়ার অর্থ ধৰ্মস হওয়া। তারপর বলিয়াছেন, যাকুম বৃক্ষ দোষখবাসীদের খাদ্য, যাহারা জানিয়া শুনিয়া পাপ করে। সেই খাদ্য গলিত তাম্রের, যাহা ফুট্ট পানির ন্যায় পেটের ভিতরে টগ্বগ্ করিয়া ফুটিতে থাকিবে” (৪৪:৪৫-৫০)। তারপর, দোষখবাসীকে সংশোধন করিয়া বলেন : “এই বৃক্ষের স্বাদ গ্রহণ কর, তুমি তো সম্মানিত, মহান ব্যক্তি” (৪৪:৪৪-৪৭)! বাক্যটি অত্যন্ত ক্রোধব্যাঞ্জক। ইহার তাৎপর্য, তুমি অহঙ্কার না করিলে এবং তোমার বড় হওয়ার এবং সম্মানিত হওয়ার সুযোগ নিয়া সত্য হইতে মুখ না ফিরাইলে, আজ তোমাকে এই সব তিক্ততা ভোগ করিতে হইত না। এই আয়াত একথার দিকে ইঙ্গিত করিতেছে যে, প্রকৃতপক্ষে যাকুম শব্দ রূপ শব্দ রূপ আম শব্দ সংযোগে গঠিত। আম শব্দ ইন্নাকা আন্তালআয়ীযুল করীম, আয়াতের সংক্ষিপ্ত সার। ইহাতে একটি অক্ষর প্রথম এবং আর একটি অক্ষর শেষ হইতে লওয়া হইয়াছে। বহু ব্যবহারের ফলে **ذال** (যাল) **ز** (যা)-তে ঝুপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। এখন সার কথা, আল্লাহত্তা’লা এই জগতের ঈমানের বাক্যকে যেমন বেহেশ্তের সহিত তুলনা করিয়াছেন, তেমনই এই জগতেরই বেঙ্গমানী ও অবিশ্বাস সংক্রান্ত বাক্যসমূহকে যাকুমের সহিত তুলনা করিয়াছেন এবং উহাকে দোষখের গাছ বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন এবং জানাইয়াছেন যে, ইহলোক হইতেই বেহেশ্ত ও দোষখের সূত্রপাত হয় যেমন, দোষখ সম্বন্ধে অন্যত্র বলেন :

تَارِاللَّهِ الْمُوْقَدْرَةُ الَّتِي تَطْلِعُ عَلَى الْأَفْدَرَةِ - (الْمُمْزَدَّ: ৮-৭)

অর্থাৎ, “দোষখ খোদার ক্রোধাগ্নি হইতে উৎপন্ন হয় এবং গুনাহ দ্বারা প্রজ্বলিত হয়। ইহা প্রথমে হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে” (১০৪:৭-৮)। ইহাতে ইঙ্গিত, এই অগ্নির মূল ঐ সব চিন্তা, শোক, দাহ ও দুঃখ, যাহা হৃদয়কে ধূত করে।

কারণ, যাবতীয় আত্মিক শাস্তি, ঋহানী আয়াব প্রথমে হৃদয় হইতেই শুরু হয়, পরে সমগ্র দেহে ছাইয়া যায়। আরও এক স্থানে বলিয়াছেন :

وَقُوْدَهَا التَّأْسُ وَالْجَازِهُ - رَبِّ الْبَرَّةِ (١٥)

অর্থাৎ, “নরকাগ্নির ইঙ্গন, যদ্বারা সেই অগ্নি সর্বদা জুলিতে থাকে, তাহা হইতেছে দুইটি পদার্থ। এক, ঐ সব মানুষ, যাহারা প্রকৃত খোদাকে পরিত্যাগ করিয়া অপরাপর বস্তুর অর্চনা করে, কিংবা যাহাদের ইচ্ছামূলে ঐ সবের পূজা করা হয়” (২৪২৫)। যেমন বলিয়াছেন :

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ حَصَبٌ جَهَنَّمُ (الْأَنْبِيَاءُ، ٩٩)

অর্থাৎ, “তোমরা এবং মানুষ হইয়াও খোদা বলিয়া অভিহিত তোমাদের মিথ্যা মাবুদগণ নরকে নিষ্কিঞ্চ হইবে” (২১:৯৯)। নরকের দ্বিতীয় ইঙ্গন প্রতিমা। ইহার তাৎপর্য এই যে, এইগুলির অস্তিত্ব না থাকিলে নরকও থাকিত না। সুতরাং এই আয়াত হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে, খোদাতালার পবিত্র কালামে বেহেশ্ত ও দোষখ এই ভৌতিক জগতের ন্যায় নহে। বরং উভয়েরই উৎপত্তিস্থল ঋহানী বিষয়সমূহ। অবশ্য, ঐ সমুদয় জিনিষ পরলোকেও ভৌতিক আকৃতিতে দেখা যাইবে, কিন্তু উহা এই ভৌতিক জগৎ হইতে হইবে না।

আল্লাহতা'লার সহিত নিবিড় ঋহানী সম্বন্ধ স্থাপনের উপায়

এখন আমরা আবার মূল উদ্দেশের দিকে প্রত্যাবর্তন করিতেছি। খোদার সহিত আত্মিক ও নিবিড় সম্পর্ক জন্মাইবার যে উপায় কুরআন শরীফ আমাদিগকে শিক্ষা দেয়, তাহা ইসলাম ও সূরা ফাতেহার দোয়া। অর্থাৎ, প্রথমে স্বীয় জীবন সাকল্যভাবে খোদার পথে উৎসর্গ করা। তারপর সেই প্রার্থনায় নিমগ্ন হইয়া যাওয়া, যাহা সূরা ফাতেহায় মুসলমানগণকে শিখান হইয়াছে। সমগ্র ইসলামের সারসম্মত দুইটি জিনিষ : ইসলাম ও সূরা ফাতেহা। পৃথিবীতে খোদা পর্যন্ত পৌছা এবং প্রকৃত মুক্তির পানি পান করার ইহাই একমাত্র উত্তম উপায়। বরং ইহাই একমাত্র উপায়, যাহা মানুষের সর্বোচ্চ উন্নতি ও ওসলে ইলাহী বা ঐশ্বী-মিলনের জন্য প্রাকৃতিক বিধান নির্ধারিত করিয়াছে। তাহারাই খোদাকে পায়, যাহারা সত্যিকার অর্থে ইসলামের আধ্যাত্মিক অগ্নিতে প্রবেশ করে এবং সূরা ফাতেহায় নিমগ্ন থাকে। ইসলাম কী জিনিষ? সেই জুলন্ত অগ্নি, যাহা আমাদের হীন ও তুচ্ছ জীবনকে ভস্ত্বীভূত করিয়া এবং আমাদের মিথ্যা উপাস্য বস্তুগুলিকে দন্ধ করিয়া সত্য ও পবিত্র আরাধ্য মাবুদের সম্মুখে আমাদের প্রাণ, আমাদের ধন-সম্পদ ও আমাদের সন্ত্রমের কুরবানী উপস্থিত করে। এহেন উৎসে প্রবেশের

ফলে আমরা এক নৃতন জীবনের পানি পান করি এবং আমাদের সমগ্র ঝুহানী শক্তি খোদার সহিত এমনভাবে সম্পর্কযুক্ত হইয়া যায়, যেমন এক আজ্ঞায় অন্য এক আজ্ঞায়ের সহিত গভীর যোগ-সূত্রে আবদ্ধ হয়। বিদ্যুতের আগন্তের ন্যায় এক অগ্নি আমাদের অভ্যন্তর হইতে বাহির হয়, আর এক অগ্নি উর্ধ্ব হইতে আমাদের উপর নিপতিত হয়। এই দুই অগ্নি-শিখার সম্মিলনে আমাদের যাবতীয় আগ্রহ, আকাঙ্ক্ষা এবং আল্লাহ ছাড়া যাবতীয় পরকীয়-প্রেম ভস্মীভূত হয়। আমাদের প্রথম জীবনের মৃত্যু হয়। এই অবস্থার নাম কুরআন শরীফ অনুসারে ইসলাম। ইসলামের ফলে আমাদের কুপ্রবৃত্তির উত্তেজনার মৃত্যু হয়। তারপর, দোয়া দ্বারা আমরা নৃতন করিয়া সঞ্জীবিত হই। এই দ্বিতীয় জীবনের জন্য এলহামে-এলাহী বা ঐশ্বীবাণী প্রাপ্তি জরুরী। এই পর্যায়ে পৌছার নাম লেকা-ই-এলাহী বা খোদা-মিলন, অর্থাৎ খোদার দীদার বা খোদা-দর্শন। এই পর্যায়ে পৌছিলে খোদার সহিত মানুষের এমন নৈকট্য লাভ হয়, যেন সে তাহাকে স্বচক্ষে দেখিতে থাকে। তখন তাহাকে শক্তি দেওয়া হয়। তাহার যাবতীয় ইন্দ্রিয় ও অভ্যন্তরীণ শক্তিকে সুসজ্জিত করা হয় এবং পবিত্র জীবনের আকর্ষণ অত্যন্ত জোরে শোরে আরম্ভ হইয়া যায়। এই পর্যায়ে পৌছিলে খোদা মানুষের চক্ষু হইয়া যান, যদ্বারা সে দেখে, জিহ্বা হইয়া যান, যদ্বারা সে কথা বলে, হস্ত হইয়া যান, যদ্বারা সে আক্রমণ করে, কর্ণ হইয়া যান, যদ্বারা সে শ্রবণ করে এবং পা হইয়া যান, যদ্বারা সে চলে। আধ্যাত্মিকতার এই পর্যায় সম্পর্কেই ইঙ্গিত করিয়া খোদা বলিয়াছেন :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - (الْفَتْحٌ) ١١:

“তাহার হাত খোদার হাত, যাহা তাহাদের হাতের উপর রহিয়াছে”
(৪৮:১১)। আরও বলেন :

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكُنَّ اللَّهُ رَبُّكُنْ - (الْفَاتِحَةٌ) ١٠:

অর্থাৎ, “তুমি যাহা নিক্ষেপ করিয়াছিলে তাহা তুমি নহ, বরং খোদা নিক্ষেপ করিয়াছিলেন” (৮:১৮)। বস্তুতঃ, এই পর্যায়ে খোদার সহিত পূর্ণ মাত্রায় মিলন সাধিত হয়। খোদাতা’লার পবিত্র ইচ্ছা আজ্ঞার শিরা উপশিরায় সম্পর্কিত হয় এবং পূর্বের দুর্বল নৈতিক শক্তিসমূহ এই পর্যায়ে সুদৃঢ় পর্বতমালার ন্যায় দৃষ্ট হয়। বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হইয়া পড়ে। আল্লাহতা’লার এই বাক্যের অর্থ ইহাই :

وَآيَةَ هُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ رَأَيَادُ الْجَنَّةِ - (الْمُجَادِلَةٌ) ٩:

“এবং তিনি তাহাদিগকে স্বীয় ঝুহ (বাণী) দ্বারা সাহায্য করিলেন” (৫৮:২৩)। এই পর্যায়ে প্রেম ও ভালবাসার স্রোত এমন মহাবেগে প্রবাহিত হয় যে, খোদার জন্য মৃত্যু, সহস্র সহস্র দুঃখ-কষ্ট এবং অপমান বরণ করা ক্ষুদ্র ত্বক্ষণকে ছিন্ন করার ন্যায় সহজ হইয়া যায়। মানুষ খোদার দিকে আকর্ষিত

হইয়া চলে এবং জানে না যে, কে আকর্ষণ করিতেছে? অদৃশ্য হস্ত তাহাকে উঠাইয়া লইয়া চলে। খোদার ইচ্ছা পালন তাহার জীবনের মূলমন্ত্র হইয়া পড়ে। এই পর্যায়ে খোদা অত্যন্ত নিকটে দেখা দেন। যেমন তিনি বলেন :

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ - (١٤١)

“আমি তাহার জীবন-শিরা অপেক্ষাও তাহার অধিকতর নিকটবর্তী” (৫০৪১৭)। এই অবস্থায়, এই পর্যায়ের মানুষ, পাকা ফলের ন্যায় হইয়া থাকে, যাহা আপনা আপনি বৃক্ষ হইতে পড়িয়া যায়। এই প্রকারে এই পর্যায়ের মানুষের যাবতীয় হীন ও তুচ্ছ সম্পর্ক তিরোহিত হইয়া যায়। আপন খোদার সহিত তাহার এক গভীর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। সে সৃষ্টি বস্তুনিচয় হইতে দূরে সরিয়া যায় এবং খোদার মুকালামাত ও মুখাতেবাত অর্থাৎ তাহার সহিত সম্ভাষণ ও সঙ্ঘোধনের সম্মান লাভ করে। এই মর্যাদা লাভের দরজা এখনও খোলা আছে, যেমন পূর্বে খোলা ছিল। এখনও খোদা তাহার এই সকল নেয়ামত অব্বেষণকারীদেরকে দিয়া থাকেন, যেমন তিনি পূর্বে দিতেন। কিন্তু এই পথ শুধু মুখের কথায় পাওয়া যায় না এবং শুধু বাগাড়ুরের দ্বারা এই পথ লাভ হয় না এবং অসার কথা ও আত্মগবের দ্বারা এই দ্বার উদ্ঘাটিত হয় না। চায় অনেকে কিন্তু পায় অল্প জনে। ইহার কারণ কি? বস্তুতঃ, এই পর্যায় সত্যিকার কঠোর পরিশ্রম ও সত্যিকার আত্ম-নিয়োগের উপর নির্ভরশীল। কথা কিয়ামত পর্যন্ত বলিতে থাক; কি হইবে ? আন্তরিক সততার সঙ্গে সেই অগ্নিতে পা রাখা, যাহার ভয়ে অন্যেরা পলায়ন করে, এই পথের প্রথম শর্ত। কার্যতঃ কঠোর পরিশ্রম বিনা মৌখিক কথা অসার। এই সম্পর্কে আল্লাহ্ জাল্লা শানুভূ বলেন :

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي قَالَنِي بِأَجِيبُ
دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَعِجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا
بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشَدُونَ - (البقرة: ١٨٧)

অর্থাৎ, “যদি আমার বান্দা আমার সম্পর্কে প্রশ্ন করে, তিনি কোথায়, তবে তাহাদিগকে বলঃ তিনি তোমাদের নিকটেই আছেন। – আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা শুনিয়া থাকি। সুতরাং, তাহাদের উচিত তাহারা যেন দোয়ার দ্বারা আমার মিলন প্রার্থী হয় এবং আমার উপর ঈমান আনে, তবেই তাহারা সফল হইবে”(২৪১৮৭)।

দ্বিতীয় প্রশ্ন

মৃত্যুর পরে মানুষের অবস্থা কী হয়?

এই প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই যে, মৃত্যুর পরে মানুষের যে অবস্থা হয়, তাহা প্রকৃতপক্ষে কোন নূতন অবস্থা নহে। বরং ইহলৌকিক জীবনের অবস্থাসমূহ তথায় অধিক স্পষ্ট হইয়া প্রকাশিত হয়। মানুষের ধর্ম-বিশ্বাস ও কর্মের প্রকৃতি ভাল কিংবা মন্দ, তাহা ইহলোকে গুণভাবে তাহার মধ্যে থাকে এবং উহার বিষ-প্রতিষেধক গুণ বা উহার বিষ মানুষের জীবনের উপর এক গোপন ক্রিয়া করে। কিন্তু পরবর্তী জীবনে এমন থাকিবে না। বরং এ সব গোপন অবস্থা সুস্পষ্টরূপে আপন মৃত্যি দেখাইবে। ইহার নমুনা স্বপ্নজগতে পাওয়া যায়। মানব দেহে যে প্রকার পদাৰ্থ প্রবল হয়, স্বপ্নে এই প্রকার দৈহিক অবস্থা দেখা যায়। যখন প্রবল জুরের আক্রমণ অবশ্যভাবী হয়, তখন স্বপ্নে অধিকাংশ স্থলে অগ্নি ও অগ্নি শিখা দেখা যায়। শ্লেষ্মা জুর, বাত-জুর এবং সর্দির প্রাবল্যের ক্ষেত্রে মানুষ আপনাকে পানির মধ্যে দেখিতে পায়; বস্তুতঃ যে প্রকার রোগের জন্য দেহে বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি হয়, এই সমুদয় অবস্থা রূপকভাবে স্বপ্নে দেখা যায়। সুতরাং স্বপ্ন বৃত্তান্ত সম্পর্কে চিন্তা করিলে প্রত্যেকেই বুঝিতে পারিবে যে, পরবর্তী জগতেও ইহাই আল্লাহত্তা'লার চিরাচরিত বিধান। কারণ স্বপ্ন যেমন আমাদের মধ্যে একটা বিশেষ পরিবর্তন সৃষ্টি করিয়া আত্মিক অবস্থাকে দৈহিক আকারে রূপায়িত করিয়া প্রদর্শন করে, পরলোকেও তেমনি হইবে। তখন আমাদের কর্ম এবং কর্ম-ফল দৈহিক রূপ প্রাপ্ত হইবে এবং যাহা কিছু আমরা ইহলোক হইতে গুণভাবে সঙ্গে লইয়া যাইব, এই সবই তখন আমাদের চেহারায় স্পষ্ট প্রকাশিত দেখা যাইবে। স্বপ্নে যেমন মানুষ নানা প্রকার রূপক বস্তু দেখিতে পায় এবং কখনও মনে করে না যে, ঐগুলি রূপক বস্তু বরং উহাদিগকে প্রকৃত জিনিষ বলিয়া জ্ঞান করে, তেমনি পরলোকেও হইবে। বরং খোদা রূপক দৃশ্যাবলী দ্বারা তাঁহার নূতন শক্তি ও মহিমা প্রদর্শন করিবেন। যেহেতু সেই শক্তি ও মহিমা পরিপূর্ণ, সেই জন্য আমরা যদি রূপকের নামও না লই এবং বলি যে, খোদার কুদরতে উহা নূতন জন্ম, তবেই এই বক্তব্য একান্ত সত্য, সঠিক ও যথার্থ হইবে। খোদা বলিতেছেন :

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أَخِفَ لَهُمْ مِنْ قَرَّةِ أَعْيُنٍ - (الجدة: ١٨)

অর্থাৎ, “কোন সৎকর্মশীল ব্যক্তি জানে না যে, তাহার জন্য কী কী নেয়ামত লুক্কায়িত আছে” (৩২:১৮)। অতএব, খোদা এই সব নেয়ামতকে গুণ বলিয়া নির্ধারিত করিয়াছেন। পার্থিব নেয়ামতসমূহের মধ্যে উহাদের নমুনা নাই। ইহা সুস্পষ্ট যে, পৃথিবীর নেয়ামত আমাদের নিকট গোপন নহে। দুঃখ, আনার, আঙুর প্রভৃতি জিনিসকে আমরা জানি এবং সদা-সর্বদা এই সব জিনিস থাই। সুতরাং, ইহা সহজবোধ্য যে, এই সমুদয় জিনিষ অন্য কিছু। ঐগুলির সঙ্গে এই সকল

জিনিষের যে মিল, তাহা শুধু নামেই। সুতরাং, যে ব্যক্তি বেহেশ্তকে পার্থিব জিনিষের সমাহার বলিয়া বুঝিয়াছে, সে কুরআন শরীফের এক অক্ষরও বুঝে নাই।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় আমাদের সৈয়দ ও মৌলা নবী সাল্লাহুল্লাহ আলায়হে ওয়াসাল্লাম বলেন যে, বেহেশ্ত ও উহার নেয়ামত হইতেছে এমনসব জিনিষ, যাহা কখনও কোন চক্ষু দর্শন করে নাই, কোন কর্ণ শ্রবণ করে নাই এবং কোনো হৃদয় ধারণা করে নাই। অথচ আমরা পার্থিব নেয়ামতসমূহ চোখেও দেখি, কানেও শুনি এবং মনের মধ্যেও ঐগুলি উপলব্ধ হয়। সুতরাং, যেহেতু খোদা ও তাঁহার রসূল এই সমুদয় জিনিষকে এক প্রকার স্বতন্ত্র জিনিষ বলিয়া প্রকাশ করেন, সেহেতু আমরা তখন কুরআন হইতে দূরে চলিয়া যাই, যখন মনে করি যে, বেহেশ্তেও পৃথিবীরই দুঃখ থাকিবে যাহা গাভী, ও মহিষ দোহনে পাওয়া যায়। প্রকারান্তরে ইহাতে একথা স্বীকার করা হয় যে, সেখানে দুঃখ প্রদায়নী পশুর পালসমূহ মজুদ থাকিবে, বৃক্ষে মধু মক্ষিকারা বহু মৌচাক তৈরী করিবে এবং ফিরিশ্তাগণ অনুসন্ধান করিয়া সেই মধু সংগ্রহ করিয়া নদ-নদীতে ঢালিয়া দিবে। ইত্যাকার ধারণার সঙ্গে কি সেই শিক্ষার কোন সামঞ্জস্য আছে, যেখানে এই আয়াতসমূহে রহিয়াছে যে, পৃথিবীবাসী কখনও ঐ সব জিনিষ দেখে নাই এবং ঐসব জিনিষ আঘাতে আলোকিত করে, খোদার মা'রেফত বৃদ্ধি করে এবং ঐগুলি আধ্যাত্মিক খাদ্য, যদিও ঐ সকল খাদ্যের সামগ্রিক চিত্র বাস্তবের রঙে প্রকাশ করা হইয়াছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলা হইয়াছে যে, এগুলির মূল উৎপত্তিস্থল আঘা ও সত্যতা ? কেহ যেন মনে না করে যে, কুরআন করীমের নিম্ন উদ্ধৃত আয়াতে একথা পাওয়া যায় যে, বেহেশ্তে যে সমুদয় নেয়ামত দেওয়া হইবে, ঐ নেয়ামতগুলি দেখিয়া বেহেশ্তবাসী মানুষ চিনিয়া ফেলিবে এবং বলিবে যে, এই সব নেয়ামত তাহারা পূর্বেও প্রাপ্ত হইয়াছিল। যেমন আল্লাহত্তাল্লা বলেন :

وَدَبَّرَ الَّذِينَ أَمْتَنَا وَعَمِلُوا الصِّلْحَاتِ أَنَّ لَهُمْ

جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ كُلَّمَا رُزِقُوا

مِنْمَا مِنْ شَرَقٍ وَرِزْقًا فَالَّذِي هَذَا الَّذِي رُزِقَ

مِنْ قَبْلٍ وَأَتُوا بِمِمْشَابِهَا۔ (البقرة: ٢٤٢)

অর্থাৎ, “যাহারা স্ট্রাইক আনে এবং ভাল কাজ করে এবং যাহাদের মধ্যে কোন দোষ নাই, তাহাদিগকে সুসংবাদ দাও যে, তাহারা ঐ বেহেশ্তের উত্তরাধিকারী, যাহার নীচে নদ-নদীসমূহ প্রবাহিত। যখন তাহারা পরলোকে ঐ সকল বৃক্ষের ঐ সব ফল পাইবে, যাহা তাহারা ইহলোকেই প্রাপ্ত হইয়াছিল। তখন তাহারা বলিবে : ইহা সেই সকল ফল, যাহা পূর্বেই আমরা প্রাপ্ত

হইয়াছিলাম। কারণ তাহারা এই ফলগুলিকে পূর্বের ফলের অনুক্রম
দেখিবে”(২৪২৬)। এখন এই প্রকার ধারণা যে, পূর্বেক্ষণের ফল দ্বারা পৃথিবীর জড়
সম্পদকেই বুঝায়, সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। ইহা আয়াতের স্পষ্ট অর্থের বর্ণনা এবং
যুক্তির সম্পূর্ণ বিরোধী। বরং আল্লাহ জাল্লা শানুহু বলেন যে, যাহারা ঈমান আনে
এবং সময়ে পয়েগী সৎকর্ম করে, তাহারা স্বহস্তে এক বেহেশ্ত তৈরী করে।
উহার বৃক্ষ ঈমান। উহার নদ-নদীসমূহ আমলে সালেহ। এই বেহেশ্তের ফলই
তাহারা ভবিষ্যতে (পরকালে) খাইবে এবং সেই ফল অধিক স্পষ্ট ও সুস্বাদু হইবে
এবং তাহারা আধ্যাত্মিক দিক হইতে এই ফলই পৃথিবীতে খাইয়াছে বলিয়া
পরলোকে ঐ সকল ফল চিনিতে পারিবে এবং বলিবে যে, এই সকল তো সেই
ফলই মনে হয়, যাহা ইতিপূর্বে তাহারা আহার করিয়াছে এবং এই ফলকে
পূর্ববর্তী সেই ফলের সদৃশ দেখিতে পাইবে। সুতরাং, এই আয়াত স্পষ্ট বলিতেছে
যে, পৃথিবীতে যাহারা খোদার প্রেম ও ভালবাসার খাদ্য গ্রহণ করিত; এখন বাস্তব
আকারে সেই খাদ্যই তাহারা পাইবে। তাহারা প্রেম ও প্রীতির স্বাদ গ্রহণ
করিয়াছে এবং উহার মর্ম জানে বলিয়া তাহাদের আত্মার নিকট ঐ সময়ের
স্মৃতি জাগ্রত হইবে, যখন তাহারা নির্জনে গৃহ-কোণে এবং রাত্রির অন্ধকারে
প্রেম- ভরে আপন প্রকৃত প্রেমাস্পদকে স্মরণ করিত এবং সেই স্মরণে অনুপম
আনন্দে বিভোর হইত।

বস্তুতঃ, এখানে জড় খাদ্যের কোনও উল্লেখ নাই। যদি কাহারও মনে এই
ধারণার সৃষ্টি হয় যে, আধ্যাত্মিক উপায়ে তত্ত্বজ্ঞানীগণ এই খাদ্য পৃথিবীতেই প্রাপ্ত
হইয়াছেন, তাহা হইলে একথা বলা কি প্রকারে সঙ্গত হইবে যে, ঐগুলি
এমন নেয়ামত, যাহা পৃথিবীতে কেহ দেখে নাই, কোন কর্ণ শ্রবণ করে নাই
এবং কাহারও হৃদয় কল্পনা করে নাই? এরূপ অবস্থায় এই আয়াত দুইটিতে
বিরোধ পরিলক্ষিত হয়। ইহার উত্তর এই যে, এ ক্ষেত্রে অনেক তখনই হইত,
যখন এই আয়াতে পার্থিব নেয়ামত বুঝানো হইত। কিন্তু এখানে পার্থিব নেয়ামত
বুঝানো হয় নাই। তত্ত্বজ্ঞানী তত্ত্বজ্ঞানের রঙে যাহা পাইয়া থাকেন, প্রকৃতপক্ষে
তাহা অন্য জগতের নেয়ামত, যাহার নমুনা আগ্রহ সৃষ্টির জন্য পূর্বেই দেওয়া
হয়। স্মরণ রাখিতে হইবে, খোদাপ্রাপ্ত মানুষ পৃথিবীর নহেন। এই কারণেই
পৃথিবীবাসী তাঁহার প্রতি বিদ্রোহ পোষণ করে। তিনি আকাশের। এ জন্য তিনি
ঐশ্বী নেয়ামত প্রাপ্ত হন। পৃথিবীর মানুষ পার্থিব নেয়ামত প্রাপ্ত হয় এবং
আকাশের মানুষ ঐশ্বী নেয়ামত প্রাপ্ত হন। সুতরাং, ইহা সম্পূর্ণ সত্য যে, ঐ
সমুদয় নেয়ামত পৃথিবীবাসীর কর্ণ, পৃথিবীবাসীর হৃদয় এবং পৃথিবীবাসীর চক্ষ
হইতে লুকাইয়া রাখা হইয়াছে। কিন্তু যাঁহার পার্থিব জীবনের উপর মৃত্যু আসে,
তাঁহাকে সেই পেয়ালা রূহানীভাবে পান করান হয়, যাহা পরলোকে তাঁহাকে

বাস্তব আকারে পান করান হইবে। যখন তাঁহাকে একই পাত্র পরলোকে বাস্তব আকারে দেওয়া হইবে, তখন ইহলোকের পানের কথাই তাঁহার স্মরণ হইবে কিন্তু ইহাও সত্য যে, তিনি পার্থিব চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতিকে এই নেয়ামত সম্পর্কে অজ্ঞ জ্ঞান করিবেন। কেননা, পৃথিবীতে থাকিয়াও যেহেতু তিনি পৃথিবীতে ছিলেন না, সেহেতু তিনিও সাক্ষ্য দিবেন যে, ঐ সমুদয় নেয়ামত পার্থিব নেয়ামতের মধ্য হইতে নহে। পৃথিবীতে তাঁহার চক্ষু এই প্রকার নেয়ামত দর্শন করে নাই, কর্ণ তাহা শ্রবণ নাই এবং হৃদয়ও কখনও ধারণা করে নাই। তবে এক ভিন্ন জীবনে ঐগুলির নমুনা দেখিয়াছিলেন, যাহা পৃথিবীর মধ্য হইতে ছিল না, বরং তাহা ছিল অনাগত জগতের সংবাদ বহনকারী এবং উহারই (পরলোকের) সঙ্গে ছিল উহার (সংবাদ বহনকারীর) সম্বন্ধ এবং সম্পর্ক। পৃথিবীর সহিত উহার কোনই সম্পর্ক ছিল না।

পরলোক সম্বন্ধে কুরআনে বর্ণিত তত্ত্বঃ মা'রেফত

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মৃত্যুর পর যে যে অবস্থা উপস্থিত হয়, সামগ্রিক বিধান হিসাবে কুরআন শরীফ ঐগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করিয়াছে। পরকাল সম্বন্ধে কুরআনের এই তিন তত্ত্বকে লইয়া আমরা পৃথক পৃথক আলোচনা করিব।

মা'রেফত বা তত্ত্বজ্ঞানের প্রথম সূক্ষ্ম কথা

১। তত্ত্বজ্ঞানের প্রথম সূক্ষ্ম কথা এই যে, কুরআন শরীফে বার বার ইহাই বলা হইয়াছে যে, পরকাল নৃতন কোন জিনিষ নহে। বরং উহার সম্যক প্রকাশ এই পার্থিব জীবনেরই প্রতিচ্ছায়া ও স্মৃতিস্বরূপ হইবে যেমন, আল্লাহত্তালা বলেন :

وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَنْزَلْنَاهُ طَيْرًا فِي عَنْقِهِ وَنُخْرِجُ

لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَنْقَهُ مَنْ شَوَّرَ - (بَيْ بَيْ أَسْرَأَءِيلِ: ১৪)

অর্থাৎ, “আমরা ইহলোকেই প্রত্যেকের কর্মফল তাহার ঘাড়ে বাঁধিয়া দিই এবং ঐ সমুদয় লুকায়িত ফল আমরা কিয়ামতের দিন প্রকাশ করিয়া দিব এবং এক খোলা কর্মলিপির আকারে দেখাইব” (১৭:১৪)। এই আয়তে তায়ের শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। জানা আবশ্যক যে, আসলে পাখীকে তায়ের বলে। তাহা ছাড়া, ক্লপক অর্থে ইহা দ্বারা কর্মকেও বুঝায়। কারণ প্রত্যেক কর্ম ভাল হউক বা মন্দ, সম্পাদিত হওয়ার পর, পক্ষীর ন্যায় উড়িয়া যায়। উহার কষ্ট বা সুখ লয় পাইয়া যায় এবং উহার শুধু পবিত্রতা বা অপবিত্রতা হৃদয়-ফলকে অবশিষ্ট রহিয়া যায়।

ইহা কুরআনের মূলনীতি যে, প্রত্যেক কর্মের চিত্র সংগোপনে স্তুপীকৃত হইতে থাকে। মানুষের কর্ম যে প্রকারের, উহার অনুরূপ এক ক্রিয়া খোদাতা'লার পক্ষ হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ঐ ক্রিয়া এই পাপ বা পুণ্যকে নষ্ট হইতে দেয় ন্য বরং উহার ছাপ হস্তয়ে, মুখে, চোখে, কানে, হাতে, পায়ে অঙ্কিত হইতে থাকে এবং ইহাই গুণ্ঠ আমলনামা, যাহা পারত্রিক জীবনে খোলাখুলিভাবে পরিদৃষ্ট হইবে। তারপর, অন্যত্র বেহেশ্তবাসী সম্বন্ধে বলেন :

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُنَّ
بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ - (الحديد: ١٣)

অর্থাৎ, “সেই দিবসেও ঈমানের আলোক, যাহা গুণ্ঠভাবে মোমেনগণ প্রাপ্ত হইয়াছিল, খোলাখুলিভাবে তাহাদের সম্মুখে এবং তাহাদের ডান দিক দিয়া দৌড়াইতে দেখিতে পাইবে” (৫৭:১৩)। তারপর, অন্য স্থানে দুষ্কৃতকারীদেরকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেনঃ

أَنفَكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلَّا سَوْفَ
تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ
عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوْنَ النَّجَّيِمَ ثُمَّ لَتَرَوْنَهَا
عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَكُلُّنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ - (العاشر: ১-২)

অর্থাৎ, “দুনিয়ার সীমাহীন লোভ-লালসা তোমাদিগকে পারলৌকিক জীবনের অব্বেষণ হইতে বাধা দিয়া রাখিয়াছে। ঐ অবস্থাতেই তোমরা কবরে গিয়া স্থান লাভ করিয়াছ। তোমরা শীত্বাই জানিতে পারিবে যে, পৃথিবীর প্রতি আসক্তি ভাল নহে। আমি আবার বলিতেছি যে, শীত্বাই তোমরা জানিতে পারিবে যে, দুনিয়ার প্রতি আসক্তি ভাল নহে। যদি তোমরা নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করিতে, তবে তোমরা দোষখকে ইহলোকেই দেখিতে পাইতে। তারপর আলমে বরযথে (বা মধ্যলোকে) দৃঢ় প্রত্যয়ের চোখে দেখিবে। তারপর, পুনরঞ্চানলোকে পূর্ণ হিসাব-নিকাশে ও শান্তিতে পড়িবে। শান্তি তোমাদের উপর সর্বতোভাবে নিপত্তি হইবে এবং শুধু কথার দ্বারা নহে বরং কার্যতঃ তোমাদের দোষখের জ্ঞান লাভ হইয়া যাইবে” (১০২: ২-৯)।

তিন প্রকারের জ্ঞান :

এই আয়াতগুলিতে আল্লাহত্তা'লা পরিষ্কারভাবে বলিয়াছেন যে, ইহলোকেই দুষ্ক্রিয়পরায়ণ লোকগণের জন্য নারকীয় জীবন গোপনভাবে থাকে। চিন্তা করিলে তাহারা তাহাদের দোষখ ইহলোকেই দেখিতে পাইবে। এখানে আল্লাহত্তা'লা জ্ঞানকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন। যথা, ইলমুল একীন (যৌক্তিক জ্ঞান), আইনুল একীন (প্রত্যক্ষ জ্ঞান) এবং হাকুল একীন (অভিজ্ঞতালক্ষ নিশ্চিত জ্ঞান)। সর্বসাধারণের বুঝিবার জন্য এই তিন প্রকার জ্ঞানের দ্রষ্টান্ত এইরূপ : যদি কোন ব্যক্তি দূর হইতে কোথাও কোন ধোঁয়া দেখে তখন ধোঁয়া হইতে তাহার ধারণা অগ্নির দিকে চলিয়া যায় এবং এই ভাবিয়া সে সেখানে অগ্নির অস্তিত্ব নির্ধারণ করে যে, অগ্নি ও ধোঁয়ার মধ্যে অচেদ্য ও উত্প্রোত সম্পর্ক বিদ্যমান। যেখানে ধোঁয়া থাকিবে সেখানে অবশ্যই অগ্নি ও থাকিবে। এই জ্ঞানের নামই ইলমুল একীন বা যৌক্তিক জ্ঞান। তারপর অগ্নিশিখা দর্শনে যে জ্ঞান হয়, তাহার নাম আইনুল একীন বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং ঐ অগ্নিতে নিজে প্রবেশ করিলে যে জ্ঞান হয়, উহার নাম হাকুল একীন বা অভিজ্ঞতা লক্ষ নিশ্চিত জ্ঞান। এখন আল্লাহত্তা'লা বলেন, জাহান্নামের যুক্তিমূলক একীন ইহলোকেই সম্ভবপর। বরযখলোকে আইনুল একীন লাভ হইবে এবং হাশরে (পুনরুত্থান লোকে) ঐ জ্ঞান হাকুল একীনের পূর্ণ পর্যায়ে পৌঁছিবে।

তিন জগৎ :

এখানে জানা প্রয়োজন যে, কুরআন করীমের শিক্ষার দিক দিয়া তিন জগৎ সাব্যস্ত হয় :

প্রথম জগৎ (ইহলোক)। ইহার নাম আলমে কাসাব (উপার্জনের জগৎ) এবং নাশায়াতে উলা (প্রথম সৃষ্টি)। এই জগতেই মানুষ পুণ্য বা পাপ করে। যদিও আলমে বা'স বা পুনরুত্থানের জগতে পুণ্যের উন্নতি আছে, কিন্তু তাহা শুধু খোদার অনুগ্রহে, মানুষের উপার্জনের তাহাতে কোন দখল নাই।

(২) দ্বিতীয় জগতের নাম বরযখ। মূলতঃ **بَنْخ** (বরযখ) আরবী ভাষায় দুই জিনিসের অন্তর্বর্তী বস্তুর জন্য ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে যেহেতু এই যামানা পুনরুত্থান জগৎ ও ইহজগতের মধ্যে অবস্থিত সেহেতু ইহার নাম বরযখ। কিন্তু শব্দটি আদিকাল হইতেই এবং দুনিয়ার সৃষ্টি অবধি মধ্যবর্তী জগতের জন্য ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে। এই কারণে এই শব্দে অন্তর্বর্তী জগতের অস্তিত্বের এক আজিমুশ্শান সাক্ষ্য নিহিত আছে। আমরা মিনানুর রহমান **مِنْ الرَّحْمَنِ** পুস্তকে প্রমাণ করিয়াছি যে, আরবী শব্দগুলি খোদার মুখ নিঃসৃত শব্দ। পৃথিবীতে শুধু ইহাই একমাত্র ভাষা, যাহা পরিত্র খোদার ভাষা এবং প্রাচীন ও যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল উৎস। ইহা সব ভাষার জননী। ইহা খোদার ওহীর প্রথম ও

শেষ বাহন। খোদার ওইর প্রথম তখ্তগাহ (সিংহাসন) এই জন্য যে, সমগ্র আরবী ছিল খোদার কথা, যাহা আদি হইতে খোদার সঙ্গে ছিল। অতঃপর, সেই কথা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয় এবং পৃথিবীবাসী উহা হইতে তাহাদের ভাষাগুলি তৈরী করে। আরবী ভাষা খোদার আধুরী তখ্তগাহ এই জন্য নির্ণীত হয় যে, খোদাতা'লার শেষ পুস্তক কুরআন শরীফ আরবীতে নাযেল হইয়াছে। বস্তুতঃ, আরবী বরযথ শব্দ বর **ب** ও যথ **ت** লইয়া গঠিত; ইহার অর্থ কর্মের দ্বারা অর্জন শেষ হইয়া গিয়াছে এবং উহা এক গুপ্ত অবস্থায় পড়িয়া গিয়াছে। বরযথের অবস্থা সেই অবস্থা, যখন মানুষের এই নশ্বর মানবীয় গঠন ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়। দেহ পৃথক হইয়া যায় এবং আত্মা পৃথক হইয়া যায়। দেখা যায়, দেহকে কোনো গর্তে নিক্ষেপ করা হয়। আত্মাও এক প্রকার গর্তে গিয়া পড়ে। **ت** (যথ) দ্বারা ইহাই প্রতিপন্থ হয়। কারণ সে ভাল বা মন্দ কোন কর্ম করিতে সক্ষম নয়। কর্ম কেবল দেহের সহিত সম্বন্ধ থাকতেই প্রকাশিত হইত। স্পষ্ট কথা, আমাদের আত্মার উত্তম স্বাস্থ্য দেহের উপর নির্ভর করে। মন্তিক্ষের কোন স্থান বিশেষে আঘাত লাগিলে স্মৃতিহানি ঘটে এবং অন্য অংশ বিপন্ন হইলে চিন্তা শক্তি বিদায় প্রহণ করে এবং চৈতন্য লোপ পায়। মন্তিক্ষে কোন প্রকার সংকোচন বা প্রদাহ ঘটিলে, কিংবা রঞ্জ বা অন্য কোন জিনিস জমিয়া আংশিক বা পূর্ণাঙ্গীন ঘট্টি জন্মাইলে, অচিরাত্ মৃচ্ছা বা মৃগীর আক্রমণ হয়। সুতরাং, আমাদের চিরঅভিজ্ঞতা আমাদিগকে নিশ্চিত শিক্ষা দেয় যে, আমাদের আত্মা দেহের সম্বন্ধ ছাড়া সম্পূর্ণ অকেজো। সুতরাং, আমরা যদি মনে করি যে, কোন সময় আমাদের দেহহীন আত্মা, যাহার সহিত দেহ নাই, কোন আনন্দময় অবস্থা পাইতে পারে, তবে ইহা আমাদের অলীক ধারণা। গল্প হিসাবে ইহা প্রহণ করিলেও, যুক্তি কখনও ইহার সমর্থন করে না। আমরা আদৌ বুঝিতে পারি না যে, আমাদের যে আত্মা দেহের সামান্য সামান্য বিশৃঙ্খলায় বেকার হইয়া পড়ে, উহা সেই দিন কি প্রকারে পরিপূর্ণ অবস্থায় থাকিবে, যখন উহা দেহের সম্বন্ধ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইবে। প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা দ্বারা কি আমরা বুঝিতে পারি না যে, আত্মা সুস্থ থাকার জন্য দেহের সুস্থতা আবশ্যিক? আমাদের মধ্যে কেহ জরাজীর্ণ হইয়া পড়িলে সঙ্গে সঙ্গে তাহার আত্মা বৃদ্ধ হইয়া পড়ে। তাহার জীবনের সম্যক মূলধন বার্ধক্য-চোরে চুরি করিয়া লইয়া যায়। আল্লাহতা'লা বলেন :

لَيَكُلَّا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا۔ (الحج: ٢٩)

অর্থাৎ, “মানুষ বৃদ্ধ হইয়া এমন অবস্থায় গিয়া পৌছে যে, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার পর সে আবার মূর্খে পরিণত হয়” (২২:৬)। সুতরাং আমাদের এই সকল অভিজ্ঞতা এই কথার জন্য যথেষ্ট প্রমাণ যে, দেহ ছাড়া আত্মা ক্রিয়াশীল নহে। তারপর এই ধারণাও মানুষকে প্রকৃত সত্যের দিকে মনোযোগী করিতেছে যে, দেহ ছাড়া আত্মা কোন কাজের জিনিষ হইলে, খোদাতা'লার এই ক্রিয়া বৃথা

বলিয়া প্রতিপন্ন হইত যে, তিনি অযথা ইহাকে নশ্বর দেহের সহিত জুড়িয়া দিয়াছিলেন। তারপর খোদাতা'লা যে মানুষকে অসীম উন্নতির জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহাও ভাবিবার বিষয়। সুতরাং মানুষ যখন এই সংক্ষিপ্ত জীবনের উন্নতি দেহের সাহচর্য ছাড়া করিতে পারে না, তখন কি প্রকারে আশা করা যাইতে পারে যে, সেই অশেষ উন্নতি, যাহা সীমাহীন, তাহা দেহের সাহচর্য ব্যতীত একাই অর্জন করিবে ?

সুতরাং, এই সকল যুক্তি দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, আত্মার পরিপূর্ণ ক্রিয়া প্রকাশের জন্য ইসলামী মূলনীতির দিক হইতে দেখা যায়, আত্মার সহিত দেহের সাহচর্য অপরিহার্য। যদিও মৃত্যুর পর এই নশ্বর দেহ আত্মা হইতে পৃথক হইয়া পড়ে তথাপি বরযথলোকে প্রত্যেক আত্মা এক সীমা পর্যন্ত তাহার কর্মের স্বাদ প্রহণের জন্য দেহ প্রাপ্ত হয়। ঐ দেহ এই দেহের মত নহে। বরং কর্ম অনুযায়ী উহা এক প্রকার আলোক বা আঁধার হইতে তৈরী হয়। অন্য কথায় আলমে বরযথে মানুষের কর্মের অবস্থা দেহের কাজ করে। খোদার কালামে বার বার উল্লেখ আছে যে, কোন কোন দেহকে আলোকময় এবং কোন কোন দেহকে অঙ্গকারময় বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, যাহা কর্মের আলোক বা কর্মের আঁধার দিয়া তৈরী হইয়া থাকে। যদিও এই রহস্য অত্যন্ত সূক্ষ্ম, কিন্তু ইহা যুক্তি বিরোধী নহে। পরিপূর্ণ মানুষ ইহলৌকিক জীবনেই জড়দেহ ছাড়াও এক আলোক সন্তা পাইতে পারেন। মুকাশেফাত বা দিব্য-দর্শন জগতে ইহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। শুধু একটা স্তুল বুদ্ধির সীমানায় যাইয়া যাহাদের বুদ্ধি থামিয়া গিয়াছে, তাহাদের মত মানুষকে বুঝানো কঠিন হইলেও, যাহারা মুকাশেফাত-জগৎ হইতে কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা এই প্রকারের কর্ম হইতে দেহ গঠিত হওয়াকে আশ্চর্যজনক বা সুদূর পরাহত বলিয়া মনে করিবেন না, বরং তাঁহারা এই আলোচনায় আনন্দ লাভ করিবেন।

বস্তুতঃ, সেই যে দেহ, যাহা কর্মের প্রকৃতি হইতে মিলিবে, উহাই বর্যথ জগতে, সাধু ও অসাধু ব্যক্তির প্রতিফল প্রাপ্তির কারণ হইবে। এই বিষয়ে আমার নিজ অভিজ্ঞতা আছে। কাশফযোগে সম্পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় আমি অনেক বার অনেক মৃত ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাইয়াছি। কোন কোন পাপী ও বিপথগামীর দেহ এমন কৃষ্ণবর্ণ দেখিয়াছি, যেন তাহা ধূম্র হইতে তৈরী হইয়াছে। যাহা হউক, এই বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে এবং আমি জোর দিয়া বলিতেছি যে, খোদাতা'লা যেভাবে বলিয়াছেন সেইভাবেই মৃত্যুর পর প্রত্যেকে নিশ্চয় আলোকময় বা অঙ্গকারময় দেহ পায়। মানুষ ভুল করিবে যদি সে এইসব অতি সূক্ষ্ম তত্ত্ব শুধু যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করিতে চাহে। বরং জানা উচিত, চক্ষু যেমন মিষ্টি জিনিষের স্বাদ বলিতে পারে না এবং জিহ্বা কোন জিনিষ দেখিতে পারে না, তেমনই পারলৌকিক জ্ঞান, যাহা পবিত্র মুকাশেফাত দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়, শুধু যুক্তির দ্বারা উহার রহস্য ভেদ করা যাইতে পারে না। খোদাতা'লা এই পৃথিবীতে

অজানা জিনিষ জানার জন্য পৃথক পৃথক উপায় রাখিয়াছেন অতএব, প্রত্যেক বিষয়েই উহার জন্য নির্দিষ্ট উপায় অন্বেষণ কর, তবেই উহা পাইবে।

আরও একটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। যাহারা কুকার্যে লিঙ্গ এবং বিপথগামী, তাহাদিগকে মৃত বলিয়া খোদাতা'লা তাঁহার কালামে অভিহিত করিয়াছেন এবং সৎকর্মশীলগণকে জীবিত বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন। ইহার প্রকৃত তত্ত্ব এই যে, খোদা সম্বন্ধে গাফেল থাকিয়া যাহারা মরে, তাহাদের জীবনের সরঞ্জাম, যাহা পানাহার ও কামাচারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ায় এবং আধ্যাত্মিক খোরাকে তাহাদের কোনও অংশ না থাকায়, সত্যই তাহারা মৃত, এবং তাহারা শুধু শাস্তি পাওয়ার জন্যই জীবিত হয়। এই রহস্যের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া আল্লাহ্ জাল্লা শানুহ বলেন :

إِنَّمَا مَنْ يَأْتِ بِرَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ

(لَيَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَخْيَى - (ظ. ٧٥،

অর্থাৎ, “অপরাধী হইয়া যে ব্যক্তি খোদার নিকট আসিবে, অনন্তর তাহার গন্তব্যস্থল জাহান্নাম হইবে। সে উহাতে মরিবেও না, জীবিতও থাকিবে না”(২০:৭৫)। কিন্তু যাহারা খোদার প্রেমিক, তাঁহারা মৃত্যুতে মরেন না। কারণ তাঁহাদের পানি ও ঝুঁটি তাঁহাদের সঙ্গে থাকে। তারপর, বরযখের পরবর্তী যুগের নাম আলমে বা’স عَالَمُ بَعْثَةٍ বা পুনরুত্থানলোক। এই সময়ে প্রত্যেক আত্মা ভাল হউক বা দুষ্ট, সাধু হউক বা অসাধু খোলাখুলিভাবে এক দেহ লাভ করিবে। ঐদিন খোদার সেই সার্বিক জ্যোতির্বিকাশের জন্য নির্ধারিত, যখন প্রত্যেক মানুষ তাহার স্রষ্টা ও পালনকর্তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে পুরাপুরি জ্ঞান লাভ করিবে এবং প্রত্যেকেই তাহার কর্মফলের শেষ সীমান্য পৌছিবে। ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই যে, খোদা ইহা কী প্রকারে করিবেন? কারণ তিনি সর্বশক্তিমান। তিনি সব কুদরত ও মহিমার মালিক। তিনি স্বয়ং বলেন :

أَوَلَمْ يَرَ إِلَّا نَسَانٌ أَتَأَنْحَلَقْنَاهُ مِنْ تُطْفَةٍ فَإِذَا

هُوَ خَصِينِمُ مَبِينُ . وَصَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسَى حَلْقَةً ،

قَالَ مَنْ يَعْلَمُ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِينِمُ . قُلْ يُخْبِنِيهَا

الَّذِي أَنْتَاهَا أَوْلَ مَرَّةٍ وَمُوْلَى كُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ .

أَوَلَئِنَسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقُدْرَةٍ

عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بِلِقَ وَهُوَ الْخَلُقُ الْعَلِيمُ .

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا آَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ -

قَسْبَحْنَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلْكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ

رَأَيْنَاهُ تُرْجَمُونَ - رِيْسَنْ ٨٠-٨٤

অর্থাৎ, “মানুষ কি দেখে নাই যে, আমরা তাহাকে এক বিন্দু পানি হইতে সৃষ্টি করিয়াছি, যাহা গর্ভাশয়ে নিষ্কিপ্ত হইয়াছিল। অতঃপর উহা এক ঝগড়াটে মানুষে পরিণত হইল। আমার সম্বন্ধে কথার জাল বুনিতে লাগিল! সে তাহার জন্মকথা ভুলিয়া গেল এবং বলিতে লাগিল : ইহা কী প্রকারে সম্বব যে, যখন মানুষের অঙ্গসমূহও অবিকৃত থাকিবে না, তখন আবার সে পুনর্জীবন লাভ করিবে! তাহাদিগকে বল : তিনিই জীবিত করিবেন, যিনি তাহাদিগকে প্রথম সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি সর্বপ্রকার এবং সর্বদিক হইতে জীবিত করিতে জানেন। তাহার আদেশের এমন মহিমা যে, যখন তিনি কোন জিনিষের হওয়া চাহেন, তখন তিনি শুধু ইহাই বলেন, ‘হও’, এবং ঐ জিনিষ সৃষ্টি হইয়া যায়। সুতরাং পবিত্র সেই সত্তা, সকল বস্তুর উপর যাহার কর্তৃত্ব। তোমরা সকলেই তাহার দিকে প্রত্যাগমন করিবে” (৩৬:৭৮-৮০; ৮২-৮৪)। সুতরাং, এই আয়াতগুলিতে আল্লাহ জাল্লাহ শান্তভ বলেন যে, তাহার নিকট কোন জিনিষ না হওয়ার নহে। যিনি এক তুচ্ছ বিন্দু হইতে মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি কি পুনর্বার তাহাকে সৃষ্টি করিতে অক্ষম ?

এখানে আরও একটি প্রশ্ন অজ্ঞদের পক্ষ হইতে উত্থাপিত হইতে পারে এবং উহা এই যে, যেহেতু ততীয় জগৎ অর্থাৎ আলমে বা’আস-পুনরঞ্চান দিবস যখন দীর্ঘকাল পরে আসিবে, তখন সৎ ও অসৎ সকলের পক্ষে আলমে বরষখ, যাহা একটা হাজত গৃহের অনুরূপ, তথায় বিচারের অপেক্ষায় থাকা একটা বাজে কথা বলিয়া মনে হয়। ইহার উত্তর এই : এইরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্তক। ইহা শুধু অজ্ঞতার ফলে জন্মে। বরং খোদার কেতাবে সৎ ও অসতের প্রতিফলের জন্য দুই স্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়। একটি হইল বরষখ, যেখানে গোপনে প্রত্যেকে তাহার প্রতিফল ভোগ করিবে। দুষ্ট লোকেরা মৃত্যুর পরে জাহানামে প্রবেশ করিবে। সাধুগণ মৃত্যুর পরে জাল্লাতে আরাম ভোগ করিবেন। বস্তুতঃ, এই প্রকার আয়াত কুরআন শরীফে অনেক আছে যে, মৃত্যুর পরক্ষণে প্রত্যেক মানুষ তাহার কর্মফল দর্শন করে। দৃষ্টান্ত স্থলে খোদাতালা এক বেহেশ্তবাসীর সম্বন্ধে খবর বলিতেছেন :

قِيلَ اذْخُلِ الْجَنَّةَ - رِيْسَنْ ٢٧

অর্থাৎ, “তাহাকে বলা হইলঃ তুমি বেহেশ্ততে প্রবেশ কর” (৩৬:২৭)। অনুরূপভাবে এক দোষখীর সম্বন্ধে সংবাদ দিয়াছেন :

فَرَأَهُ فِي سَوَاءِ الْجَنَّمِ - (الصَّفَّ، ٥٧)

অর্থাৎ “এক বেহেশ্তবাসীর এক দোষখী বন্ধু ছিল। যখন উহারা দুইজনেই মারা গেল, তখন বেহেশ্তবাসী তাহার বন্ধু কোথায় জানার জন্য ব্যাকুল হইল। অতঃপর, দেখান হইল যে, সে জাহানামে আছে (৩৭:৫৬)।” সুতরাং পূরক্ষার ও শাস্তির কার্য অবিলম্বে শুরু হইয়া যায়। দোষখী দোষখে বেহেশ্তী বেহেশ্তে যায়। কিন্তু ইহার পরে আরও এক উচ্চ ও উন্নত জ্যোতির্বিকাশের দিন আছে। খোদার মহান প্রজ্ঞা ঐ দিনকে প্রকাশ করিবার তাগিদ দিয়াছে। কারণ তিনি মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যেন তিনি স্বষ্টা বলিয়া পরিচিত হন। অতঃপর, তিনি সকলকে ধৰ্ম করিবেন, যেন তিনি প্রতাপাত্মিত কাহার বলিয়া পরিচিত হন। তারপর একদিন সকলকে পূর্ণ জীবন দিয়া একই ময়দানে সমবেত করিবেন, যেন তিনি সর্বশক্তিমান বলিয়া পরিচিত হন। এখন জানা আবশ্যক, পূর্বোল্লিখিত সূক্ষ্ম তত্ত্বাবলীর মধ্যে ইহাই প্রথম মা’রেফত ও সূক্ষ্মতত্ত্ব — যাহার আলোচনা করা হইল।

তত্ত্বজ্ঞানের দ্বিতীয় সূক্ষ্মতত্ত্ব

তত্ত্বজ্ঞানের দ্বিতীয় সূক্ষ্মতত্ত্ব, যাহাকে আলমে মাআদ বা পরলোকের জীবন বলে, সে সম্বন্ধে কুরআন শরীফে যাহা বর্ণিত আছে, তাহা এই যে, আলমে মাআদে, ইহলোকে যে সমুদয় বিষয় আধ্যাত্মিক ও অদৃশ্যমান ছিল, ঐ সকলই রূপ পরিপূর্ণ করিবে। আলমে মাআদ সম্পর্কে বরযথ পর্যায়ের হউক বা আলমে বাস পর্যায়ের হউক, খোদাতালা যাহা কিছু বলিয়াছেন, তন্মধ্যে একটি আয়াত এই :

مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ آغْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ آغْمَى وَأَضَلَّ سِينِيَّاً - رَبِّيْ إِسْمَاعِيلِ : ٢٠

অর্থাৎ, “যে ব্যক্তি ইহলোকে অঙ্ক থাকিবে সে পরলোকেও অঙ্ক হইবে(১৭:৭৩)। এই আয়াতে ইহাই বুরান হইয়াছে যে, ইহলোকের আধ্যাত্মিক অঙ্গত পরলোকে দৈহিকরূপে পরিদৃষ্ট ও অনুভূত হইবে। অদৃশ, অন্য আয়াতে বলেন :

حَذْرَةُ قُلُونَةِ شَمَّ الْجَحِيمَ صَلَوةُ شَمَّ فِي

سِنِسِلَةِ ذَرْعَمَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فِي شَلَوْةِ - رَاجِعًا : ٣١-٣٣

অর্থাৎ, “এই জাহানামীকে পাকড়াও কর। তাহার ঘাড়ে হারকাঠ লাগাও, তারপর তাহাকে দোষখে জুলাও। তারপর সত্ত্ব গজ দীর্ঘ শিকলে উহাকে আবদ্ধ কর” (৬৯:৩১-৩৩)। জানা আবশ্যক, এই আয়াতগুলিতে স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, দুনিয়ার রহানী আয়াব, আলমে মাআদে সাকারে প্রকাশিত হইবে। দৃষ্টান্ত

স্থলে, গলার হাড়কাঠ পার্থিব লোভ-লালসা, যাহা মানুষের মাথাকে ভূমির দিকে অবনত করিয়া রাখিয়াছিল, উহা পরজগতে বাহ্যিক হাড়কাঠ আকারে দেখা যাইবে। তেমনই ইহকালে সংসারের আবন্দনতার শিকল পরলোকে পায়ে বেড়ীর আকারে দেখা দিবে এবং পার্থিব আকাঞ্চ্ছা ও লোভ-লালসার জ্বালা প্রকাশ্য এবং জ্বলন্ত লেলিহান অগ্নিরূপে দৃষ্টিগোচর হইবে। পাপাচারী মানুষ ইহলৌকিক জীবনে কামনা-বাসনার এক জাহানাম স্বীয় অন্তরে বহন করিয়া ফিরে এবং অকৃতকার্যতার মধ্যে এই জাহানামের জ্বালা অনুভব করে। অতঃপর যখন সে নশ্বর বাসনা-কামনা হইতে দূরে নিষ্কিণ্ঠ হইবে এবং যখন তাহাকে নৈরাশ্য আচ্ছন্ন করিবে, তখন খোদাতা'লা তাহার হা-হৃতাশকে প্রকাশ্য অগ্নিরূপে তাহার নিকট প্রকাশ করিবেন। তিনি বলেন :

وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ - (سা. ٥٥)

অর্থাৎ, “তাহাদের এবং তাহাদের বাসনার বন্ধুর মধ্যে যবনিকা ফেলিয়া দেওয়া হইবে এবং ইহাই আয়াবের মূল হইবে” (৩৪:৫৫)। অতঃপর ‘সন্তুর গজ শিকল দ্বারা বন্ধন কর’, এই কথার প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে যে, পাপাচারী ব্যক্তি সাধারণতঃ সন্তুর বছর জীবন প্রাপ্ত হয়। বরং অনেক সময় সে এই পৃথিবীতে এই প্রকারে সন্তুর বছর জীবন পায় যে, শৈশবের বয়স এবং বার্ধক্যের অক্ষমতার সময় বাদ দিয়াই উক্ত পরিমাণ স্পষ্ট ও সচল জীবন পাইয়া থাকে, যাহা বুদ্ধি ও পরিশ্রম সহকারে কার্যের উপযোগী হইয়া থাকে। কিন্তু এই দুর্ভাগ্য তাহার জীবনের উৎকৃষ্ট সন্তুর বৎসরই পার্থিব বন্ধনের বাঁধনে কাটায় এবং এই নিগড় হইতে মুক্ত হইতে চাহে না। সুতরাং, খোদাতা'লা এই আয়াতে বলেন যে, এই সন্তুর বৎসর যাহা সে পৃথিবীর বাঁধনে কাটাইয়াছিল, পরলোকে সন্তুর গজ লম্বা এক শিকলের আকারে মৃত্যু হইবে। এক এক গজ শিকল এক এক বৎসরের নির্দেশক হইবে। এখানে শ্বরণ রাখা কর্তব্য, খোদাতা'লা তাঁহার দিক হইতে বান্দার প্রতি কোন বিপদ দেন না। বরং তিনি মানুষের আপন কুকর্মই তাহার সম্মুখে রাখেন।

তারপর, তাঁহার এই অমোদ নিয়ম প্রকাশার্থে খোদাতা'লা অন্য এক স্থানে বলেন :

إِنْطَلِقُوا إِلَيْهِ طِلْبًا ذِي شَلَّى شَعِيبٍ لَا طَلِيلٍ

وَلَا يُعْنِي مِنَ الْهَبِ - (المرسلات. ٣٢-٣١)

অর্থাৎ, “হে পাপাচারী ও বিপথগামী ব্যক্তিগণ! ত্রিকোণ ছায়ার দিকে চল, যাহার তিনটি শাখা আছে, অথচ উহারা ছায়ার কাজ দেয় না; এবং উত্তাপ হইতেও বাঁচাইতে পারে না” (৭৭:৩১-৩২)। এই আয়াতে ‘তিন শাখা’ দ্বারা

হিস্তা, পশুত্ব ও অলীক কল্পনা বুঝায়। যাহারা এই তিনি প্রবৃত্তিকে নৈতিকভাবে
রূপায়িত করে না এবং উহাদিগকে সংযত রাখে না, তাহাদের এই প্রবৃত্তিগুলিকে
কেয়ামতের দিন পল্লবহীন তিনটি শাখার আকারে খাড়া দেখানো হইবে। উহা
পাপীগণকে উত্তাপ হইতে বাঁচাইতে পারিবে না। বরং তাহারা উত্তাপে পুড়িতে
থাকিবে। তারপর, অনুরূপভাবেই খোদাতালা তাহার একই বিধান প্রকাশে
বেহেশ্তীদের সম্মতে বলেন :

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ

بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ - (المدید: ۱۳)

অর্থাৎ, “সেই দিন তুমি দেখিবে যে, মোমেনগণের সেই আলোক, যাহা
ইহলোকে গুণভাবে আছে, প্রকাশ্যভাবে তাহাদের সম্মুখে ও তাহাদের ডান দিকে
দৌড়াইতে থাকিবে” (৫৭:১৩)।

তারপর আরও এক আয়াতে বলেন :

يَوْمَ تَبَيَّضُ وُجُوهٌ وَ تَسْوَدُ وُجُوهٌ - رَأَى عَزْلَ (۱۰۷)

অর্থাৎ, “সেই দিন কোন কোন চেহারা শুভ ও উজ্জ্বল হইয়া যাইবে এবং
কোন কোন চেহারা কালো হইবে” (৩:১০৭)।

مَثُلُ الْجَنَّةِ الَّتِي دُعِيَ الْمُتَقْوَنُ مِنْهَا أَنْهَرٌ قِنْ
مَلَأُ غَيْرِ أَيْنِهِ وَأَنْهَرٌ مِنْ لَبِنِ لَفَ يَتَعَقَّبُ
طَغْمَةٌ وَأَنْهَرٌ مِنْ خَنِيرٍ لَذَّةٌ لِلشَّرِيكِينَ وَأَنْهَرٌ
مِنْ عَسَلٍ مَصَقَّ - (مَحْمَد: ۱۴)

অর্থাৎ, “সেই বেহেশ্ত যাহা পরহেযগারগণকে দেওয়া হইবে, উহার দৃষ্টান্ত
একটি বাগানের ন্যায়। উহাতে পানির নহরসমূহ আছে, যাহা কখনও দূষিত হয়
না। উহাতে দুঁধের নদীসমূহ আছে, যাহার স্বাদ কখনও পরিবর্তিত হয় না।
উহাতে শরাবের নদীসমূহ আছে, যাহা পূর্ণ আনন্দ দান করে এবং উহাতে নেশা
নাই। উহাতে মধুর নহরসমূহ আছে, যাহা অত্যন্ত স্বচ্ছ, কোন প্রকারের ময়লা
উহাতে নাই” (৪৭:১৬)। এখানে স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, এই বেহেশ্তকে
তোমরা উপমা-স্থলে এই প্রকারের জ্ঞান কর যে, উহাতে ঐ সব জিনিসের
কূলহীন নদীসমূহ আছে। তত্ত্বদর্শী আরেফগণ পৃথিবীতে রহানীভাবে যে জীবনপ্রদ

পানি পান করে, উহা সেখানে প্রকাশ্যভাবে বর্তমান আছে। যে আধ্যাত্মিক দুঃখে তাহারা দুঃখপোষ্য শিশুর ন্যায় জুহানীভাবে পৃথিবীতে প্রতিপালিত হয়, বেহেশ্তে উহাই প্রকাশ্যভাবে দৃষ্ট হইবে। খোদার যে প্রেম মন্দিরায় তাহারা ইহলোকে সর্বদা আধ্যাত্মিকভাবে মন্ত থাকিত, এখন বেহেশ্তে প্রকাশ্যভাবে উহার নদীসমূহ দৃশ্যমান হইবে। ঈমানের সুধা-মধু, যাহা ইহলোকে আধ্যাত্মিকভাবে তত্ত্বজ্ঞানী আরেফগণের মুখে প্রবেশ করিত, বেহেশ্তে তাহা অনুভূত ও প্রকাশিত নদীসমূহের আকারে পরিদৃষ্ট হইবে। প্রত্যেক বেহেশ্তবাসী তাহার নদ-নদী ও বাগানসমূহ সম্বলিত আধ্যাত্মিক অবস্থাকে প্রকাশ্যভাবে উন্মুক্ত করিয়া সাকারে দেখাইয়া দিবে। খোদাও সেই দিন বেহেশ্তীগণের জন্য অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া আসিবেন।

বস্তুতঃ জুহানী অবস্থা গুণ্ঠ থাকিবে না, বরং সাকারে দেখা যাইবে।

তত্ত্বজ্ঞানের তৃতীয় সূক্ষ্ম কথা

তৃতীয় সূক্ষ্ম জ্ঞানতত্ত্ব এই যে, পরলোকে উন্নতির শেষ নাই। এ সম্বন্ধে আল্লাহত্তালা বলেন :

وَالَّذِينَ أَمْنَأْنَا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ
آيَيْنِهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقْوِلُونَ رَبَّنَا آتِنَا
كَنَّا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ۔ (التحریم: ৭)

অর্থাৎ, “পৃথিবীতে যাহাদের ঈমানের আলো ছিল, তাহাদের আলো কেয়ামতের দিন তাহাদের সম্মুখে এবং তাহাদের দক্ষিণ পার্শ্বে দৌড়াইতে থাকিবে। তাহারা সর্বদা ইহাই বলিবে : হে খোদা! আমাদের আলোকে পূর্ণ করিয়া দাও এবং তোমার মাগফেরাতের মধ্যে আমাদিগকে ধ্রুণ কর। তুমি সব কিছুর উপরে সর্বশক্তিমান” (৬৬:৯)।

এই আয়াতে যে বলা হইয়াছে- তাহারা সর্বদা ইহাই বলিতে থাকিবে, আমাদের আলোকে পূর্ণ করিয়া দাও- ইহা অসীম উন্নতির দিকে ইংগিত করিতেছে। অর্থাৎ, আলোর এক পূর্ণ-স্তর লাভ করিবার পর, আর এক স্তর তাহাদিগের দৃষ্টিগোচর হইবে। ইহা দেখিয়া পূর্ব-স্তর অপূর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। তখন তাহারা দ্বিতীয় স্তরের জন্য প্রার্থনা করিবে এবং উহা প্রাণ হওয়ার পর এক তৃতীয় স্তর তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইবে। তখন উহা দেখিয়া তাহারা

পূর্বের স্তরগুলিকে তুচ্ছ জ্ঞান করিবে এবং পুনরায় তাহারা আরও স্তরের আকাঞ্চ্ছা করিবে। ইহাই সেই উন্নতির আগ্রহ, যাহা تَسْمِيَّ (আতমিম অর্থাৎ পূর্ণ কর) শব্দ হইতে প্রতিভাত হয়।

বস্তুতঃ এই প্রকারে অনন্ত উন্নতির ধারা চলিতে থাকিবে, কখনও অবনতি হইবে না এবং তাহারা বেহেশ্ত হইতে কখনও বিতাড়িত হইবে না। বরং প্রত্যহ তাহারা সম্মুখে অগ্রসর হইতে থাকিবে, তাহারা কখনও পিছনে হটিবে না। আর যে একটি কথা বলা হইয়াছে- ‘তাহারা সর্বদা মাগফেরাত প্রার্থনা করিবে’, ইহাতে প্রশ্ন হইতে পারে যে, বেহেশ্তে প্রবেশের পর মাগফেরাত তথা পাপ মোচনের আর কী বাকী থাকিল এবং যখন সকল অপরাধের ক্ষমা হইয়া গিয়াছে, তখন আবার এস্টেগফারের কী প্রয়োজন রহিল? ইহার উত্তর এই যে, মাগফেরাতের প্রকৃত অর্থ অমার্জিত ও ক্রটিযুক্ত অবস্থাকে নীচে দাবান ও ঢাকিয়া দেওয়া। সুতরাং বেহেশ্তবাসী উন্নতির চরম স্তর লাভ করিতে এবং পূর্ণ নূরে নিমজ্জিত হইতে চাহিবে। তাহারা পরবর্তী অবস্থা দেখিয়া প্রথম অবস্থাকে অপূর্ণ জ্ঞান করিবে। অতএব, তাহারা চাহিবে যেন প্রথম অবস্থাকে নীচে দাবান হয়। অতঃপর, তৃতীয় উৎকৃষ্ট অবস্থা দেখিয়া দ্বিতীয় পূর্ণত্ব অবস্থা সম্বন্ধে তাহাদের মাগফেরাতের আকাঞ্চ্ছা জন্মিবে। অর্থাৎ সেই অপূর্ণতাকে নীচে লুণ্ঠ ও গুণ্ঠ করিতে চাহিবে। এই প্রকারে অনন্ত মাগফেরাতের আগ্রহ জীবিত থাকিবে। ইহা সেই মাগফেরাত ও ইস্টেগফার শব্দ, যাহা কোন কোন অজ্ঞ ব্যক্তি আপন্তি হিসাবে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে পেশ করিয়া থাকে। শ্রোত্মগুলী নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, এই ইস্টেগফারের আকাঞ্চ্ছাই মানুষের গৌরব। যে ব্যক্তি নারীর গর্ভে জন্ম লইয়াছে, অথচ সর্দ-সর্বদার জন্য ইস্টেগফারকে নিজ অভ্যাসে পরিণত করে নাই, সে কীট, মানুষ নহে। সে অঙ্গ, চক্ষুশান নহে। অপবিত্র সে, পবিত্র নহে।

এখন সংক্ষেপে কথা এই যে, কুরআন শরীফের পরিপ্রেক্ষিতে দোষখ এবং বেহেশ্ত উভয়ই প্রকৃতপক্ষে মানুষের জীবনের প্রতিচ্ছায়া ও স্মারক হইবে। ঐগুলি এমন কোন নৃতন সাকার জিনিস নহে, যাহা অন্য স্থান হইতে আসিবে। অবশ্য ইহা সত্য যে, উভয় অবস্থা সাকারে দৃশ্যমান হইবে। কিন্তু ঐগুলি আসল আধ্যাত্মিকতার প্রতিচ্ছায়া ও স্মারক হইবে। আমরা এমন প্রকার বেহেশ্তকে স্বীকার করি না যে, শুধু দৈহিকভাবে এক যমীনে বৃক্ষ রোপণ করা হইয়াছে। আমরা এমন দোষখও স্বীকার করি না, যাহার মধ্যে প্রকৃতই গন্ধকের পাথর আছে। বরং ইসলামী বিশ্বাস অনুযায়ী ইহলোকে মানুষ যে সব কার্য করে, বেহেশ্ত ও দোষখ উহারই প্রতিচ্ছায়া-স্বরূপ।

তৃতীয় প্রশ্ন

মানব জীবনের উদ্দেশ্য কী এবং উহা
লাভ করিবার উপায় কী?

উত্তর : নানা প্রকৃতির মানুষ তাহাদের অদ্বারদর্শিতা বা চিত্তের সংকীর্ণতা বা ভীরুতায় তাহাদের জন্য বিভিন্ন প্রকার উদ্দেশ্য নির্বাচন করে এবং সেই উদ্দেশ্য শুধু পার্থিব আকাঙ্ক্ষা ও বাসনা পর্যন্ত পৌছিয়া থাকে। কিন্তু খোদাতা'লা তাঁহার পবিত্র গ্রন্থে মানবের জীবনের যে উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা এই :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِغُبْدُونَ (الرَّدِيَات: ٥٧)

অর্থাৎ, “জিন্ন ও মানুষকে (উচ্চ স্তরের ও সাধারণ স্তরের মানুষকে) শুধু এই জন্য সৃষ্টি করিয়াছি যে, তাহারা যেন আমাকে চিনে এবং আমার উপাসনা করে” (৫১:৫৭)। সুতরাং এই আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হইল আল্লাহর উপাসনা করা, তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা এবং তাঁহার হইয়া যাওয়া।

ইহা জানা কথা, মানুষের সাধ্য নাই যে, সে তাহার জীবনের উদ্দেশ্য নিজের ক্ষমতায় স্থির করিয়া লয়। কারণ মানুষ নিজের ইচ্ছায় আসেও নাই এবং যাইবেও না। বরং সে এক সৃষ্টি জীব। যিনি তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সব প্রাণী অপেক্ষা উত্তম ও উৎকৃষ্ট শক্তি তাহাকে দিয়াছেন, তিনি তাহার জীবনের এক উদ্দেশ্যও নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। কোন মানুষ এই উদ্দেশ্য বুঝুক বা না বুঝুক, কিন্তু মানুষকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য, নিঃসন্দেহে খোদার উপাসনা, খোদার পরিচয় ও তত্ত্বজ্ঞান লাভ ও খোদার মধ্যে বিলীন হইয়া যাওয়া। আল্লাহতা'লা কুরআন শরীফে অন্য এক স্থানে বলেন :

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْأَسْلَامُ - (آل عمران: ٢٠٠)

فَطَرَ اللَّهُ أَنْتَ فَقَرَّ النَّاسَ عَلَيْهِمْ

ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ - (التورم: ٣١)

অর্থাৎ, “যে ধর্মে খোদার তত্ত্বজ্ঞান বিশুদ্ধ এবং তাঁহার এবাদত সর্বোৎকৃষ্ট, উহাই ইসলাম। মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই ইসলাম রাখা হইয়াছে। খোদা মানুষকে ইসলামের উপর সৃষ্টি করিয়াছেন এবং ইসলামের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন” অর্থাৎ, তিনি ইহা চাহিয়াছেন যে, মানুষ তাহার সমস্ত শক্তি দিয়া তাঁহার উপাসনায়, আজ্ঞা পালনে ও প্রেমে নিমগ্ন হউক। এই জন্যই সেই সর্বশক্তিমান, দয়াল দাতা মানুষকে ইসলামোপযোগী যাবতীয় শক্তি দিয়াছেন। (৩:২০, ৩০:৩১)।

এই আয়াতগুলির ব্যাখ্যা অনেক দীর্ঘ। আমরা ইহার ব্যাখ্যা করকটা প্রথম প্রশ্নের তৃতীয় অংশেও লিখিয়াছি। কিন্তু এখন আমরা সংক্ষেপে শুধুই ইহাই বলিতে চাহি যে, মানুষকে যতগুলি অঙ্গেন্দ্রিয় ও বহিরেন্দ্রিয় দেওয়া হইয়াছে বা তাহাকে যে সকল শক্তি দেওয়া হইয়াছে, ঐগুলির প্রকৃত উদ্দেশ্য খোদার মারফত, খোদার উপাসনা ও খোদার প্রেম লাভ। এই কারণেই মানুষ পৃথিবীতে সহস্র সহস্র রকমের কারবার অবলম্বন করিয়াও, খোদা ছাড়া প্রকৃত সুখ কিছুতেই পায় না। বড় ধনপতি হইয়া, বড় পদ লাভ করিয়া, বড় ব্যবসায়ী হইয়া, বড় বাদশাহী পর্যন্ত পাইয়া, বড় দার্শনিক বলিয়া অভিহিত হইয়াও সে পরিশেষে, এই সমুদয় পার্থিব বন্ধন ছাড়িয়া সীমাহীন হতাশা ও আক্ষেপ লইয়া পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করে। সর্বদা তাহার হৃদয় তাহাকে সংসারে ডুবিয়া থাকার জন্য দোষী সাব্যস্ত করিতে থাকে। তাহার চালবাজী, ধোকাবাজী এবং অবৈধ কর্মে, তাহার বিবেক কখনও তাহার সহিত একমত হয় না। বুদ্ধিমান মানুষ এই বিষয়টি এই প্রকারেও বুঝিতে পারে যে, সৃষ্টি বন্ত উহার শক্তির দ্বারা কোন উচ্চ হইতে উচ্চতর কর্ম সাধন করিতে পারে, তারপর আর অগ্রসর হইতে পারে না, সেই সর্বোচ্চ কর্মই তাহার সৃষ্টির চরম উদ্দেশ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। দৃষ্টান্ত-স্থলে, গরু মহিষের কাজ উত্তম হইতে উত্তম চাষ, পানি সেচন বা ভার বহন করা। ইহার অধিক তাহার শক্তি কিছুই প্রমাণিত হয় না। সুতরাং, গো-মহিষের জীবনের উদ্দেশ্য এই তিনি জিনিষ। ইহার অধিক কোন শক্তি উহাদের মধ্যে পাওয়া যায় না। কিন্তু আমরা যখন মানুষের শক্তি লইয়া গবেষণা করিয়া দেখি, তাহার যেসব শক্তি আছে, তন্মধ্যে সর্বোচ্চ শক্তি কী, তখন ইহাই প্রমাণিত হয় যে, মহান ও পরামর্শপ্রদ খোদার অব্বেষণ তাহার মধ্যে পাওয়া যায়। এমন কি, সে চাহে যে, খোদার প্রেমে সে এমনই বিভোর ও বিলীন হউক, যেন তাহার নিজের বলিতে কিছুই না থাকে, তাহার সবই যেন খোদার হইয়া যায়। পানাহার, নিদ্রা প্রভৃতি স্বাভাবিক ব্যাপারে অন্য প্রাণীরা তাহার সহিত বড় রকমের অংশীদার। শিল্প কাজে কোন কোন প্রাণী তাহার চাইতে অনেক অগ্রসর। যেমন মধুমক্ষিকা প্রত্যেক ফুল হইতে সারসভা আহরণ করিয়া এমন সুন্দর মধু তৈরী করে যে, আজও মানুষ এই শিল্পে সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু ঐশ্বী-মিলনের প্রেরণা, মানুষ ছাড়া অন্য কোনও প্রাণীর মধ্যে পাওয়া যায় না। সুতরাং ইহা সুস্পষ্ট যে, মানুষের বড় সাফল্য হইল খোদা-মিলনে। তাহার জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ইহাই যে, খোদার দিকে যেন তাহার হৃদয়ের কপাট খুলিয়া যায়।

মানব জীবনের উদ্দেশ্যকে লাভ করার উপায়

অবশ্য, যদি এই প্রশ্ন করা হয় যে, এই উদ্দেশ্য কেমন করিয়া কীভাবে অর্জন করা যায় এবং কী কী উপায়ে মানুষ ইহা পাইতে পারে, তবে জানা আবশ্যিক যে, সর্বাপেক্ষা বড় উপায়, যাহা এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির শর্ত, তাহা হইল

খোদাতা'লাকে সঠিকরূপে চিনিতে হইবে এবং সত্য-খোদার উপর ঈমান আনিতে হইবে। কারণ যদি প্রথম পদক্ষেপই ভুল হয় এবং যদি কোন ব্যক্তি, দ্রষ্টান্তস্থলে, কোন পক্ষী, ভূচর বা গ্রহ কিংবা কোন মানুষের সন্তানকে খোদা সাব্যস্ত করিয়া বসে, তবে দ্বিতীয় পদক্ষেপে যে সে সঠিক পথে চলিবে উহার আশা কোথায়? প্রকৃত খোদা তাঁহার অব্বেষণকারীদেরকে সাহায্য করেন। কিন্তু মৃত কী ভাবে মৃতকে সাহায্য করিবে? এ সম্বন্ধে আল্লাহু জাল্লা শানুভু অতি চমৎকার উপমা দিয়াছেন এবং তাহা এই :

لَهُ دُغْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ
لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطٌ كَفَيْهِ
إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغُ فَاهُ وَمَا هُوَ بِالْغِيَّبِ وَمَا دُعَاءُ
الْكُفَّارِ إِلَّا فِي ضَلَالٍ - (الرعد: ١٥)

অর্থাৎ, “প্রার্থনার উপযুক্ত প্রকৃত খোদা তিনি, যিনি সর্বশক্তিমান। যে সকল লোক তাঁহাকে ছাড়া অন্যদেরকে ডাকে (উপাসনা করে), তাহারা ঐ সকল লোকদেরকে কোনও প্রত্যুত্তর দিতে পারে না। তাহাদের দ্রষ্টান্ত যেন কেহ পানির দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া বলেং পানি, আমার মুখে এস। ইহাতে কি পানি তাহার মুখে প্রবেশ করিবে? কখনও না। সুতরাং যাহারা প্রকৃত খোদা সম্পর্কে অনবহিত, তাহাদের সব দোয়া বিফল” (১৩:১৫)।

দ্বিতীয় উপায় : খোদাতা'লার সেই রূপ ও সৌন্দর্য সম্বন্ধে অবহিত হওয়া, যাহা গুণের চরমত্ব হিসাবে তাঁহার মধ্যে বিদ্যমান। কারণ, সৌন্দর্য এমন এক জিনিস, যাহার দিকে হৃদয় স্বতঃই আকৃষ্ট হয় এবং তদ্দর্শনে স্বভাবতই প্রেমের সৃষ্টি হয়। বস্তুতঃ মহান পরাম্পর স্বষ্টার সৌন্দর্য হইতেছে তাঁহার একত্ব, গৌরব এবং গুণবলী। যেমন, খোদাতা'লা কুরআনে বলেন :

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ - أَللَّهُ الصَّمَدُ - لَمْ يَلِدْ وَلَمْ
يُوْلَدْ - وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ - (الإخلاص: ٣-٥)

অর্থাৎ, “খোদা তাঁহার সন্তা, গুণ ও মহিমায় এক-অদ্বিতীয়। কেহ তাঁহার অংশীদার নহে। সকলেই তাঁহার মুখাপেক্ষী। অগু-পরমাণু পর্যন্ত তাঁহার নিকট হইতে জীবন প্রাপ্ত হয়। তিনি সকল বস্তুর জন্য কল্যাণের উৎস এবং তিনি কাহারও কল্যাণে অভিষিক্ত নহেন। তিনি না কাহারও পুত্র, না কাহারও পিতা। তাহা সন্তুষ্ট বা কীরূপে? কেননা, তাঁহার কোনও সম-সন্তা নাই” (১১২:২-৫)।

কুরআন বার বার খোদার কথা উপস্থিত করিয়া এবং তাহার গৌরব ও মহিমা প্রদর্শন করিয়া স্মরণ করাইয়া দেয় যে, দেখ! এহেন খোদাই হৃদয়ের প্রিয়তম হইতে পারেন। মৃত, কমজোর, কম দয়াবান বা কম শক্তি ও মহিমার অধিকারী কেহ হৃদয়ের কাম্য হইতে পারে না।

তৃতীয় উপায়, যাহা মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য দ্বিতীয় পর্যায়ের সোপান, তাহা হইতেছে খোদাতা'লার অনুগ্রহের সহিত পরিচয়। কারণ, দুইটি জিনিস প্রেমের প্রেরণা দেয়, যথা-সৌন্দর্য এবং অনুগ্রহ। খোদাতা'লার অনুগ্রহ প্রকাশক গুণাবলীর সার কথা সূরা ফাতিহায় বর্ণিত হইয়াছে। যেমন, তিনি বলেন :

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ. مَلِكُ يَوْمِ الدِّينِ

অর্থাৎ সকল প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি জগৎ সমূহের প্রতিপালক ; অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ; বিচার দিবসের মালিক।

কারণ, সুস্পষ্টতঃ পূর্ণ অনুগ্রহ ইহাতেই নিহিত যে, খোদাতা'লা তাহার বান্দাগণকে একেবারে অনস্তিত্ব হইতে সৃষ্টি করেন। অতঃপর সদা তাহাদিগকে প্রতিপালন করিতে থাকেন এবং তিনি স্বয়ং প্রত্যেক বস্তুর আশ্রয়। তারপর, তাহার সর্বপ্রকার অনুগ্রহ তাহার বান্দাগণের জন্য প্রকাশিত হয় এবং তাহার অনুগ্রহ সীমাহীন এবং অগণিত (১৪২-৪)। এই প্রকার অনুগ্রহের কথা খোদাতা'লা বার বার স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। যেমন, আরও এক স্থানে বলেনঃ

وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُخْصُوهَا. - (ابرٰهিম: ৩৫)

অর্থাৎ, “তোমরা খোদাতা'লার নেয়ামতসমূহ গণনা করিতে চাহিলে, কখনও তাহা পারিবে না” (১৪:৩৫)।

চতুর্থ উপায়, খোদাতা'লা মানুষের জীবনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য ‘দোয়া’কেই নির্ধারিত করিয়াছেন। যেমন, তিনি বলেনঃ

أَذْعُونَى أَسْتَجِبْ لَكُمْ - (المؤمن: ৭৫)

অর্থাৎ, “তোমরা দোয়া কর, আমি করুল করিব” (৪০:৬১)। তিনি বার বার দোয়ার দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন, যাহাতে মানুষ আপন শক্তি দ্বারা নহে, বরং খোদাকে খোদার শক্তির দ্বারা লাভ করিতে পারে।

পঞ্চম উপায়, জীবনের মূল উদ্দেশ্য লাভের জন্য খোদাতা'লা মুজাহিদা (চেষ্টা-প্রচেষ্টা) নির্ধারণ করিয়াছেন। অর্থাৎ, আপন ধন খোদার পথে ব্যয়ের দ্বারা, নিজ শক্তি খোদার পথে নিয়োগের দ্বারা, স্বীয় প্রাণ খোদার পথে উৎসর্গের দ্বারা এবং নিজ বুদ্ধি খোদার পথে পরিচালনার দ্বারা তাহাকে অন্তেষ্টণ করিবে। যেমন, তিনি বলেনঃ

وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. رَتَبَةٌ (٤١)

وَمِنَارَ زَقْنُمْ يُنْفِقُونَ - (البقرة: ٤٤)

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِي نَعْمَلَاتِهِمْ سُبْلَنَا - (العنكبوت: ٧٠)

অর্থাৎ, “তোমাদের ধন, তোমাদের প্রাণ এবং তোমাদের আত্মা উহার যাবতীয় শক্তিসহ খোদার পথে উৎসর্গ কর এবং যাহা কিছু আমরা বুদ্ধি, জ্ঞান, বিচার-শক্তি, নৈপুণ্য ইত্যাদি তোমাদিগকে দিয়াছি, তৎসমুদয়ই খোদার পথে নিয়োগ কর। যাহারা আমাদের পথে সর্বপ্রকার চেষ্টা করে, আমরা তাহাদিগকে আমাদের পথসমূহ দেখাইয়া থাকি(৯৪১, ২৪৪, ২৯৪৭০)।”

ষষ্ঠ উপায়, জীবনের মূল উদ্দেশ্য লাভের জন্য এন্টেকামতের (ধৈর্য ও স্তুর্য) উল্লেখ করা হইয়াছে। অর্থাৎ, এই পথে শ্রান্ত, অক্ষম ও ক্লান্ত হইবে না এবং পরীক্ষাকে ভয় করিবে না। যেমন, আল্লাহতালা বলেনঃ

إِنَّ الَّذِينَ قَاتَلُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ أَسْتَقَامُوا تَنَزَّلُ

عَلَيْهِمُ التَّلَاقَةُ أَلَا تَحَافُوا وَلَا تَخْرُنُوا وَأَبْشِرُوا

بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ - نَحْنُ أَوْلَيُوكُمْ

فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا دِرْجَاتٍ - (الْحُمَّ: ٣٢-٣١)

অর্থাৎ, ‘যাহারা বলে, আমাদের প্রভু আল্লাহ এবং সব মিথ্যা খোদা হইতে পৃথক হইয়া এন্টেকামত অবলম্বন করে, অর্থাৎ নানা প্রকার পরীক্ষায় ও বিপদে অবিচল থাকে, তাহাদের উপর ফেরেশ্তাগণ অবতীর্ণ হয় (এই বাণী লইয়া) যে, ‘তোমরা ভয় করিবে না এবং চিন্তাযুক্ত হইবে না বরং আনন্দে উৎফুল্ল হও যে, তোমরা সেই খুশীর উত্তরাধিকারী হইয়াছ, যাহার প্রতিশ্রুতি তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল। আমরা ইহকালের জীবনে এবং পরলোকেও তোমাদের বন্ধু’ (৪১:৩১-৩২)। এখানে এই কথাগুলিতে এই ইঙ্গিত রয়িয়াছে যে, এন্টেকামতের দ্বারা খোদার সন্তুষ্টি লাভ হয়। সত্য কথা, কারামত(অলৌকিক শক্তি) হইতে এন্টেকামত বড়। পূর্ণ এন্টেকামত এই যে, চতুর্দিক হইতে বিপদ-আপদে অভিভূত হইয়া এবং খোদার পথে ধন, প্রাণ ও মান-সন্ত্রমকে বিপদঘন্ট পাইয়া, সান্ত্বনার কোন কিছু না দেখিয়া; এমন কি, খোদাতালার পক্ষ হইতে সান্ত্বনাদানকারী কাশ্ফ, স্বপ্ন ও এলহাম-প্রাণ্তি পরীক্ষাস্বরূপ বন্ধ হইয়া যাওয়ায় ভীষণ ভয়ের অবস্থায় পড়িয়াও কাপুরুষতা দেখাইবে না: ভীরু লোকের ন্যায়

পিছনে হচ্চিবে না এবং বিশ্বস্ততার মধ্যে কোন ক্রটি ঘটিতে দিবে না। সত্যতা, নিষ্ঠা ও ধৈর্যে কোন বিচ্ছিতির স্পর্শও লাগিতে দিবে না; অবমাননায় আনন্দিত হইবে, মৃত্যুতে সন্তুষ্ট থাকিবে এবং দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য কোন বন্ধুর অপেক্ষা করিবে না যে, সে সাহায্য করিবে। তখন খোদার নিকট সুসংবাদও চাহিবে না যে, সময় সংকটাপন্ন হইয়াছে। সম্পূর্ণ একাকী, দুর্বল অবস্থায় সান্ত্বনা না পাওয়া সত্ত্বেও খাড়া থাকিবে। যাহা হওয়ার হউক বলিয়া ঘাড় সম্মুখে পাতিয়া দিবে। ঐশ্বী বিচার ও মীমাংসায় কোন আক্ষেপ করিবে না। কখনও অস্থিরতা প্রদর্শন এবং হা-হৃতাশ করিবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না পরীক্ষার দাবী সমাপ্ত হয়। ইহাই এন্টেকামত যদ্বারা খোদাকে পাওয়া যায়। ইহাই সেই জিনিস, যাহার সৌরভ রসূল, নবী, সিদ্ধীক এবং শহীদাননের মৃত্তিকা হইতে এখনও আসিতেছে। ইহারই দিকে আল্লাহ জাল্লা শানুর এই দোয়ায় ইঙ্গিত করিয়াছেন :

إِهْبِنَا الْقَرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ - صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَنَتْ عَيْنَيهِمْ [الْفَاتِحَة: ٨-٩]

অর্থাৎ, “হে আমাদের খোদা! আমাদিগকে এন্টেকামতের (অবিচলতা বা দৃঢ়তার) পথ দেখাও। সেই পথ, যে পথে তোমার পুরস্কার ও অনুগ্রহ বিতরণ করা হয় এবং তুমি সন্তুষ্ট হও” (১:৬-৭)। ইহারই দিকে আরও এক আয়াতে এই ইঙ্গিত করেন :

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبَرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ . (الاعراف: ١٨٧)

“প্রভু, এই বিপদে আমাদের হৃদয়ে সেই প্রশান্তি অবতীর্ণ কর, যাহার ফলে ধৈর্য জন্মে এবং এমন কর, যেন আমাদের মৃত্যু ‘ইসলামের উপর হয়’ (৭:১২৭)। জানা প্রয়োজন যে, দুঃখ ও বিপদের সময় খোদাতা’লা তাঁহার প্রিয় বান্দাগণের হৃদয়ে এক আলোক অবতীর্ণ করেন, যদ্বারা তাহারা শক্তি লাভ করিয়া অত্যন্ত শান্তভাবে বিপদের সম্মুখীন হয় এবং তাঁহার পথে তাহাদের পায়ে যে সকল শিকল জড়াইয়া গিয়াছিল, ঈমানের সুধায় উহাদেরকে তাহারা চুম্বন দেয়। যখন খোদাপ্রাপ্ত মানুষের উপর বিপদাবলী অবতীর্ণ হয় এবং মৃত্যুর লক্ষণাবলী প্রকাশিত হয়, তখন সে আপন দয়াময় প্রভুর সহিত অনাবশ্যক বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া প্রার্থনা করে না যে, তাহাকে এই বিপদ হইতে বাঁচান হউক। কারণ, তখন নিরাপত্তার জন্য দোয়ায় জোর দেওয়া খোদাতা’লার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার এবং ঐকান্তিকতার বিরুদ্ধাচরণ করার নামান্তর। বরং সত্যিকার প্রেমিক বিপদ অবতীর্ণ হইলে, আরও সম্মুখে অগ্রসর হয় এবং এহেন সময়ে প্রাণকে তুচ্ছ জ্ঞান করে এবং প্রাণের মায়াকে বিদ্য দিয়া স্বীয় প্রভুর সন্তুষ্টির সম্পূর্ণ অধীন হইয়া যায় এবং তাঁহার সন্তুষ্টি ভিক্ষা করে। ইহারই সম্বন্ধে আল্লাহতা’লা বলিয়াছেন :

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِئِ نَفْسَهُ أَبْتِقاءً مَرْضَاتٍ

اللَّهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ - (البَيْتَة: ٢٠٠)

অর্থাৎ, “খোদার প্রিয় বান্দা তাহার প্রাণ খোদার পথে বিক্রয় করে এবং উহার পরিবর্তে খোদাতা’লার সন্তুষ্টি ক্রয় করে। ইহারাই বিশেষ অনুগ্রহের পাত্র” (২৪২০৮)। বস্তুতঃ, যে এস্তেকামত দ্বারা খোদাকে পাওয়া যায়, উহার প্রাণ ইহাই, যাহা বর্ণিত হইল। যে বুঝিতে চাহে, বুঝিয়া লওক।

সপ্তম উপায়, জীবনের মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সাধু-সঙ্গ এবং তাহাদের পূর্ণ নমুনা দর্শন করা আবশ্যিক। সুতরাং নবীগণের প্রয়োজনীয়তার মধ্য হইতে এক প্রয়োজন ইহাই যে, মানুষ স্বভাবতঃ পূর্ণ আদর্শের মুখাপেক্ষী। মানুষ নবীদের মধ্যে সেই আদর্শ দেখিতে পায় ও অনুসরণের সুযোগ পায়। পূর্ণ আদর্শ আগ্রহ বৃদ্ধি করে এবং সাহস বাড়ায়। যে আদর্শের অনুবর্তী হয় না, সে শিথিল এবং পথভ্রষ্ট হয়। ইহার প্রতি আল্লাহতা’লা এই আয়াতে সংকেত দিয়াছেন :

كُوئْنَوْمَ الصِّدِّيقِينَ - (توبه : ١١٧)
صِرَاطًا أَلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ - (النَّافِعَة : ٧)

অর্থাৎ, “তোমরা তাহাদের সঙ্গ অবলম্বন কর, যাহারা সাধু”(১৪১১৯)। তাহাদের চলার পথ হইতে শিক্ষা গ্রহণ কর, যাহাদের উপরে তোমাদের পূর্বে অনুগ্রহ করা হইয়াছে” (১৪৭)।

অষ্টম উপায়, খোদাতা’লার তরফ হইতে কাশ্ফ (জাগ্রত অবস্থায় দিব্য-দর্শন), পবিত্র এলহাম এবং সত্য-স্পুর্ণ লাভ। যেহেতু খোদাতা’লার দিকে যাত্রা করিতে একান্ত সুস্কার্তি-সূক্ষ্ম পথে চলিতে হয় এবং তৎসঙ্গে নানা প্রকার বিপদাপদ ও দুঃখ লাগিয়াই থাকে এবং ইহাও সম্ভবপর যে, মানুষ এই অপরিচিত পথে চলিতে ভুল করে বা নৈরাশ্য আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ফেলে এবং সে সম্মুখে চলা ছাড়িয়া দেয়, সেহেতু খোদাতা’লা আপন কর্মণায় চাহেন যে, তিনি এই যাত্রায় তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া যান এবং তাহার মনোরঞ্জন করেন, এবং তাহার সাহস ও মনোবলের মেরুদণ্ডকে সোজা ও দৃঢ় রাখেন যেন তাহার আগ্রহ বর্ধিত হয়। সুতরাং তাহার চিরাচরিত নিয়ম এই পথের পথিকগণের সহিত ইহাই যে, তিনি সময়ে সময়ে তাহার কথা ও এল্হাম দ্বারা তাহাদিগকে সান্ত্বনা দেন এবং তাহাদের নিকট প্রমাণ করেন যে, তিনি তাহাদের সঙ্গে আছেন। তখন তাহারা শক্তি লাভ করিয়া মহা তেজে এই পথ অতিক্রম করিতে থাকে। দৃষ্টান্ত স্থলে, এ সম্পর্কে তিনি বলেনঃ

لَهُمُ الْبَشَرُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ - (بুরাক : ৭০)

“তাহাদের জন্য ইহলোকে ও পরলোকে সুসংবাদ (১০৪৬৫)।”

এই প্রকারের আরও অনেক উপায় আছে, যাহা কুরআন শরীফে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রসঙ্গ দীর্ঘ হওয়ার আশংকায়, আমরা তাহা লইয়া আলোচনা করিতে পারিতেছি না।

চতুর্থ প্রশ্ন

ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনে কর্মের অর্থাৎ^১ ধর্মীয় বিধিনিষেধ বা শরীয়ত পালনের ফলাফল কী?

এই প্রশ্নের উত্তর উহাই, যাহা ইতিপূর্বে আমরা বর্ণনা করিয়াছি। খোদার প্রকৃত ও পরিপূর্ণ শরীয়তের যে ক্রিয়া ইহলোকে মানুষের হৃদয়ের উপর হয়, তাহা এই যে, উহা তাহাকে বন্য বর্বর অবস্থা হইতে মানুষ করে। তারপর মানুষ হইতে তাহাকে চরিত্রবান মানুষে উন্নীত করে। তারপর চরিত্রবান মানুষ হইতে তাহাকে খোদাপ্রাণ মানুষে পরিণত করে। তদুপরি, এই জীবনে সঠিক শরীয়তের বিধান ব্যবহারিক জীবনে পালনের একটি ফল এই হয় যে, প্রকৃত শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত মানুষের প্রভাবে মানব জাতি ক্রমে ক্রমে তাহাদের অধিকারসমূহ বুঝিতে পারে এবং ন্যায়পরায়ণতা, দয়া এবং সহানুভূতির বৃত্তিগুলিকে স্ব স্ব স্থানে সঠিকভাবে ব্যবহারে তৎপর হয়। খোদা তাহাকে জ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান, ধন-সম্পদ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য যাহা কিছু দিয়াছেন, তিনি সব মানুষকে তাহাদের অবস্থা অনুযায়ী ঐ সকল নেয়ামত বিতরণ করেন। এহেন মানুষ সমগ্র মানব জাতির উপর সূর্যের ন্যায় স্বীয় আলোক বিস্তার করেন এবং চাঁদের ন্যায় পরমাত্মা হইতে আলোক প্রাণ হইয়া সেই আলো অন্যদের নিকট পৌছান। এহেন মানুষ দিবসের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া সাধুতার ও কল্যাণের পথ লোকদিগকে প্রদর্শন করেন। এহেন মানুষ রাত্রির ন্যায় প্রত্যেক দুর্বলের লজ্জা আবৃত করেন। তিনি ক্লান্ত ও শ্রান্তদিগকে আরাম পৌছান। তিনি আকাশের ন্যায় প্রত্যেক অভাবী ব্যক্তিকে আপন ছায়ার নীচে স্থান দেন এবং যথাসময়ে আপন অনুগ্রহ-বারি বর্ষণ করেন। তিনি মাটির ন্যায় চরম বিনয়ী হইয়া প্রত্যেকের আরামের জন্য বিছানার মত হইয়া যান এবং সকলকেই তাহার সৌজন্যের আঁচলে গ্রহণ করেন এবং নানা প্রকার আধ্যাত্মিক ফল তাহাদের জন্য পেশ করেন। সুতরাং ইহাই পরিপূর্ণ শরীয়তের প্রভাব। পরিপূর্ণ শরীয়তের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া মানুষ আল্লাহর হক এবং বান্দার হক পূর্ণ মাত্রায় পূরণ করে, খোদার মধ্যে বিলীন হয় এবং সৃষ্টির সত্ত্বিকার সেবক হইয়া যায়। ইহজীবনের উপর ইহাই শরীয়তের বিধি-বিধান প্রতিপালনের ক্রিয়া।

ইহলৌকিক জীবনের পর ইহার যে ক্রিয়া, তাহা হইল সেই দিন খোদার আধ্যাত্মিক মিলন প্রকাশ্য সাক্ষাতের ও নৈকট্যের আকারে তাহার গোচরীভূত হইবে। ঈমান ও আমলে সালেহ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া সে খোদার প্রেমে সৃষ্ট

জীবের যে সেবা করিয়াছিল তাহা বেহেশ্তের বৃক্ষরাজি ও নদ-নদীসমূহে
রূপায়িত হইয়া দেখা দিবে। এ সম্পর্কে খোদাতালার বাণী এই :

وَالشَّمْسِ وَضُحْنَهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَمَّا وَالنَّهَارِ إِذَا
جَلَّمَا وَالْأَيَّلِ إِذَا يَغْشِهَا وَالسَّمَاءَ وَمَا بَنَمَا
وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَنَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّهَا فَالْعَمَّا
نُجُورَهَا وَتَقْوِهَا لَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا وَقَدْ خَابَ
مَنْ دَسَّهَا كَذَبَثْ شَمُودٌ يَطْغُوْهَا إِذَا ثَبَعَتْ
أَشْفَهَهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَافَةً اللَّهُ وَسَقِيهَا
فَلَذَّ بُؤْهُ فَعَقَرُوهَا لَهُ قَدْ مَدَرَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ يَدْنِيْهِمْ
فَسَوَّهَا وَلَا يَخَافُ عَقِيْهَا (الشمس: ١٤-٢)

অর্থাৎ, “কসম সূর্যের এবং উহার কিরণের; এবং কসম চন্দ্রের, যখন উহা
সূর্যের অনুগমন করে, অর্থাৎ সূর্য হইতে আলোক প্রহণ করে, অতঃপর সূর্যের
ন্যায় অন্যদের নিকট আলোক পৌছায়; এবং কসম দিনের, যখন উহা সূর্যের
উজ্জ্বলতাকে দেখায় এবং পথ-ঘাটকে স্পষ্ট করিয়া দেয়; এবং কসম রাত্রির, যখন
উহা অঙ্ককার করে এবং সকলকে নিজ অঙ্ককারের আঁচলে ঢাকিয়া লয় এবং
কসম আকাশের এবং সেই মূখ্য কারণের, যে জন্য ইহার সৃষ্টি; এবং কসম
পৃথিবীর এবং সেই মূখ্য উদ্দেশ্যের, যে জন্য যমীন এই প্রকার বিছানা হিসাবে
গঠিত হইয়াছে; এবং কসম আত্মার এবং আত্মার ঐ সকল উৎকৃষ্ট গুণাবলীর,
যাহা ইহাকে সকল বস্তুর সহিত সমান করিয়া দিয়াছে। অর্থাৎ, ঐ সব উৎকর্ষতা,
যাহা বিভিন্ন আকারে ঐ সব জিনিসের মধ্যে পাওয়া যায়, পরিপূর্ণ মানুষের আত্মা
সেই সব কিছুই এককভাবে নিজের মধ্যে ধারণ করে; এবং ঐ সকল জিনিষ
পৃথক পৃথকভাবে যেরূপ মানব জাতির খেদমত করিতেছে, পরিপূর্ণ মানুষ এই
সব সেবা একা করিতেছে, যেরূপ আমি এখনই লিখিয়া আসিয়াছি। তারপর
বলেন, সেই ব্যক্তি পরিত্রাণ পাইয়াছে এবং মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছে, যে এই
প্রকারে নিজ আত্মাকে শুন্দ করিয়াছে। অর্থাৎ খোদার মধ্যে বিলীন হইয়া সে সূর্য,
চন্দ্র এবং পৃথিবী প্রভৃতির ন্যায় খোদার সৃষ্টির সেবক হইয়াছে” (৯১:২-১৬)।

স্মরণ রাখিও যে, জীবন বলিতে অনন্ত জীবনকে বুঝায় যাহা ভবিষ্যতে পরিপূর্ণ মানুষ প্রাপ্ত হইবেন। ইহা এই কথার প্রতি ইংগিত করিতেছে যে, ব্যবহারিক শরীয়তের ফল পরলোকে অনন্ত জীবন লাভ, যাহা খোদার নৈকট্যের খাদ্যে সর্বদা কায়েম থাকিবে।

অতঃপর বলেনঃ “সেই মানুষ ধৰ্মস হইয়াছে এবং জীবনে নিরাশ হইয়াছে, যে তাহার আত্মাকে মাটিতে মিশাইয়াছে”। যে সকল উৎকর্ষতা অর্জনের যোগ্যতা তাহাকে দেওয়া হইয়াছিল, সে ঐ সকল উৎকর্ষতা লাভ করে নাই এবং পচা-গলিত জীবন যাপন করিয়া প্রত্যাগমন করিয়াছে।

তারপর দৃষ্টান্তস্থলে বলেন, “সেই দুর্ভাগার কাহিনী, সামুদ্রের কাহিনীর অনুরূপ, যাহারা সেই উন্নীকে আহত করিয়াছিল, যাহা খোদার উন্নী বলিয়া কথিত হইত এবং তাহার জন্য নির্দিষ্ট প্রস্রবণ হইতে পানি পান করা বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। সেরূপ ঐ ব্যক্তিও প্রকৃতই খোদার উন্নীকে আহত করিয়াছিল এবং উহাকে উহার প্রস্রবণ হইতে বঞ্চিত করিয়াছিল”। ইহা এই কথার প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে যে, মানুষের আত্মা খোদার উন্নী, যাহার উপর তিনি আরোহণ করেন। অর্থাৎ, মানুষের হৃদয় ঐশ্বী জ্যোতির্বিকাশের স্থান এবং এই উন্নীর পানি ঐশ্বী-প্রেম ও জ্ঞান, যদ্বারা উহা জীবিত থাকে। তারপর বলেনঃ “সামুদ্র জাতি যখন উন্নীকে আহত করিল এবং উহাকে পানি হইতে বঞ্চিত করিল, তখন তাহাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ হইল এবং খোদাতা’লা এ কথার কোনই পরওয়া করিলেন না যে, তাহাদের মৃত্যুর পর তাহাদের সন্তানগণের এবং বিধবাগণের কী অবস্থা হইবে”। সুতরাং অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি ঐ উন্নী, অর্থাৎ, আত্মাকে আহত করে এবং উহাকে উন্নতির চরম পর্যায়ে পৌছাইতে চাহে না এবং উহার পানি পান রোধ করে, সে-ও ধৰ্মস হইবে।

কুরআন শরীফে বর্ণিত বিভিন্ন বস্তুর কসম (দিব্য) তত্ত্ব

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, খোদা কর্তৃক সূর্য, চন্দ্র প্রভৃতির কসম করার মধ্যে এক গভীর সূক্ষ্ম-তত্ত্ব নিহিত আছে। এ সম্বন্ধে আমাদের অধিকাংশ বিরুদ্ধবাদীরা অজ্ঞতাবশতঃ আপত্তি উথাপন করে যে, খোদার কসমের কী প্রয়োজন ছিল? তিনি সৃষ্টির কসম করিলেন কেন? কিন্তু যেহেতু তাহাদের বুদ্ধি পার্থিব, ঐশ্বী নহে, সেই জন্য তাহারা প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে পারে নাই। অতএব জানা আবশ্যিক, কসম করিবার মূল উদ্দেশ্য হইল কসমকারী তাহার দাবীর সমর্থনে এক সাক্ষ্য উপস্থিত করিতে চাহে। কারণ, যে ব্যক্তির দাবীর অন্য কোন সাক্ষী থাকে না, সে সাক্ষীর পরিবর্তে খোদাতা’লার কসম এজন্য করে যে, খোদা হইলেন ‘আলেমুল গায়েব’ (অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা) এবং প্রত্যেক মোকদ্দমায় তিনিই প্রথম সাক্ষী। অন্য কথায়, সে খোদার সাক্ষ্য এই জন্য উপস্থিত করে যে, এই কসমের পর খোদাতা’লা চুপ থাকিলে এবং তাহার উপর শাস্তি অবতীর্ণ না করিলে,

প্রকারান্তরে তিনি ঐ ব্যক্তির বিবৃতিকে সাক্ষীদের ন্যায় সমর্থন করিলেন। সেই জন্য কোন সৃষ্টের জন্য অন্য কোন সৃষ্ট বস্তুর কসম খাওয়া উচিত নহে। কারণ কোন প্রাণীই আলেমুল গায়ের নহে এবং মিথ্যা কসম করায় শান্তি দিতেও সে পারে না। কিন্তু আলোচনাধীন আয়াতগুলিতে খোদার কসম করা মানুষের কসমের মত নহে। বরং উহার দ্বারা খোদাতা'লার বিধানের দুই প্রকার ক্রিয়ার প্রকাশ ঘটে :- এক, প্রত্যক্ষ ক্রিয়া, যাহা সকলেই বুঝিতে পারে এবং যাহাতে কাহারও মতবিরোধ নাই। দ্বিতীয়, ঐ ক্রিয়া, যাহা প্রচন্ন বা পরোক্ষ যাহা যুক্তি প্রয়োগে বোধগম্য হয়। এই ক্ষেত্রে মানুষ ভুল করে এবং পরম্পরের মধ্যে মতানৈক্যও হয়। সুতরাং খোদাতা'লা তাঁহার প্রত্যক্ষ ক্রিয়ার সাক্ষ্য উপস্থিত করিয়া উহার মাধ্যমে তাঁহার প্রচন্ন ক্রিয়াকে মানুষের নিকট প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন।

বস্তুতঃ, ইহা সুস্পষ্ট যে, সূর্য, চন্দ্র, দিবা, রাত্রি, আকাশ ও পৃথিবীতে প্রকৃতপক্ষে ঐ সকল বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়, যাহার বর্ণনা আমরা করিয়া আসিলাম। কিন্তু ঐ সকল বৈশিষ্ট্য যে বিবেকবান মানুষের আত্মায়ও প্রচন্ন আছে, সে সম্বন্ধে সকলে অবগত নহে। সুতরাং খোদাতা'লা তাঁহার প্রচন্ন কার্যাবলীকে বুঝাইবার জন্য তাঁহার প্রত্যক্ষ কার্যাবলীকে সাক্ষীস্বরূপ পেশ করিয়াছেন। অন্য কথায়, তিনি বলেন :- যদি তাহাদের ঐ বৈশিষ্ট্যগুলি সম্বন্ধে সন্দেহ হয়, যাহা বিবেকবান মানুষের আত্মায়ও পাওয়া যায়, তবে চন্দ্র, সূর্য, প্রভৃতি সম্বন্ধে চিন্তা কর। উহাদের মধ্যে প্রত্যক্ষরূপে ঐ বৈশিষ্ট্যগুলি বিদ্যমান এবং তোমরা ইহাও জান যে, মানুষ এক ক্ষুদ্র-জগৎ। তাহার আত্মায় সমগ্র জগতের নকশা সমষ্টিগতভাবে নিহিত। অতএব, যখন ইহা প্রমাণিত হয় যে, মহা জগতের প্রধান প্রধান সত্তাগুলিতে ঐ সব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান আছে এবং এই প্রকারে সৃষ্ট জীবের নিকট কল্যাণ পৌছাইতেছে, তখন উহাদের সকলের চাইতে বড় বলিয়া কথিত এবং উচ্চ পর্যায়ের সৃষ্ট মানুষ কেন ঐ সব বৈশিষ্ট্য হইতে রিঙ্গ ও বঞ্চিত থাকিবে? কখনও নহে। বরং তাহার মধ্যে সুর্যের ন্যায় জ্ঞান ও যুক্তির আলোক আছে, যদ্বারা সে সমগ্র পৃথিবীকে আলোকিত করিতে পারে; এবং চন্দ্রের ন্যায় সে পরাম্পর স্রষ্টা হইতে কাশ্ফ, এলাহাম ও ওহীর আলোক প্রাপ্ত হইয়া অন্যদের নিকট পর্যন্ত সেই আলোক পৌছাইতে পারে, যাহারা এখন পর্যন্ত মানবীয় গুণাবলীর পূর্ণতা লাভ করিতে পারে নাই। অতঃপর কীরূপে বলিতে পার যে, নবুওয়ত অসত্য এবং রেসালত, শরীয়ত এবং ঐশ্বীগত মানুষের প্রতারণা ও স্বার্থপরতাপ্রসূত? আরও দেখ, কি প্রকারে দিবালোকে সব রাস্তাঘাট উজ্জ্বল হয়। উঁচু নিচু সব দেখা যায়। এইভাবে কামেল ইন্সান (পরিপূর্ণ মানব) আধ্যাত্মিক জ্যোতির দিবসস্বরূপ। তাহার আগমনে সব পথ-ঘাট দৃশ্যমান হয়। কোথায় কোন্দিকে সত্য পথ তাহা তিনি দেখাইয়া দেন। কারণ তিনিই সত্য ও সত্যবাদিতার দিবালোক। তারপর, ইহাও দেখিতে পাও যে, রাত্রি কি প্রকারে ক্লান্ত-শ্রান্তকে আশ্রয় দেয়। সারাদিনের পরিশ্রান্ত ক্লান্ত মজুর রাত্রির স্নেহ-অঙ্কে সুখে ঘুমায় এবং পরিশ্রম হইতে আরাম পায়। রাত্রি প্রত্যেকের জন্য

আবরণস্থরূপ। সেইরূপ, খোদার কামেল বান্দাগণ বিশ্ববাসীকে আরাম দেওয়ার জন্য আসেন। তাহারা খোদা হইতে ওহী এলহাম পাইয়া বুদ্ধিমানদিগকে প্রাণান্তকর ক্লেশ হইতে আরাম দেন। তাহাদের কল্যাণে বড় বড়-সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও রহস্যের সমাধান সহজে হয়। সেইভাবে, খোদার ওহী, মানুষের যুক্তির ক্রটিকে ঢাকিয়া দেয়, যেমন রাত্রি সকল বস্তুর উপর স্বীয় আঁধার-আবরণ টানিয়া দিয়া উহার অপবিত্র দোষ-ক্রটি জগতের নিকট প্রকাশিত হইতে দেয় না। কারণ বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ ওহীর আলোক প্রাপ্ত হইয়া নিজেদের অভ্যন্তরস্থ ভ্রান্তির সংশোধন করে এবং খোদার পবিত্র এলহামের বরকতে নিজদিগকে নগ্নতা হইতে রক্ষা করে। এই কারণে ইসলামের কোন দার্শনিক প্লেটোর ন্যায় কোন প্রতিমার সমক্ষে মোরগ বলি দেয় নাই। প্লেটো এলহামের আলোক হইতে বঞ্চিত ছিল এজন্য সে বিভ্রান্তিতে পড়িয়াছিল। সে বড় দার্শনিক বলিয়া অভিহিত হইয়াও বোকার মত এই ঘৃণিত কার্যটি করিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু ইসলামের দার্শনিকগণকে এমন অপবিত্র ও নির্বোধকাণ্ড হইতে আমাদের সৈয়দ ও মওলা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অনুবর্তিতা রক্ষা করিয়াছে। এখন দেখ, এলহাম কি প্রকারে রাত্রির ন্যায় বুদ্ধিমানগণের ক্রটি ঢাকিয়া দেয়।

আপনারা ইহা জানেন যে, খোদার কামেল বান্দাগণ সুবিশাল আকাশের ন্যায়, প্রত্যেক তাপ-ক্লিষ্ট ব্যক্তিকে ছায়া দান করেন। বিশেষতঃ সেই মহামহিম স্রষ্টার নবীগণ ও এলহামপ্রাপ্তগণ সাধারণতঃ আকাশের ন্যায় কল্যাণ বর্ষণ করেন। তেমনইভাবে ভূমির স্বভাবও তাঁহাদের মধ্যে থাকে। তাঁহাদের পরম পবিত্র আত্মা হইতে নানা প্রকার উচ্চমার্গের জ্ঞান-বিজ্ঞানের বৃক্ষ জন্মায়। সেগুলির ছায়া ও ফুল-ফল দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়। সুতরাং, আমাদের সম্মুখস্থ এই উন্মুক্ত প্রাকৃতিক বিধান সেই প্রচন্ড বিধানের এক সাক্ষী, যাহার সাক্ষ্য কসমের আকারে খোদাতা'লা উল্লিখিত আয়াতগুলিতে উপস্থাপিত করিয়াছেন। সুতরাং, দেখ ইহা কেমন জ্ঞানগর্ত বাক্য, যাহা কুরআন শরীফে পাওয়া যায়। ইহা তাহারই মুখ হইতে নিঃস্ত, যিনি এক নিরক্ষর মরুবাসী (সাঃ) ছিলেন। ইহা খোদার (কথা) না হইলে সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এবং শিক্ষিত বলিয়া অভিহিত ব্যক্তিগণ ইহার সূক্ষ্ম-তত্ত্ব বুঝিতে অক্ষম হইয়া ইহাকে এভাবে আপত্তির আকারে দেখিত না। ইহা নিয়মের কথা যে, মানুষ যখন কোন কথা কোন দিক দিয়া তাহার সীমিত বুদ্ধির দ্বারা বুঝিতে অক্ষম হয়, তখন সে এক জ্ঞানপূর্ণ কথাকে আপত্তিকর মনে করে। তাহার আপত্তি একথার সাক্ষী হয় যে, সেই সূক্ষ্ম জ্ঞান-তত্ত্ব সাধারণ বুদ্ধির অগম্য অনেক উর্ধ্বের বিষয়। সেই জন্য বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ বুদ্ধিমান বলিয়া পরিচিত হইয়াও উহার বিরুদ্ধে আপত্তি করে। কিন্তু এখন, এই রহস্য উদ্ঘাটনের পর আশা করা যায়, কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি ইহার বিরুদ্ধে আপত্তি না করিয়া বরং ইহা গ্রহণ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিবে।

স্বরণ রাখিতে হইবে, কুরআন শরীফ ওহী এলহামের চিরাচরিত নিয়মের প্রাকৃতিক বিধান হইতে সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য আরও এক স্থানে এক অকারের কসমের ব্যবহার করিয়াছে। তাহা এই :

وَالسَّمَاءُ مَاتِ الرَّجْعِيَّةِ وَالْأَنْتِصَرِ ذَاتِ الصَّنْدَعِ -

إِنَّهُ لَقَنُولٌ فَضْلٌ وَّمَا هُوَ بِالْمَزِيلِ - (الطارق: ١٥-١٦)

অর্থাৎ, “সেই আকাশের কসম, যেখান হইতে বৃষ্টি পড়ে এবং সেই পৃথিবীর কসম, যাহা বৃষ্টির ফলে নানা প্রকার সরুজ বৃক্ষলতা ও শস্য জন্মায়। এই কুরআন খোদার কথা এবং তাহার ওহী। ইহা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে মীমাংসাকারী। ইহা নিরর্থক বা বৃথা নহে” (৮৬:১২-১৫)। অর্থাৎ, ইহা অসময়ে আসে নাই। মৌসুমের বৃষ্টির ন্যায় উহা যথা সময়ে আগমন করিয়াছে।

এখন খোদাতা'লা কুরআন শরীফের সত্যতা প্রমাণার্থে, যাহা তাহার ওহী, একটি প্রকাশ্য প্রাকৃতিক বিধানকে কসমের রঙে উপস্থাপিত করিয়াছেন। অর্থাৎ, প্রাকৃতিক বিধানে সর্বদা দেখা যায় যে, প্রয়োজনের সময় আকাশ হইতে বৃষ্টিপাত হয়। পৃথিবীর শস্যশ্যামলতা আকাশের এই বৃষ্টির উপর নির্ভর করে। যদি আকাশ হইতে বৃষ্টিপাত না হয়, তবে, ক্রমে ক্রমে কৃপণ শুষ্ক হইয়া যায়। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর পানির সত্তা ও স্থিতি আকাশের পানির উপর নির্ভর করে। এই কারণে যখনই বৃষ্টিপাত হয়, তখনই কৃপের পানিও উপরে উঠে। কেন উঠে? ইহার কারণ এই যে, আকাশের পানি পৃথিবীর পানিকে উপরের দিকে আকর্ষণ করে। এই সম্পর্কই আল্লাহর ওহী ও মানুষের বুদ্ধির মধ্যে বিদ্যমান। আল্লাহর ওহী অর্থাৎ এলহামে ইলাহী আকাশের পানিস্বরূপ এবং মানুষের বুদ্ধি হইতেছে পৃথিবীর পানি যাহা সর্বদা আকাশের পানি অর্থাৎ এলহাম দ্বারা প্রতিপালিত হয়। যদি আকাশের বৃষ্টি অর্থাৎ ওহীর ধারা বন্ধ হইয়া যায়, তবে পৃথিবীর পানিও ক্রমে শুষ্ক হইয়া পড়ে। ইহার জন্য কি এই প্রমাণই যথেষ্ট নহে যে, যদি দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইয়া যায় এবং কোন এলহাম লাভকারী পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে বুদ্ধিমানগণের বুদ্ধি অত্যন্ত ময়লায়ুক্ত ও নষ্ট হইয়া যায়, যেমন ভূগৃষ্ঠস্থ পানি শুষ্ক হয় ও পচিয়া যায়। ইহা বুদ্ধিবার জন্য ঐ যুগের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করাই যথেষ্ট যে, আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম আসিবার পূর্বে সমগ্র পৃথিবীর অবস্থা কী ছিল? তখন হ্যরত মসীহের সময়ের পর প্রায় ছয়শত বৎসর পার হইয়া গিয়াছিল। এই সময়ের মধ্যে কোন এলহাম লাভকারী জন্ম গ্রহণ করেন নাই। এজন্য সমগ্র পৃথিবীর অবস্থা বিকৃত হইয়া গিয়াছিল। প্রত্যেক দেশের ইতিহাস এখন উচ্চ কঢ়ে একথা ঘোষণা করিতেছে যে, আঁ হ্যরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের যুগে এবং তাহার আবির্ভাবের পূর্বে, সমগ্র পৃথিবীতে বিকৃত ভাবধারা বিস্তার লাভ করিয়াছিল। এমন কেন হইয়াছিল? ইহার কারণ কী ছিল? উহা এই যে, এলহামের ধারা বহু যুগ ধরিয়া বন্ধ ছিল। স্বর্গীয় সাম্রাজ্য তখন শুধু বুদ্ধির হাতে ছিল। সুতরাং, অপরিণত বুদ্ধি কত না পাপ ও দোষের মধ্যেই মানুষকে নিপত্তি

করিল! এই সম্বন্ধে অবগত নহে এমন কেহ আছে কি? দেখ, এলহামের পানি যখন দীর্ঘকাল জগতে বর্ষিল না, তখন সব বুদ্ধির পানি কীভাবে শুক্ষ হইয়া গেল।

সুতরাং, এই সব কসমের মাধ্যমে আল্লাহ'লা তাঁহার প্রাকৃতিক বিধানকে পেশ করেন এবং বলেন যে, তোমরা ভাবিয়া দেখ যে, ইহা কি খোদার অমোঘ চিরস্তন প্রাকৃতিক বিধান নহে যে, আকাশের পানির উপরেই পৃথিবীর যাবতীয় শস্য ও শ্যামলতা নির্ভর করে ? সুতরাং এই সুস্পষ্ট দৃশ্যমান প্রাকৃতিক বিধান ইলাহী এলহামের গুণ প্রাকৃতিক বিধানের জন্য সাক্ষ্যস্বরূপ। অতএব এই সাক্ষ্যের দ্বারা উপকৃত হও। শুধু বুদ্ধিকে আপন পথ-প্রদর্শক করিও না। উহা এমন পানি নহে যে, আকাশের পানি ছাড়া বিদ্যমান থাকিতে পারে। আকাশের পানির বিশেষত্ব এই যে, কোন কৃপে ঐ পানি পতিত হউক বা না হউক, উহা তাহার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যবশতঃ সব কৃপের পানিকে উর্ধ্বে উঠায়। তেমনই যখন খোদার কোন এলহাম লাভকারী পৃথিবীতে আবির্ভূত হন, তখন কোন বুদ্ধিমান মানুষ তাঁহার অনুসরণ করুক বা না করুক, সেই এলহাম লাভকারীর যুগে সব বুদ্ধির মধ্যে স্বতই এমন আলোক ও স্বচ্ছতা উপস্থিত হয়, যাহা ইতিপূর্বে ছিল না। মানুষ তখন নিজে নিজে সত্যার্বেষণে প্রবৃত্ত হয় এবং অদৃশ্য হইতে তাহাদের চিন্তা শক্তির মধ্যে এক আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। সুতরাং বুদ্ধি ও যুক্তির এইসব উন্নতি ও আন্তরিক উৎসাহ উদ্দীপনা সমাগত এলহাম লাভকারীর শুভ পদার্পণে সৃষ্টি হয় এবং ভূ-গর্ভস্থ সব পানিই উপরে উঠানো হয়। যখন তোমরা দেখিতে পাও যে, ধর্মানুসন্ধানে সকলেই দণ্ডয়মান হইয়াছে এবং পৃথিবীর পানিতে এক আলোড়ন সৃষ্টি হইয়াছে, তখন উঠ, সতর্ক হও। নিশ্চিত জানিও যে, আকাশ হইতে প্রবল বৃষ্টিপাত হইয়াছে এবং কোনো হৃদয়ে এলহামের বর্ষণ হইয়াছে।

পঞ্চম প্রশ্ন

মা'রেফতে এলাহী (ঐশীজ্ঞান) লাভের উপায়

এ সম্বন্ধে কুরআন শরীফে অনেক বিস্তারিত আলোচনা আছে। তাহা ব্যক্ত করিবার জন্য এখানে কিছুতেই স্থান সংকুলান হইবে না। নমুনাস্বরূপ কিছু বলা হইতেছে মাত্র। জানা আবশ্যক, কুরআন শরীফ জ্ঞানকে তিন প্রকারের বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছে : (১) 'ইলমুল একীন' (যৌক্তিক জ্ঞান) ; (২) 'আইনুল একীন' (প্রত্যক্ষ জ্ঞান) (৩) 'হাক্কুল একীন' (অভিজ্ঞতালক্ষ নিশ্চিত জ্ঞান)। ইতিপূর্বে, সূরা আল হাকুমুত্তাকাসুর-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ করিয়াছি যে, ইলমুল একীন হইল, কোন মধ্যবর্তীর সাহায্যে, বিনা মধ্যবর্তিতায় নহে, অভীষ্ট বস্তুর সন্ধান লাভ। যেমন, আমরা ধূম্র হইতে অগ্নির অস্তিত্ব প্রমাণ করি। আমরা বলি, অগ্নি দেখি নাই, কিন্তু ধূম্র দেখিয়াছি এবং ইহাতে অগ্নি বিদ্যমান থাকার প্রত্যয় জন্মিয়াছে। সুতরাং ইহা 'ইলমুল একীন'। যদি আমরা অগ্নি

দেখিতে পাই, তবে কুরআন শরীফের আল-হাকুমুত্তাকাসুর সূরাতে বর্ণিত জ্ঞানের শ্রেণীবিভাগে ইহার নাম হইবে আইনুল একীন। যদি আমরা এই অগ্নিতে প্রবেশ করি, তবে এই পর্যায়ের জ্ঞানের নাম কুরআন শরীফের বর্ণনানুসারে হইবে ‘হাক্কুল একীন’। সূরা আল-হাকুমুত্তাকাসুর পুনরায় এখানে লিখা অনাবশ্যক। পাঠক যথাস্থানে উহা দেখিয়া লউন।

এখন জানা কর্তব্য, প্রথম প্রকারের যে জ্ঞান, অর্থাৎ ইল্মুল একীন, উহা লাভ করিবার উপায় যুক্তি এবং তথ্য। আল্লাহত্তা'লা দোষখীদের কথা তাহাদের মুখ দিয়াই বলিতেছেন :

قَاتُلُوا لَوْكُنَا نَسْمَهُ أَوْ تَعِقِّلُ مَاصُنَّا فِي

أَصْحَبِ السَّعِيرِ - (الْمُلْكٌ، ۱۱)

অর্থাৎ, “দোষখীরা বলিবেং যদি আমরা বুদ্ধিমান হইতাম এবং ধর্ম ও ধর্মীয় বিশ্বাসকে যুক্তির দ্বারা পরীক্ষা করিতাম কিংবা পূর্ণ জ্ঞানী গবেষকগণের লেখা ও বক্তৃতা মনোযোগ সহকারে শুনিতাম, তবে আজ আমরা দোষখে নিষ্কিঞ্চ হইতাম না (৬৭:১১)।” এই আয়াত নিম্নে উদ্ধৃত আয়াতের সমর্থক। ইহাতে আল্লাহত্তা'লা বলেন :

لَا يُحَكِّلُفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسَعَهَا . (الْبَقْرَةٌ، ۲۸۷)

অর্থাৎ, “খোদাতা'লা মানুষের আস্থাকে উহার জ্ঞানের অধিক কোন কথা স্বীকার করিবার জন্য কষ্ট দেন না” (২:২৮৭)। বরং তিনি সেই ধর্মবিশ্বাসই উপস্থাপিত করেন, যাহা হৃদয়ঙ্গম করিবার ক্ষমতা মানুষের আছে, যাহাতে তাঁহার আদেশ পালন সাধ্যের অতীত না হইয়া পড়ে। এই আয়াতগুলিতে এই ইশারাও রহিয়াছে যে, মানুষ কর্ণের দ্বারাও এল্মুল একীন লাভ করিতে পারে। দৃষ্টান্তস্থলে যেমন আমরা লভন দেখি নাই, কিন্তু যাহারা দেখিয়াছে, তাঁহাদের নিকট এই শহর থাকার কথা শুনিয়াছি। কিন্তু তাই বলিয়া কি আমরা এই সন্দেহ করিতে পারি যে, হয়তো তাহারা সকলেই মিথ্যা বলিয়াছে? আমরা আলমগীর বাদশাহের আমল পাই নাই। আলমগীরের চেহারাও আমরা দেখি নাই, কিন্তু আলমগীর যে চুঁঘতাই বাদশাগণের অন্যতম, ইহাতে কি আমাদের কোন সন্দেহ আছে? এই প্রকার একীন বা প্রত্যয় কীরূপে জন্মিল? ইহার উত্তর এই যে, শুধু ধারাবাহিক শৃঙ্খলির দ্বারা। সুতরাং, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, শৃঙ্খলি ‘এল্মুল একীনের’ পর্যায়ে পৌছায়। নবীগণের কেতাব, যদি শৃঙ্খলির ধারাবাহিকতায় কোন দোষ না থাকে, তবে তাহাও শৃঙ্খলিসম্মত জ্ঞানের উপায়। কিন্তু কোন গ্রন্থ ঐশী গ্রন্থ বলিয়া পরিচিত হইলেও যদি উহার পঞ্চাশ কি ষাট কপি পাওয়া যায় এবং দেখা যায় যে, ইহার একটা অন্যটার বিরোধী এবং কেহ কেহ বিশ্বাস করে যে, ইহাদের মধ্যে শুধু দুই চারটি কপি বিশুদ্ধ আর অন্যগুলি জাল বা প্রক্ষিঞ্চ, তাহা হইলে গবেষকের নিকট এই ধরনের বিশ্বাস, যাহা সত্যিকারের গবেষণার উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, তাহা কোন কাজের বলিয়া গণ্য হইবে না। ফলে এ সবগুলি

পুস্তকই পরম্পর বিরোধী হওয়ার কারণে বাতিল এবং বিশ্বাসের অযোগ্য বলিয়া গণ্য হইবে। আর কখনও এই প্রকার পরম্পর বিরোধী বিবরণ কোন জ্ঞানের বাহক বলিয়া গণ্য হইবে না। কারণ জ্ঞানের সংজ্ঞা ইহাই যে, এক নিশ্চিত তত্ত্বের সহিত পরিচয় করান। বৈপরীত্যের স্তুপ হইতে নিশ্চিত তত্ত্ব লাভ সম্ভব নহে।

এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কুরআন শরীফ শুধু শ্রতির সীমা পর্যন্ত আবদ্ধ নহে। কারণ ইহা মানুষকে বুঝানোর জন্য বড়ই যুক্তি প্রমাণে পরিপূর্ণ। যেসব ধর্ম-বিশ্বাস, মূলনীতি এবং আদেশ-নিষেধ ইহা পেশ করে, ঐগুলির মধ্যে এমন কোন বিষয় নাই, যাহা যুক্তিহীন, যাহা বল প্রয়োগের উপর স্থাপিত। কুরআন নিজেই বলে যে, ইহার প্রদত্ত সকল ধর্ম-বিশ্বাস মানুষের প্রকৃতিতে পূর্ব হইতে অঙ্গিত রহিয়াছে। কুরআন শরীফের নাম এই জন্যই যিক্র (স্মরণিকা)। যেমন, বলা হইয়াছে :

هَذَا ذِكْرٌ مُّبِينٌ - (الأنبياء: ٥١)

অর্থাৎ, “এই কুরআন পরম আশিসমণ্ডিত স্মরণিকা” (২১:৫১)। ইহা কোন নতুন জিনিষ আনে নাই। বরং মানুষের স্বভাব এবং প্রকৃতির পুস্তক যদ্বারা ভরপুর, উহা তাহাকেই স্মরণ করাইয়া দেয়। এক স্থানে বলা হইয়াছে :

لَا إِكْرَاجٌ فِي الدِّينِ - (البقرة: ٢٥٧)

অর্থাৎ, “এই ধর্ম বল প্রয়োগের দ্বারা কিছু স্বীকার করাইতে চাহে না, বরং প্রত্যেক বিষয়েই যুক্তি পেশ করে (২:২৫৭)।” এতদ্যতীত কুরআনে হৃদয়কে আলোকিত করিবার জন্য এক আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন, খোদাতালা বলেন :

شِفَاعَ لِمَنِ فِي الصَّدْرِ - (রিয়নস: ৫৮)

অর্থাৎ, “কুরআন ইহার গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য দ্বারা সর্ব প্রকারের হৃদ-ব্যাধি বা মনের রোগ নিরাময় করে” (১০:৫৮)। এই জন্য ইহাকে শ্রতিপুস্তক বলিতে পারি না। বরং ইহা শক্তিশালী অপেক্ষা শক্তিশালী যুক্তি ও দলীল প্রমাণ সঙ্গে রাখে এবং ইহাতে এক অত্যুজ্জ্বল আলোক পাওয়া যায়।

এই প্রকারের যৌক্তিক প্রমাণ, যাহা নির্ভুল প্রস্তাবনা দ্বারা সিদ্ধান্ত খাড়া করে, নিঃসন্দেহে ‘ইলমুল একীনে’ পৌছায়। ইহারই প্রতি আল্লাহ্ জাল্লা শানুহ নিম্নে উদ্ধৃত আয়াতগুলিতে ইঙ্গিত করেন। তিনি বলেন :

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخِتَافِ الْأَيْلِ

وَالنَّهَارِ لَبِيْتٍ لَا وِلِيْ لِأَنْبَابِ الدِّينِ يَذْكُرُونَ

اَللّٰهُ قَيْمَاً وَقُوَّدَا وَعَلٰى جِنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ
 فِي خَلْقِ السَّمَوٰتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا
 بَاطِلًا مُبْعَثَثٌ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ - رَأَى عَزَّلٌ: ٣٨-٣٩

অর্থাৎ, “যখন বুদ্ধিমান ও যুক্তিবাদী মানুষ পৃথিবী ও আকাশের গ্রহ নক্ষত্রসমূহের গঠন এবং রাত্রি ও দিনের ত্রাস বুদ্ধির কারণ গভীর দৃষ্টিতে অবলোকন করে, তখন এই সুরচিত শৃঙ্খলার প্রতি দৃষ্টিপাতে তাহারা খোদাতা’লার অস্তিত্বের প্রমাণ পায়। অতঃপর, তাহারা আরও রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য খোদার সাহায্য প্রার্থনা করে এবং দাঁড়াইয়া, বসিয়া ও পার্শ্বপরিবর্তনে শুইয়া তাঁহাকে স্মরণ করে। ইহাতে তাহাদের যুক্তি ও বুদ্ধি বহুল পরিমাণে পরিষ্কার হইয়া যায়। তারপর, তাহারা যখন সেই যুক্তি ও বুদ্ধির সাহায্যে আকাশের গ্রহ নক্ষত্রমণ্ডলী ও পৃথিবীর সুনিপুণ ও উৎকৃষ্ট গঠন লইয়া আরও চিন্তা করে, তখন তাহাদের মুখ হইতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাহির হয়ঃ ‘এমন সুনিপুণ ও সুদৃঢ় শৃঙ্খলা কখনও বৃথা ও নিষ্ফল নহে, বরং ইহা প্রকৃত স্বষ্টির চেহারা প্রদর্শন করিতেছে।’ তখন তাহারা বিশ্ব স্বষ্টির উলুহীয়ত (ঈশ্বরত্ব) স্বীকার করিয়া মুনাজাত করেঃ ‘এলাহী! ইহা হইতে তুমি পবিত্র যে, কেহ তোমার সন্তা অস্বীকার করিয়া অনুপযুক্ত গুণাবলী তোমার প্রতি আরোপ করে। অতএব, তুমি আমাদিগকে দোষখের অগ্নি হইতে রক্ষা কর।’ অর্থাৎ, তোমাকে অস্বীকার করাই সাক্ষাৎ দোষখ। যাবতীয় আরাম ও শান্তি তোমাতে এবং তোমাকে চেনার মধ্যে। যে ব্যক্তি তোমাকে সত্যিকার চেনা হইতে বাস্তিত, প্রকৃতপক্ষে সে এই পৃথিবীতেই অগ্নির মধ্যে রহিয়াছে” (৩১:১৯১-১৯২)।

মানব স্বভাব-তত্ত্ব

এই প্রকারেই জ্ঞান লাভের এক উপায় মানুষের বিবেক। খোদার কিতাবে ইহার নাম মানব-প্রকৃতি রাখা ইয়াছে। যেমন আল্লাহতা’লা বলেনঃ

فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ الْإِنْسَانَ عَلَيْهَا - (الرُّوم: ٣١)

অর্থাৎ, “খোদার স্বভাব (ফিত্রত), যাহার উপর মানুষকে সৃষ্টি করা হইয়াছে” (৩০:৩১)। স্বভাবের সেই নকশা কী? ইহাই যে, খোদাকে ওয়াহেদ, লা-শরীক (এক-অদ্বিতীয় ও অংশীহীন), সর্বস্বষ্টা জ্ঞান এবং মৃত্যু ও জন্ম হইতে পবিত্র জ্ঞান করা। আমরা বিবেককে ‘ইল্মুল একীনের’ মর্যাদায় এই জন্য স্থান দিই যে, যদিও প্রকাশ্যভাবে ইহাতে এক জ্ঞান হইতে অন্য জ্ঞানের দিকে মোড় নেওয়া দৃষ্টিগোচর হয় না, যেমন ধূম্রের জ্ঞান হইতে অগ্নির জ্ঞানের দিকে চিন্তার মোড় নেওয়া দৃষ্টিগোচর হয়, তথাপি এক প্রকার সূক্ষ্ম গতিধারা হইতে এই পর্যায়

খালি নহে এবং তাহা এই যে, প্রত্যেক জিনিষে খোদা এক অজানা বৈশিষ্ট্য রাখিয়াছেন, যাহা বর্ণনা বা বক্তৃতার মধ্যে আসিতে পারে না। কিন্তু ঐ জিনিষের উপর নজর করিলে এবং উহা লইয়া চিন্তা করিলে অচিরাং ঐ বৈশিষ্ট্যের দিকেই মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ, ঐ বৈশিষ্ট্য এই সত্তার জন্য এমনই অপরিহার্য যেমন অগ্নির জন্য ধূম্র অপরিহার্য। দৃষ্টান্তস্থলে, যখন আমরা খোদাতা'লার সত্তার দিকে ধ্যান নিবন্ধ করি যে, তিনি কীরূপ হওয়া দরকার, খোদা কি এমন হওয়া উচিত যে, তিনি আমাদের ন্যায় জন্য গ্রহণ করিবেন, আমাদের মত দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিবেন এবং আমাদের মতই মৃত্যুবরণ করিবেন, তখনই এই ধারণা দ্বারা আমাদের হৃদয় ব্যথিত হয়, বিবেক কাঁপিয়া উঠে এবং এত উত্তেজনা দেখায় যেন উহা এই ধারণাকে নাড়া দিতেছে এবং চীৎকার করিয়া বলিতে থাকে যে, সেই খোদা যাহার শক্তির উপর সব আশা ভরসা নির্ভর করে, তাঁর সর্ব প্রকার ক্রষ্টিবিচ্ছিন্ন হইতে পবিত্র, পূর্ণ এবং শক্তিমান হওয়া চাই। যখনই খোদার ধারণা আমাদের হৃদয়ে জাগে, তখনই তৌহীদ এবং খোদার মধ্যে, ঠিক ধূম্র ও অগ্নির সম্পর্কের ন্যায়, বরং তদপেক্ষাও অধিক নিষ্ঠৃত সম্পর্কের অনুভূতি হয়। সুতরাং যে জ্ঞান আমরা আমাদের বিবেকের সাহায্যে লাভ করি, তাহা 'ইলমুল একীনের' পর্যায়ভূক্ত। কিন্তু ইহার আরও এক পর্যায় আছে, যাহাকে 'আইনুল একীন' বলা হয়। এই পর্যায়ের দ্বারা সেই প্রকারের জ্ঞান বুঝায়, যেখানে আমাদের একীন এবং একীনের বস্তুর মধ্যে কোন মধ্যস্থ থাকে না। দৃষ্টান্তস্থলে, যখন আমরা জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা কোন সুগন্ধ বা দুর্গন্ধ অনুভব করি, আমাদের জিহ্বা দ্বারা মিষ্টি বা লবণ সম্বন্ধে অবহিত হই, কিংবা ত্বক দ্বারা গরম বা ঠাণ্ডা অনুভব করি, তখন এই সকল জ্ঞান আমাদের 'আইনুল একীন' বা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিভাগভূক্ত হয়। কিন্তু পরলোক সম্বন্ধে আমাদের অতিন্দ্রীয় জ্ঞান তখনই 'আইনুল একীন'-এর সীমানায় পৌছে, যখন আমরা স্বয়ং সাক্ষাতভাবে এলহাম পাই, খোদার বাণী নিজ কর্ণে শুনি এবং খোদার পরিষ্কার ও সত্য কাশ্ফসমূহ স্বচক্ষে দেখি। নিঃসন্দেহে আমরা পরিপূর্ণ তত্ত্ব জ্ঞানলাভের জন্য বিনা মধ্যস্থতায় সরাসরি এলহামের মুখাপেক্ষী এবং এই পরিপূর্ণ তত্ত্ব জ্ঞানের ক্ষুধা ও তৰ্কাও আমাদের হৃদয়ে বিদ্যমান দেখি। খোদাতা'লা যদি আমাদের জন্য ইতিপূর্বেই এই মা'রেফতের (তাঁহার সঠিক পরিচয় লাভের) আয়োজন না করিয়া থাকেন, তবে এই ক্ষুধা ও পিপাসা আমাদিগকে কেন দিয়াছেন? আমরা কি ইহজীবনে, যাহা আমাদের পরকালের মূলধনের জন্য একমাত্র পরিমাপক, এই কথায় সন্তুষ্ট থাকিতে পারি যে, শুধু উপকথারপে আমরা সেই সত্য, পূর্ণ ও জীবিত খোদার উপর ঈমান আনি বা নিছক যুক্তিসম্মত জ্ঞানকে যথেষ্ট বিবেচনা করি, যাহা এখন পর্যন্ত অসম্পূর্ণ ও অসমাপ্ত? খোদার সত্যিকার প্রেমিক ও প্রভৃতি আত্মনিবেদন-কারীর হৃদয় কি চায় না যে, তাহারাও তাহাদের পরম প্রেমাস্পদের বাজী লাভে আনন্দিত হউক? যাহারা খোদার জন্য সমগ্র সংসার-ধর্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন,

হৃদয় সম্পূর্ণ সম্পর্ক করিয়া দিয়াছেন ও প্রাণ বিসর্জন দিয়াছেন, তাহারা কি এ কথায় তুষ্ট থাকিতে পারেন যে, শুধু একটা ধূম্রময় আলোকের মধ্যে দাঢ়াইয়া থাকিয়া তাঁহারা মরিয়া যান এবং সত্যের সেই মহাসূর্যের মুখ দর্শন না করেন? ইহা কি সত্য নহে যে, সেই জীবিত খোদার মহান আত্মান বাণী^{أَمِّيْلَةُ الْمَوْجُুْدِ} (আমি আছি) এরূপ মর্যাদা দান করে যে, পৃথিবীর সব দার্শনিকের স্বহস্তে রচিত পুস্তকরাশি যদি পাল্লার এক দিকে রাখা হয় এবং অন্য দিকে রাখা হয় খোদার “আমি আছি” বাণীটি, তাহা হইলে শেষোভ্যের মোকাবিলায় ঐ সব গ্রন্থ ভাগার তুচ্ছ হইয়া যাইবে ? যাঁহারা দার্শনিক বলিয়া বিখ্যাত হইয়াও স্বয়ং অঙ্ক, তাহারা আমাদিগকে কী শিখাইবে ? বস্তুতঃ যদি খোদাতা'লা সত্যের অব্বেষণকারীগণকে কামেল মা'রেফত (পরিপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান) দানের ইচ্ছা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে নিশ্চয় তিনি তাঁহার বাক্যালাপের পথ খোলা রাখিয়াছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ জাল্লা শান্ত কুরআন শরীফে বলেন :

إِنَّمَا الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ - صِرَاطُ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

অর্থাৎ, “হে খোদা ! আমাদিগকে এন্তেকামতের সেই পথ দেখাও, যে পথ ঐ সকল লোকের, যাহারা তোমার পুরক্ষার লাভ করিয়াছে” (১:৬-৭)। এখানে পুরক্ষার দ্বারা এলহাম, কাশ্ফ প্রভৃতি ঈশ্বা-জ্ঞানকে বুঝায়, যাহা মানুষ সরাসরি পাইয়া থাকে। এই প্রকারেই, অন্য এক স্থানে বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ تُمَّ اسْتَقْامُوا تَنَزَّلُ

عَلَيْهِمُ الْمَلِئَكَةُ لَا تَعْلَمُونَا وَلَا نَخْرُنُوا وَأَنْشَرُوا

بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ - (খন্ম ৩: ১)

অর্থাৎ, “যাঁহারা খোদার উপর ঈমান আনিয়া পূর্ণ ধৈর্য অবলম্বন করে, তাহাদের নিকট খোদাতা'লার ফিরিশ্তা অবতীর্ণ হয় এবং তাহাদিগকে এই এলহাম করে : “তোমরা কোন ভয় করিও না এবং দুঃখিত হইও না। তোমাদের জন্য প্রতিশ্রূত বেহেশ্ত আছে” (৪:১৩১)। সুতরাং এই আয়াতেও সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হইয়াছে যে, খোদাতা'লার পুণ্যবান বান্দাগণ দুঃখ ও ভয়ের সময়ে খোদা হইতে এলহাম প্রাপ্ত হন। ফিরিশ্তাগণ অবতীর্ণ হইয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনা দেয়। তারপর অন্য এক আয়াতে বলিয়াছেন :

لَهُمْ أَبْشِرُوا فِي الدُّنْيَا وَ فِي الْآخِرَةِ ۚ (রিয়ুন: ৭৫)

অর্থাৎ, “খোদার বন্ধুগণ এলহাম এবং খোদার বাক্যালাপ দ্বারা ইহলোকেই সুসংবাদ প্রাপ্ত হন এবং পরলোকেও প্রাপ্ত হইবেন” (১০:৬৫)।

এলহাম (ঐশ্বী-বাণী) বলিতে কী বুঝায় ?

এখানে স্বরণ রাখিতে হইবে যে, ‘এলহাম’ শব্দ দ্বারা এখানে ইহা বুঝায় না যে, চিন্তা-ভাবনার ফলে কোন কথা মনের মধ্যে উদয় হওয়া। যেমন, কোন কবি কবিতা রচনা করার চেষ্টা করিতে থাকিলে, বা এক পদ তৈরী করিয়া অন্য পদ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে থাকিলে, তখন দ্বিতীয় পদ মনে উদিত হয়। এইভাবে মনে উদয় হওয়া এলহাম নহে। বরং ইহা খোদার প্রাকৃতিক বিধান অনুযায়ী নিজ চিন্তার একটা ফল মাত্র। যে ব্যক্তি ভাল বিষয় লইয়া চিন্তা করে বা কুবিষয়ে চিন্তা করে, তাহার অনুসন্ধান অনুযায়ী কোন কথা অবশ্যই তাহার মনে উদিত হয়। দৃষ্টান্তস্থলে এক সাধু ব্যক্তি সত্যের সাহায্যার্থে এক কবিতা রচনা করিয়াছে এবং এক দুষ্ট ও অপবিত্র ব্যক্তি তাহার কবিতায় অসত্যের সহায়তা করিতেছে এবং সাধুগণকে গালি দিতেছে। এই অবস্থায় উভয়েই কিছু কবিতা রচনা করিবে। বরং ইহাও বিচিত্র নহে যে, সাধুগণের শক্তি, যে মিথ্যার সমর্থনে সদা অভ্যন্ত ও সিদ্ধহস্ত, বেশী ভাল কবিতা লিখে। সুতরাং, যদি শুধু মনে কোন কথা উদিত হওয়ার নাম এলহাম হয়, তাহা হইলে সাধুগণের শক্তি এক কুকর্মরত কবিও সর্বদা সত্যের বিরোধিতায় কলম ধারণ এবং নানা প্রকার মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াও খোদার মূলহাম বা এলহামপ্রাপ্ত বলিয়া কথিত হইবে। পৃথিবীতে উপন্যাস জাতীয় রচনার মধ্যে ইন্দ্রজালের ন্যায় লেখা পাওয়া যায় এবং আপনারা দেখিয়া থাকেন যে, সর্বৈব মিথ্যা হইলেও এই প্রকারের ধারাবাহিক রচনা লোকের মনে আসে। আমরা কি এগুলিকে এলহাম বলিব? বরং যদি কেবল কোন কথা মনে উদ্বেক হওয়ার নাম এলহাম হয়, তবে এক চোরও মূলহাম বলিয়া কথিত হইতে পারে। কারণ সে অনেক সময় চিন্তা দ্বারা চুরি করিবার ভাল ভাল পথ বাহির করে, ডাকাতি ও অন্যায় খুনের চমৎকার উপায় তাহার মনে ভীড় জমায়। এখন কি এইসব অপবিত্র নাপাক উপায় উদ্ভাবনার নাম এলহাম রাখা সঙ্গত হইবে? কখনও নহে। বরং ইহা সেই সকল লোকদের ধারণা, যাহারা এখনও পর্যন্ত সেই প্রকৃত খোদার খবর রাখে না, যিনি স্বয়ং বিশেষ বাক্যালাপ দ্বারা হৃদয়ে সান্ত্বনা দেন এবং যাহারা অবহিত নহে তাহাদিগকে আধ্যাত্মিক জ্ঞান দ্বারা স্বীয় পরিচয় ও তত্ত্ব-জ্ঞান দান করেন।

এলহাম কী? সেই পরিত্র ও শক্তিমান খোদা কোন অভিষিক্ত বান্দার সহিত, কিংবা যাহাকে তিনি মনোনীত করিতে চাহেন, তাহাকে এক জীবন্ত ও শক্তিশালী বাক্য দ্বারা সম্ভাষণ ও সম্বোধন করেন। অতঃপর এই সম্ভাষণ ও সম্বোধন যখন যথেষ্ট পরিমাণে এবং সান্ত্বনাদায়ী ধারায় আরম্ভ হইয়া যায় এবং তাহাতে কোন বিকৃত কল্পনার অন্ধকার থাকে না, এবং ঐ সমুদয় অকিঞ্চিত্কর এবং কতিপয় অসংলগ্ন শব্দ সংকলন না হইয়া বরং সুমধুর মহা জ্ঞানপূর্ণ, মহা গৌরবাভিত ও তেজময় বাক্য হয়, তখন উহাই খোদার কথা, যদ্বারা তিনি তাঁহার বান্দাকে

সান্ত্বনা দান করেন। এবং তাহার নিকট আত্ম-প্রকাশ করেন। অবশ্য, কোন কথা তিনি পরীক্ষার্থেও করিয়া থাকেন। উহার সহিত পূর্ণ এবং কল্যাণপ্রদ সম্ভাব থাকে না। এতদ্বারা খোদাতা'লার বান্দা হইতে তাহার প্রাথমিক অবস্থার পরীক্ষা লওয়া হয়। এলহামের কণা বিশেষের স্বাদ গ্রহণ করিয়া হয় সে স্বীয় চালচলন প্রকৃত মুলহামের ন্যায় বানাইবে নয়তো পদজ্ঞলিত হইয়া যাইবে। সুতরাং, যদি সে মহা সত্যপরায়ণ সিদ্ধীকগণের ন্যায় প্রকৃত সাধুতা অবলম্বন না করে, তাহা হইলে এই নেয়ামতের পূর্ণতা হইতে সে বঞ্চিত রহিয়া যাইবে। তাহার হাতে থাকিয়া যায় বৃথা আঙ্গালন মাত্র। কোটি কোটি পুণ্যবান বান্দা এলহাম প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের সকলের মর্যাদা খোদার নিকট একই পর্যায়ের নহে। বরং খোদার পবিত্র নবীগণ যাঁহারা খোদার নিকট হইতে প্রথম শ্রেণীর পূর্ণেজ্জুল এলহাম প্রাপ্ত হন, তাঁহারাও মর্যাদায় পরম্পর সমান নহেন। খোদাতা'লা বলেনঃ

تِلْكَ الرَّسُّلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ - (البقرة: ٢٥٤)

অর্থাৎ, “কতক নবী অন্য নবীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব রাখেন”(২:২৫৪)। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, এলহাম শুধু অনুগ্রহ। শ্রেষ্ঠত্বের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। বরং ফয়লিত সেই নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততার মানের উপর নির্ভর করে, যাহা একমাত্র খোদা জানেন। অবশ্য, এলহামও যদি আপন আশিসযুক্ত ও শর্তাবলীসহ হয়, তাহা হইলে ইহাও ঐ সবের এক ফল। ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই যে, এলহাম যদি এ প্রকারে হয় যে, বান্দা জিজ্ঞাসা করে এবং খোদা উহার উত্তর দেন এবং এই প্রকারে পারম্পরিক অবয়সহ যদি ধারাবাহিক প্রশ্ন ও উত্তর চলিতে থাকে এবং এলহামের ঐশ্঵রিক শক্তি ও আলোক দৃষ্ট হয় এবং উহা ভবিষ্যৎ ও অদৃশ্য বিষয়ক জ্ঞান বা বিশুদ্ধ তত্ত্বাবলী সম্বলিত হয়, তাহা হইলে উহা খোদার এলহাম। খোদার এলহামে ইহা জরুরী যে, এক বস্তু যেমন অন্য বস্তুর সাথে মিলনে পরম্পর বাক্যালাপ করে, তেমনই প্রভু-প্রতিপালক ও তাঁহার বান্দার মধ্যে কথোপকথন হয়। বান্দা যখন কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে, তখন উহার উত্তরে সে এক সুমধুর প্রাঞ্জল কালাম খোদাতা'লার দিক হইতে শুনিতে পায়। ইহাতে তাহার প্রবৃত্তির বা চিন্তাভাবনার কোন দখল মোটেই থাকে না। সম্ভাষণ ও সম্বোধন যদি প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ না হইয়া তাহার প্রতি সোজাসুজি দান হিসাবে আসে, তবে উহা নিশ্চয়ই খোদার কথা। কিন্তু দান হিসাবে এলহাম লাভের সৌভাগ্য ও মর্যাদা সকল মুলহামদের ভাগ্যেও জোটে না। খোদার বিশুদ্ধ, প্রাঞ্জল, জীবন্ত ও পবিত্র প্রাণ-সম্ভাবী বাণী ও এলহামের ধারা কেবল ঐ সকল মহামর্যাদাসম্পন্ন লোকের ভাগ্যেই জোটে, যাহারা ঈমান, আমলে-সালেহ, আন্তরিকতা ও পবিত্রতায় চরমোৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন এবং অন্যান্য বহু বিষয়ে ব্যৃৎপত্তি লাভ করিয়াছেন যাহা আমি বর্ণনা করিতে পারিতেছি না। পবিত্র ও সত্য এলহাম ঈশ্বরত্বের বড় বড় অলৌকিক ও আশ্চর্য ক্রিয়া প্রদর্শন

করিয়া থাকে। অনেক সময় অত্যজ্ঞল আলোক সৃষ্টি হয় এবং তৎসঙ্গে গৌরবময় এবং সমুজ্জ্বল এলহাম আসে। ইহা অপেক্ষা বড় গৌরব আর কী হইতে পারে যে, মুলহাম সেই সন্তার সহিত কথা বলে, যিনি পৃথিবী ও আকাশসমূহের স্মষ্ট। পৃথিবীতে খোদার নৈকট্য ইহাই। খোদার সহিত কথা বলাই খোদার দীদার। আমাদের এই বর্ণনায় মানুষের ঐ অবস্থা অন্তর্ভুক্ত নহে, যাহাতে কাহারও মুখে অনিদিষ্ট, অসংলগ্ন কোন শব্দ বা বাক্য বা শ্লোক বাহির হয় এবং যাহার সহিত ধারাবাহিক কোন বাক্যালাপ ও সন্তাষণ থাকে না। এই রকম মানুষ খোদার পরীক্ষায় নিপত্তি। কেননা, খোদা এই প্রকারেও অলস ও গাফিল বান্দাদিগকে পরীক্ষা করিয়া থাকেন যে, কখনও কোন বাক্য বা বাক্যসমষ্টি কাহারও মনে বা মুখে জারি করা হয় এবং ঐ ব্যক্তি অঙ্গবৎ হইয়া পড়ে। সে জানে না যে, সেই বাক্যসমষ্টি কোথা হইতে আসিল, খোদা হইতে না শয়তান হইতে। সুতরাং এই প্রকার বাক্য হইতে এন্টেগফার করা অত্যাবশ্যক। কিন্তু যদি কোন পুণ্যবান বান্দার সহিত আবরণমুক্ত ঐশ্বী বাক্যালাপ শুরু হইয়া যায় এবং এক প্রকার উজ্জ্বল সুমধুর, অর্থপূর্ণ, তাত্ত্বিক সম্বোধন ও সন্তাষণের ধারায় কথামৃত সগৌরবে তাহার কর্ণে পৌছে এবং কমপক্ষে কয়েকবার এ রকম হয় যে, খোদার মধ্যে এবং তাহার মধ্যে সম্পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় দশ বার প্রশ্ন ও উত্তর চলে, সে জিজ্ঞাসা করে এবং খোদা উত্তর দেন, আবার সেই সম্পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় সে অন্য কোন আবেদন করে এবং খোদা উত্তর দেন, আবার সে কাতর প্রার্থনা করে এবং তিনি উত্তর দেন, এই প্রকারে দশ বার পর্যন্ত খোদা ও তাহার মধ্যে বাক্যালাপ হইতে থাকে, এবং খোদা বার বার এসব বাক্যালাপে দোয়া কবুল করেন, ভাল ভাল তত্ত্ব তাহাকে শিক্ষা দেন, ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর খবর তাহাকে দেন এবং স্পষ্ট অবারিত বাক্য দ্বারা বার বার প্রশ্নোত্তরে তাহাকে সম্মানিত করেন, তাহা হইলে খোদাতা'লার নিকট এহেন মানুষের বহু শোকর করা কর্তব্য এবং খোদার পথে সর্বাপেক্ষা বেশী বিলীন হওয়া উচিত। কারণ খোদা শুধু আপন করুণায় তাঁহার সব বান্দা হইতে তাহাকে মনোনীত করিয়াছেন এবং তাহাকে পূর্ববর্তী সিদ্ধীকগণের উত্তরাধিকারী করিয়াছেন। এই সম্পদ অতি দুর্লভ এবং পরম সৌভাগ্যের বস্তু। ইহা চরম প্রাপ্তি। ইহার পর অন্য যাহা কিছু থাকে, সবই তুচ্ছ।

ইসলামের বিশেষত্ব

এই মর্যাদা এবং এই মকামের লোক ইসলামে সর্বদাই সৃষ্টি হইয়াছে এবং একমাত্র ইসলামেই খোদা বান্দার সন্নিকট হইয়া তাহার সহিত বাক্যালাপ করেন এবং তাহার অন্তরে কথা বলেন। তিনি তাহার হৃদয়ে তাঁহার সিংহাসন স্থাপন করেন এবং তাহার মধ্যে থাকিয়া তাহাকে আকাশের দিকে আকর্ষণ করেন এবং তাহাকে ঐ সমস্ত নেয়ামত দেন, যাহা পূর্ববর্তীগণকে দেওয়া হইয়াছিল। আক্ষেপের বিষয় যে, অন্ধ দুনিয়া জানে না যে, মানুষ নৈকট্য লাভ করিতে

করিতে কোথায় গিয়া পৌছে। দুনিয়া নিজে খোদার দিকে অগ্রসর হয় না এবং যদি কেহ অগ্রসর হয়, তবে হয় তাহাকে 'কাফের' নির্ধারণ করা হয় অথবা তাহাকে উপাস্য নির্ধারণ করিয়া খোদার আসনে বসানো হয়। উভয় কাজই অন্যায়। একটি সীমাতিক্রমে হয় এবং অন্যটি হয় সীমানার কাছেও না যাওয়ায়। কিন্তু বুদ্ধিমানের কর্তব্য, সে সাহস হারাইবে না এবং এই মকাম ও এই মর্যাদাকে অস্বীকার করিবে না। এহেন মর্যাদাবান পুরুষের মানহানি করিবে না এবং তাহার পূজা ও শুরু করিয়া দিবে না। এই পর্যায়ে খোদাতা'লা এহেন বান্দার নিকট এমন সম্পর্ক প্রকাশ করেন, যেন তাহাকে তিনি তাঁহার উল্লীল্যতের অর্থাৎ ঈশ্বরত্বের চাদর পরিধান করাইয়া দেন। এহেন ব্যক্তি খোদা দর্শনের দর্পণে পরিণত হয়। ইহাই সেই রহস্য, যাহা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়াহে ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন : 'যে আমাকে দেখিয়াছে, সে খোদাকে দেখিয়াছে।' বস্তুতঃ, ইহা বান্দাগণের জন্য পরম ও চূড়ান্ত সতর্কবাণী। এখানেই সকল চলা শেষ হইয়া যায়, আর পূর্ণ শান্তি ও স্বন্তি লাভ হয়।

প্রবন্ধ প্রগেতার ঐশ্বীবাণী প্রাপ্তির মর্যাদা

আমি বিশ্ববাসীর প্রতি অন্যায় করিব, যদি আমি এখন ইহা প্রকাশ না করি যে, যে মকামের গুণাবলীর আমি আলোচনা করিলাম এবং আল্লাহর সহিত কথোপকথনের যে পর্যায়ের বিস্তারিত বিবরণ দিলাম, তাহা খোদা স্বীয় অনুগ্রহে আমাকে দান করিয়াছেন, যেন আমি অঙ্কনিগকে চক্ষু দান করি, অব্বেষণকারীগণকে সেই নিরবন্দেশের উদ্দেশ দিই এবং সত্য গ্রহণকারীগণকে ঐ পবিত্র প্রস্তবণের সুসংবাদ দিই, যাহা লইয়া আলোচনা করেন অনেকেই কিন্তু প্রাপ্ত হন অল্প কয়েকজন। আমি শ্রোতৃবর্গকে নিশ্চয়তা দিতেছি যে, সেই খোদা, যাঁহার মিলনে মানুষের মুক্তি ও অনন্ত সুখ নিহিত আছে, তাঁহাকে কুরআন শরীফের অনুসরণ ছাড়া কখনও পাওয়া সম্ভব নহে। হায়, আমি যাহা দেখিয়াছি লোকে যদি তাহা দেখিত এবং আমি যাহা শুনিয়াছি লোকে যদি তাহা শুনিত, যদি তাহারা গল্ল-গজব ছাড়িত এবং সত্যের দিকে দৌড়াইত, তাহা হইলে কতই না ভাল হইত! সেই পূর্ণ জ্ঞানের উপায়, যদ্বারা খোদা দৃষ্টিপটে উদ্ভাসিত হইয়া উঠেন, সেই পয়সা বিধৌতকারী পানি যদ্বারা যাবতীয় সন্দেহ দূরীভূত হয়, সেই দর্পণ, যদ্বারা সেই পরাম্পরের দর্শন লাভ হয়, এ সকলই সেই ঐশ্বী বাক্যালাপ, যে সম্পর্কে আমি এতক্ষণ আলোচনা করিলাম। যাঁহার আত্মায় সত্যের অব্বেষণ আছে, তিনি উঠুন এবং অব্বেষণ করুন। আমি সত্য সত্যই বলিতেছি, যদি আত্মাসমূহে সত্যিকার অব্বেষণ সৃষ্টি হয়, যদি হন্দয়সমূহে সত্যিকারের তত্ত্ব জন্মে, তবে মানুষ এই পথের অব্বেষণ করুক, ইহার অনুসন্ধানে লাগিয়া যাউক। কিন্তু এই পথ কোন্ পস্তায় খুলিবে? আবরণ কোন্ চিকিৎসায় দূরীভূত হইবে? সকল অব্বেষণকারীকে এই নিশ্চয়তা দান করিতেছি যে, কেবল ইসলামই এই পথের সুসংবাদ দান করে। অন্য জাতিগণ খোদার এলহামের উপর দীর্ঘকাল যাবৎ তালা

দিয়া মোহরাবন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। অতএব সুনিশ্চিতরূপে জানিয়া রাখো, ইহা খোদার দিক হইতে মোহরযুক্ত তালা নহে, বরং বর্ণিত হওয়ার কারণে ইহা মানুষের ছলনার তালা মাত্র। নিশ্চিত জানিও, আমরা যেমন চোখ ছাড়া দেখি না, কান ছাড়া শুনি না, জিহ্বা ব্যতীত কথা বলিতে পারি না, তেমনই সন্তুষ্ট নহে যে, আমরা কুরআন ব্যতিরেকে সেই প্রিয়ের মুখ দর্শন করিতে পারি। আমি যুবক ছিলাম, এখন বৃদ্ধ হইয়াছি। কিন্তু আমি এমন কাহাকেও পাই নাই, যে কুরআনের পবিত্র প্রস্তুবণ ব্যতীত এই অবারিত মা'রেফতের (তত্ত্বজ্ঞানের) পেয়ালা পান করিয়াছে।

পরিপূর্ণ জ্ঞানের উপায় খোদাতা'লার এলহাম

হে আমার প্রিয় বন্ধুগণ! কোন মানুষ খোদার সংকল্পের ও পরিকল্পনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে পারে না। নিশ্চিত জানিও, পরিপূর্ণ জ্ঞানের উপায় খোদাতা'লার এলহাম, যাহা খোদাতা'লার পবিত্র নবীগণ প্রাপ্ত হন। অতঃপর করণা-সিদ্ধি খোদা কখনও ইহা চাহেন নাই যে, ভবিষ্যতে এলহাম বন্ধ করিয়া দেন এবং এই প্রকারে দুনিয়াকে ধ্বংস করেন। বরং তাঁহার এলহাম ও সম্বোধন ও সম্ভাষণের দ্বারা সর্বদাই উন্মুক্ত রহিয়াছে। তবে হাঁ, উহাকে সঠিক পস্থায় অব্বেষণ করিতে হইবে। তবেই তোমরা উহা সহজে প্রাপ্ত হইবে। সেই জীবনবারি আকাশ হইতে বর্ষিত হইয়াছে এবং উপযুক্ত স্থানে জমা হইয়াছে। এখন তোমাদের কী করা কর্তব্য, যাহাতে এই পানি পান করিতে পার? তোমাদের কর্তব্য ইহাই যে, উঠিয়া-পড়িয়া এই প্রস্তুবণের নিকট পৌছাও। তারপর, প্রস্তুবণে মুখ রাখ, যেন জীবনবারি পানে পরিতৃপ্ত হও। মানুষের পূর্ণ সৌভাগ্য ইহাতেই নিহিত রহিয়াছে। যে যেখানেই সেই আলোর সঙ্কান পায়, সেই দিকেই যেন সে দৌড়ায় এবং যেখানেই সেই হারান বন্ধুর চিহ্ন মিলে, সেই পথই যেন সে গ্রহণ করে। তোমরা সকল সময় দেখিতেছ, আলোক আকাশ হইতে নামিয়া আসে এবং পৃথিবীর উপর পড়ে। এই প্রকারেই হেদায়াতের প্রকৃত আলোক আকাশ হইতেই অবতীর্ণ হয়। মানুষের নিজ বাক্য, ধারণা ও অনুমান তাহাকে সত্য জ্ঞান দিতে পারে না। তোমরা কি খোদাকে খোদার জ্যোতিবিকাশ ছাড়া প্রাপ্ত হইতে পার? তোমরা কি আকাশের আলোক ছাড়া অঙ্ককারে দেখিতে পাও? যদি দেখিতে পাও, তবে সম্ভবতঃ এখানেও দেখিতে পাইবে। কিন্তু আমাদের চোখে দৃষ্টিশক্তি থাকিলেও আকাশের আলোর প্রয়োজন আছে। যদিও আমাদের কর্ণে শ্রবণ-শক্তি থাকে, তবুও সেই বায়ুর প্রয়োজন, যাহা খোদার দিক হইতে প্রবাহিত হয়। সেই খোদা প্রকৃত নহে, যে চুপ থাকে এবং যার প্রকাশ আমাদের কল্পনার উপর নির্ভর করে বরং কামেল ও জীবিত খোদা তিনিই, যিনি তাঁহার অস্তিত্বের সঙ্কান নিজে দেন। এখনও তিনি ইহাই চাহিয়াছেন যে, তিনি নিজেই আপন অস্তিত্বের সঙ্কান দিবেন। আকাশের বাতায়নসমূহ এখনি খুলিয়া যাইবে। শীঘ্ৰই ভোর হইবে। ধন্য সে, যে উঠিয়া বসে এবং সত্য খোদার অব্বেষণ করে—সেই

খোদার, যাঁহার উপর কোন দুর্যোগ এবং কোন বিপদ আসে না, যাঁহার প্রতাপের চমক কখনও মলিন হয় না। কুরআন শরীফে আল্লাহত্তা'লা বলেন :

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ (النُّورُ: ٣٧)

অর্থাৎ, “একমাত্র খোদাই নিরস্তর আকাশের আলোক এবং পৃথিবীর আলোক” (২৪:৩৬)। তাঁহারই নিকট হইতে সর্বত্র আলোকপাত হইয়া থাকে। সূর্যের উপর কিরণদাতা সূর্যও তিনিই। পৃথিবীর সব প্রাণীর তিনিই প্রাণ। সত্য, জীবন্ত খোদা তিনিই। ধন্য সে, যে তাঁহাকে গ্রহণ করে।

জ্ঞানের তৃতীয় উপায় ও উৎস হইতেছে ঐ সকল বিষয়, যাহা অভিজ্ঞতা-লক্ষ ও ‘হাকুল একীন’ পর্যায়ভূক্ত। আর তাহা হইল ঐ সকল যাতনা, বিপদ ও কষ্ট, যাহা নবীগণ ও সাধু পুরুষগণ বিরুদ্ধবাদীগণের হস্তে বা ঐশ্বী নিয়তির ফলে প্রাপ্ত হন। এই প্রকারের দুঃখ-কষ্টের ফলে, যে সব শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা শুধু জ্ঞানের আকারে মানুষের হস্তয়ে বিদ্যমান থাকে, তাহা তাহার উপর অবতীর্ণ হইয়া কর্মের আকার ধারণ করে এবং কর্মের ক্ষেত্রে লালিত পালিত হইয়া পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়। পুণ্যকর্ম সম্পাদনকারীগণের নিজ নিজ সন্তাই খোদার হেদায়াতের এক পূর্ণ ব্যবস্থাপত্রস্বরূপ হইয়া যায়। ক্ষমা, প্রতিশোধ, ধৈর্য, দয়া প্রভৃতি সব নৈতিক গুণ, যাহা শুধু মন্তিক্ষ ও হস্তয়ে জমাট বাঁধিয়াছিল, এখন ব্যবহারিক অনুশীলনের কল্যাণে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ঐগুলির প্রতিফলন ঘটে এবং সারা দেহে উহাদের নকশা ও ছবি অঙ্কিত হইয়া যায়। যেমন আল্লাহ জাল্লা শানুহ বলেন :

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَنِّيٍّ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِيْسِيْنَ

الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ

إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ

سَاجِعُونَ - وَالْكِتَابَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ مِّنْ

وَأَوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْتَدُونَ - (البِّرَّ: ١٥٨-١٥٩)

لَنَبْلُوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَنَسْمَعُنَّ مِنَ

الَّذِينَ أُوذُوا التِّكْبِتَ مِنْ تَقْبِيلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ

أَشْرَكُوا أَذْيَ كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقْوُا

فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأَمْوَالِ - رَأَى عَمَرُ ১৮৭:

অর্থাৎ, “আমরা তোমাদিগকে ভয়, অনাহার, আর্থিক ক্ষতি, প্রাণের ক্ষতি, চেষ্টার ব্যর্থতা এবং সন্তান বিয়োগের দ্বারা পরীক্ষা করিব।” অর্থাৎ এই সব কষ্টই কায় ও কদর (ঐশ্বী মীমাংসা ও ঐশ্বী বিধান) অনুযায়ী অথবা শক্রের দ্বারা তোমাদিগের উপরে বর্তিবে।

“অতএব তাহাদিগকে সুসংবাদ দাও, যাহারা বিপদের সময়ও শুধু ইহাই বলে যে, ‘আমরাও আল্লাহরই এবং আমরা আল্লাহরই দিকে প্রত্যাগমন করিব’, তাহাদের প্রতি খোদার আশিস ও করণ এবং তাহারাই হেদায়াতের চরমত্ব লাভ করিয়াছে” (২:১৫৬-১৫৭)। অর্থাৎ, সেই জ্ঞানে কোনও শ্রেষ্ঠত্ব বা মর্যাদা নাই, যাহা শুধু মন্তিক্ষ ও হৃদয়ে জমা থাকে। বরং প্রকৃতপক্ষে, উহাই জ্ঞান, যাহা মন্তিক্ষ হইতে নামিয়া আসিয়া সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বিনয়াবন্ত করিয়া দেয় এবং স্মরণশক্তিকে উপস্থিত বুদ্ধির আকারে কর্মে প্রকাশিত করে। সুতরাং, জ্ঞানকে মজবুত করিবার এবং উহাকে উন্নতি দেওয়ার বড় উপায় হইল কার্যতঃ উহার নক্ষা স্বীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে রূপায়িত করা। কোন সামান্য জ্ঞানও ব্যবহারিক অনুশীলন ছাড়া পরিণত রূপ ধারণ করে না। এর দ্রষ্টান্ত ইহাই যে, দীর্ঘদিন যাবৎ আমাদের জ্ঞানের মধ্যে একথা আছে, রুটি তৈরী করা খুব সহজ কাজ, ইহাতে কোন জটিলতা নাই। শুধু এতটুকু যে, পানি দিয়া আটা মাখাইয়া এক একটা রুটির জন্য খামির তৈরী করতে হয় এবং ঐগুলিকে দুই হাতে চাপড়াইয়া চওড়া করিবার পর তাওয়ায় দিতে হয় এবং এদিকে ওদিকে ঘূরাইয়া আগুনে সেঁকিয়া লইলেই রুটি হয়। ইহা আমাদের শুধু মৌখিক জ্ঞানের কথা। কিন্তু যখন আমরা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ অবস্থায় পাক করিতে বসি, সর্ব প্রথম আটা দিয়া উপযুক্ত খামির তৈয়ার করাই আমাদের পক্ষে কঠিন হইবে। হয় উহা পাথরের ন্যায় শক্ত থাকিবে নয় পাতলা হইয়া গুলগোলার উপযোগী হইবে। কোন রকম আটা গুঁতিয়া লইলেও রুটির অবস্থা এমন হইবে যে, কতকটা পুড়িয়া যাইবে এবং কতকটা কাঁচা থাকিবে, মধ্যকার অংশটা গোলাকার হইবে এবং চারিদিক দিয়া কান বাহির হইবে। অথচ পঞ্চাশ বৎসর ব্যাপী আমরা রুটি তৈরী করা দেখিয়া আসিতেছি। বস্তুতঃ নিচুক চোখের দেখা জ্ঞান দ্বারা, যাহা স্বকীয় ব্যবহারিক অনুশীলনে আসে নাই, আমরা কয়েক সের আটা নষ্ট করিব। অতএব যখন সামান্য সামান্য বিষয়ে আমাদের জ্ঞানের এই অবস্থা, তখন বড় বড় ব্যাপারে ব্যবহারিক অনুশীলন ছাড়া শুধু বাহ্যিক জ্ঞানের উপর কি প্রকারে ভরসা করা যায়? সুতরাং খোদাতা’লা এই আয়াতগুলিতে শিক্ষা দিয়াছেন যে, তিনি আমাদিগকে যেসব বিপদাপদে ফেলেন, তাহাও জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের উপায়। অর্থাৎ, তদ্বারা আমাদের জ্ঞান পূর্ণতা লাভ করে।

অতঃপর বলিয়াছেন, “তোমাদিগকে তোমাদের ধন ও প্রাণের দিক হইতে পরীক্ষা করা হইবে। লোকে তোমাদের ধন-সম্পদ লুটপাট করিবে, তোমাদিগকে হত্যা করিবে। তোমরা ইহুদী, খ্রীষ্টান ও মুশরেকদের হাতে অনেক নির্যাতন ভোগ করিবে। তাহারা তোমাদের সম্পর্কে অনেক বেদনাদায়ক কথা বলিবে। অতঃপর যদি তোমরা সবুর কর এবং অযথা উত্তেজিত না হও, তবে ইহা সাহস ও

বিক্রমের কার্য হইবে”(৩ঃ১৮৭)। এই আয়াতগুলির তাৎপর্য এই যে, আশিসযুক্ত জ্ঞান উহাই, যাহা ব্যবহারিক পর্যায়ে আপন চমক দেখায় এবং শূন্যগর্ভ জ্ঞান উহা, যাহা শুধু জ্ঞানার পর্যায়ে আছে এবং কাজে লাগানো হয় নাই।

জ্ঞান আবশ্যক, যেমন বাণিজ্যের দ্বারা অর্থশক্তি বাড়ে ও অর্থ বৃদ্ধি হয়, তেমনই জ্ঞান, ব্যবহারিক অনুশীলন দ্বারা পূর্ণতা লাভের পরিণতিতে রহানী পূর্ণতায় পৌঁছে। সুতরাং, জ্ঞানের উৎকর্ষতার বড় উপায় ব্যবহারিক অনুশীলন। অনুশীলনে জ্ঞান জ্যোতির্ময় হয়। ইহাও অবহিত হও যে, জ্ঞান “হাঙ্গুল একীন” পর্যায়ে পৌছার অর্থ, ব্যবহারিক উপায়ে উহার প্রত্যেকাংশ পরীক্ষিত হইয়াছে। বস্তুতঃ ইসলামে ইহাই হইয়াছে। যাহা কিছু খোদাতা’লা কুরআন দ্বারা লোকদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহাদিগকে এই সুযোগও দিয়াছিলেন, যেন ব্যবহারিক উপায়ে এই শিক্ষাকে জ্যোতির্ময় করিয়া তোলে এবং উহার আলোকে আলোকিত হয়।

আঁ হ্যরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসসাল্লামের জীবনের দুই যামানা

উক্ত উদ্দেশ্যেই খোদাতা’লা আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসসাল্লামের জীবন দুইভাবে বিভক্ত করিয়াছেন।

এক ভাগ দুঃখ বিপদ ও কষ্টের এবং দ্বিতীয় ভাগ বিজয়ের। ইহাতে উদ্দেশ্য এই ছিল যে, বিপদের সময়ে কতকগুলি চারিত্রিক গুণের বিকাশ হয়, যাহা কেবল বিপদের সময়েই প্রকাশিত হইয়া থাকে; বিজয় ও ক্ষমতার সময়ে ঐ সকল চারিত্রিক গুণ প্রকাশিত ও প্রমাণিত হয় না। বস্তুতঃ এই প্রকারেই আঁ হ্যরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসসাল্লামের উভয় প্রকার চারিত্রিক মাহাত্ম্য দুই সময়ে দুই অবস্থায় প্রকাশিত হওয়ায়, পূর্ণাঙ্গভাবে স্পষ্টাকারে সাব্যস্ত হইয়াছে। যক্কা মোয়াব্যামায় তের বছর যে বিপদের যুগ আঁ হ্যরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসসাল্লামকে অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল, ঐ সময়কার জীবনী পাঠে ইহা সমুজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হয় যে, আঁ হ্যরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসসাল্লাম বিপদের সময় পরম সাধুর জন্য যে চরিত্র প্রদর্শন করা দরকার অর্থাৎ খোদার উপরে ভরসা, উদ্বেগ ও অঙ্গীরতা হইতে দূরে থাকা, কর্মে শিথিল না হওয়া, কাহারও প্রভাবের ভয় না করা, এই সকল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এমনভাবে প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে, কাফেরগণ ঈদুশ ধৈর্য দর্শনে ঈমান আনিয়াছিল এবং সাক্ষ্য দিয়াছিল যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কেহ খোদার উপর সম্পূর্ণ ভরসা না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে এই প্রকার এন্তেকামত দেখাইতে ও এই প্রকারের দুঃখ সহ্য করিতে পারে না।

অতঃপর, যখন দ্বিতীয় যুগ উপস্থিত হইল অর্থাৎ বিজয়, ক্ষমতা ও সমৃদ্ধির যুগ আসিল, সেই সময়েও আঁ হ্যরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উচ্চ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, যেমন ক্ষমতা, বদান্যতা এবং বিক্রম এরূপ চরম আকারে প্রকাশিত হইল যে, কাফেরগণের এক বিরাট দল এই সব উন্নত চরিত্র দেখিয়াই ইমান আনিয়াছিল। যাহারা অশেষ ও অসহনীয় কষ্ট দিত, তিনি তাহাদিগকে ক্ষমা করিলেন, যাহারা তাঁহাকে শহর হইতে বাহির করিয়াছিল, তাহাদিগকে তিনি নিরাপত্তা দিলেন, তাহাদের মধ্যে অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে তিনি অর্থদানে অর্থশালী করিলেন এবং নিজের হাতের মুঠায় পাইয়াও বড় বড় শক্তিকে তিনি ক্ষমা করিলেন। ফলে অনেক লোক তাঁহার চরিত্র দর্শনে সাক্ষ্য দিল যে, কেহ খোদার পক্ষ হইতে না হইলে এবং প্রকৃত সাধু না হইলে, এহেন চরিত্র কখনও দেখাইতে পারে না। এই কারণেই তাঁহার শক্তিদের পুরাতন প্রতিহিংসা হঠাৎ লোপ পাইল। তাঁহার মহান সদ্গুণাবলী যাহা তিনি মাঠে-ময়দানে ও গৃহাভ্যন্তরে সাব্যস্ত করিয়া দেখাইলেন, তাহা কুরআন শরীফে বর্ণিত হইয়াছে এইভাবে :

فُلَّ إِنَّ صَلَاتِي وَمَعْصِيَتِي وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ (الْعَامِلَةُ ۱: ۳۴)

অর্থাৎ, “তাহাদিগকে বলঃ আমার এবাদত, আমার কুরবানী, আমার মরণ, আমার জীবন খোদার পথে উৎসর্গীকৃত, অর্থাৎ এসব তাঁহার বিক্রম প্রকাশার্থে এবং তাঁহার বান্দাগণকে আরাম দেওয়ার জন্যই, যাহাতে আমার মৃত্যুতেও তাহারা জীবন লাভ করে”(৬:১৬৩)। এস্থানে খোদার পথে এবং বান্দার হিতার্থে মৃত্যুর কথা যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে যেন কেহ মনে না করে যে, তিনি নাউয়ুবিল্লাহ অজ্ঞদের বা উন্মাদগণের ন্যায় আত্মহত্যার সংকল্প করিয়াছিলেন, এই ধারণার বশবর্তী হইয়া যে, নিজেকে কোন মারণাত্ম্ব দ্বারা ধ্বংস করিলে অন্যদের উপকার হইবে। বরং তিনি এই প্রকার নিষ্ফল ক্রিয়ার ঘোর বিরোধী ছিলেন। কুরআন এই প্রকার আত্মহত্যাকারীকে মহাপরাধী ও দণ্ডার্থ বলিয়া নির্ধারণ করে। যেমন বলা হইয়াছে :

لَا تُلْقُوا بِأَيْدِيهِنَّ كُمْرًا إِلَى التَّهْمَذَكَةِ۔ (البقرة ۲: ۱۹۴)

অর্থাৎ, “আত্মহত্যা করিবে না এবং স্বহস্তে স্বীয় মৃত্যুর কারণ হইবে না”(২:১৯৪)। প্রকাশ্যকথা, দৃষ্টান্তস্থলে, খালেদের উদরশূল হওয়ায়, যায়েদ তাহার প্রতি দয়ার্দ্রিচিত হইয়া নিজ মাথা ফাটাইলেও যায়েদ খালেদের জন্য কোনই পুণ্যকর্ম করিল না। বরং এই নির্বোধ ক্রিয়া দ্বারা অযথা আপন মন্তক ফাটাইল মাত্র। পুণ্যকর্ম তবেই হইত, যদি যায়েদ খালেদের সেবায় যথোপযুক্ত হিতকর চেষ্টায় তৎপর হইত, তাহার জন্য উত্তম ঔষধের আয়োজন করিত এবং চিকিৎসার নিয়মানুযায়ী তাহার শুশ্রূষা করিত। কিন্তু নিজ মাথা ফাটানোর ফলে খালেদের কোন উপকার হইল না। অযথা সে তাহার আপন দেহের এক মহান অংশকে দুঃখ প্রদান করিল। বস্তুতঃ এই আয়াতের মর্ম ইহাই যে, আঁ হ্যরত

সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম প্রকৃতই সহানুভূতি ও পরিশ্রমের দ্বারা মানবজাতির উদ্ধারের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন। দোয়ার দ্বারা, প্রচারের দ্বারা, তাহাদের অত্যাচার-নিপীড়ন সহ্য করার দ্বারা, সব রকমের উপযুক্ত বিজ্ঞেচিত পস্তাবলম্বনের দ্বারা তাঁহার প্রাণ এই পথে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। যেমন, আল্লাহ জাল্লা শান্ত বলেন :

لَعَلَّكَ بِأَخْرَجْتَ نَفْسَكَ أَلَا يَكُونُ تَوَآمُّ مُؤْمِنِينَ - (الشَّعَرَاءَ، ٤)

فَلَا تَذَهَّبْتَ نَفْسَكَ عَلَيْنِمْ حَسَرَتِ - (فاطِرَ، ٩)

অর্থাৎ, “তুমি জনগণের জন্য যে দুশ্চিন্তা ও কঠোর পরিশ্রম করিতেছ, তবারা কি নিজেকে ধৰ্ম করিয়া ফেলিবে? যাহারা সত্যকে গ্রহণ করে না, তাহাদের জন্য কি তুমি দুঃখ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিবে”? (২৬:৪৪, ৩৫:৯) সুতরাং, জাতির উদ্দেশ্যে প্রাণ দানের সুবৃদ্ধি ইহাই যে, জাতির মঙ্গলার্থে প্রাকৃতিক বিধান-সম্মত হিতকর পস্তানুযায়ী নিজ আত্মার উপর কষ্ট বরণ করা এবং চেষ্টা-তত্ত্বীর দ্বারা তাহাদের জন্য প্রাণেৎসর্গ করা। ইহা নহে যে, জাতিকে মহাবিপদাপন্ন বা বিপথগামী দেখিয়া বা তাহারা আশঙ্কাজনক অবস্থায় নিপত্তি দেখিয়া আপন মাথায় প্রস্তরাঘাত করা, বা দুই তিন রতি স্ত্রীকনিয়া (এক প্রকার বিষ) খাইয়া ইহজগত হইতে বিদায় গ্রহণ করা এবং মনে করা যে, আমি এই অপকর্ম দ্বারা জাতির মুক্তি সাধন করিয়াছি। ইহা পুরুষোচিত কর্ম নহে। ইহা স্ত্রীলোকের স্বভাব। কাপুরুষেরা সর্বদা এই পস্তা অবলম্বন করে। বিপদ অসহনীয় ভাবিয়া তাড়াতাড়ি আত্মহত্যার দিকে দৌড়ায়। এই প্রকারের আত্মহত্যার যতই ব্যাখ্যা পরে দেওয়া হউক না কেন, এই ক্রিয়া বুদ্ধি ও বুদ্ধিমানের জন্য যে লজ্জাকর, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। ইহা সুস্পষ্ট যে, এই প্রকার মানুষের ধৈর্য-ধারণ করা ও মোকাবিলা না করার কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। কারণ প্রতিশোধ গ্রহণের তাহার সুযোগ হয় নাই। কে জানে সে প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ পাইলে কি না করিত! যে পর্যন্ত মানুষের ঐ সময় না আসে, যখন তাহার জীবন বিপদের পর বিপদ দ্বারা পরিবেষ্টিত হয় এবং ঐ সময়ও না আসে, যখন সে ক্ষমতাসীন, রাষ্ট্র ও ঐশ্বর্যের মালিক হয়, সে পর্যন্ত তাহার প্রকৃত চরিত্র প্রকাশিত হইতে পারে না। স্পষ্ট কথা, যে ব্যক্তি কেবলই দুর্বলতা, অভাব ও অক্ষম অবস্থায় লোকের মার খাইতে খাইতে মরে এবং ক্ষমতা, রাষ্ট্র ও ঐশ্বর্যের অধিকারী হয় না, তাহার সত্যিকার সাধু চরিত্র প্রকাশিত হয় না। যে যুদ্ধক্ষেত্রে নামে নাই, তাহার প্রমাণ নাই যে, সে বীরাঞ্চা ছিল না, কাপুরুষ ছিল। তাহার চরিত্র সম্বন্ধে আমরা কিছুই বলিতে পারি না, যেহেতু আমরা জানি না যে, সে শক্তির উপর ক্ষমতা লাভ করিলে, তাহার প্রতি কেমন ব্যবহার করিত এবং ঐশ্বর্য লাভ করিলে, সে অর্থ জমা করিত বা দান করিত। এবং কোনো যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে সে লেজ গুটাইয়া পলায়ন করিত না বীরত্বের পরিচয় দিত। কিন্তু

খোদার অনুগ্রহ ও কৃপা, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে উভয় অবস্থায় জীবন যাপন করার সুযোগ দিয়া এই সব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশের মাহাত্ম্য দান করিয়াছিলেন। ফলে বদান্যতা, বীরত্ব, গান্ধীর্য, ক্ষমা, ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচার স্ব স্ব স্থানে এমন উৎকৃষ্ট আকারে প্রকাশিত হইয়াছিল যে, ভূগৃষ্ঠে ইহার তুলনা নাই। তাঁহার অক্ষমতা ও ক্ষমতার, দারিদ্র্য ও ঐশ্বর্যের দুই যুগেই সব বিশ্ববাসী দেখিয়াছে যে, সেই পবিত্রাত্মা কেমন উচ্চ পর্যায়ের মহান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহের অধিকারী ছিলেন। মানুষের নৈতিকতার এমন কোন উচ্চতম বৈশিষ্ট্য নাই, যাহা প্রকাশের সুযোগ খোদাতা'লা তাঁহাকে দেন নাই। বীরত্ব, বদান্যতা, ধৈর্য, স্ত্রৈর্য, ক্ষমা, গান্ধীর্য ইত্যাদি যাবতীয় উন্নত চারিত্রিক মহিমা এরপে সাব্যস্ত হইয়াছে যে, পৃথিবীতে উহার দৃষ্টান্ত মিলা অসম্ভব। অবশ্য ইহা সত্য যে, যাহারা অত্যাচারকে চরমে পৌছাইয়াছিল আর ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করিতে চাহিয়াছিল, খোদা তাহাদিগকেও শাস্তি না দিয়া ছাড়েন নাই। কারণ তাহাদিগকে সাজা না দিয়া ছাড়িয়া দিলে, সাধুগণকে তাহাদের পদতলে ধ্বংস করার নামান্তর হইত।

আঁ হ্যরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসসাল্লামের যুদ্ধের উদ্দেশ্য

অনর্থক লোক হত্যা করা আঁ হ্যরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের যুদ্ধগুলির কখনও উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি তাঁহার বাপ-দাদার দেশ হইতে বহিস্থৃত হইয়াছিলেন। অনেক নিরপরাধ মুসলমান স্ত্রী-পুরুষকে অকারণে শহীদ করা হইয়াছিল। তখনও অত্যাচারের নিরুত্তি হয় নাই। ইসলামের শিক্ষায় বাধা দেওয়া হইতেছিল। সুতরাং, খোদার রক্ষা-বিধান চাহিল নির্যাতিগণকে সম্পূর্ণ ধ্বংস হইতে রক্ষা করা হউক। সুতরাং যাহারা অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল, তাহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা হইল। বস্তুতঃ হত্যাকারীদিগের হত্যার ফির্তনা দূরীভূত করিবার উদ্দেশ্যে ও অন্যায়ের প্রতিরোধকল্পে, ঐ সকল যুদ্ধ করা হইয়াছিল। ঐ যুদ্ধগুলি তখন করা হইয়াছিল, যখন অত্যাচারপ্রিয় লোকগণ সত্যের সেবকগণকে নিশ্চিহ্ন করিতে চাহিতেছিল। এমতাবস্থায় যদি ইসলাম আঞ্চলিক ব্যবস্থা না করিত, তবে সহস্র সহস্র নিরপরাধ শিশু ও স্ত্রীলোক নিহত হইত এবং ইসলাম থাকিত না।

স্বরণ রাখিতে হইবে, আমাদের বিরুদ্ধবাদীগণ ভীষণ বাঢ়াবাঢ়ি করিয়া ইহাই মনে করে যে, এলহামী হেদায়াত এমন হওয়া চাই যে, উহাতে কোন স্থানেই শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের শিক্ষা থাকিবে না। সর্বদা গান্ধীর্য, সহ্য ও ন্যূনতার দ্বারা স্বীয় প্রেম ও দয়া প্রদর্শন করিতে হইবে। এরপে ব্যক্তিগণ তাহাদের ধারণা অনুসারে খোদার সম্যক পূর্ণ গুণাবলীকে শুধু ন্যূনতার মধ্যেই শেষ করে।

কিন্তু এই বিষয় লইয়া চিন্তা করিলে সহজেই প্রত্যেকে স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে যে, উহারা কত বড় ও সুস্পষ্ট ভূল করিতেছে। খোদার প্রাকৃতিক বিধানে দৃষ্টিপাত করিলে স্পষ্ট সাব্যস্ত হয় যে, উহা অবশ্যই পৃথিবীর জন্য কেবলই কৃপা। কিন্তু এই কৃপা সর্বদা ও সর্বাবস্থায় নম্রতা ও মোলায়েম ব্যবহারের আকারে প্রকাশিত হয় না। বরং তিনি একমাত্র করুণার তাগিদে বিচক্ষণ চিকিৎসকের ন্যায় কখনও মিষ্ট সিরাপ সেবন করিতে দেন এবং কখনও তিক্ত ঔষধ দেন। মানব জাতির প্রতি তাঁহার দয়া ঠিক সেইভাবে অবতীর্ণ হয়, যেমন আমরা প্রত্যেকে আমাদের সমগ্র অস্তিত্বের প্রতি মমতা রাখি। এ বিষয়ে কাহারও সন্দেহ জন্মিতে পারে না যে, আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার সমগ্র অস্তিত্বকে ভালবাসে। যদি কেহ আমাদের একটি চুল ছিঁড়িতে চাহে, তবে আমরা তাহার প্রতি অত্যন্ত রুষ্ট হই। যদিও আমাদের দেহের প্রতি মমতা আমাদের গোটা দেহে ছড়াইয়া রহিয়াছে এবং আমাদের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সত্যিকারভাবে আমাদের নিকট প্রিয়, আমরা কোনটিরই ক্ষতি চাহি না; তথাপি একথা স্বতঃসিদ্ধরূপে সত্য যে, আমরা আমাদের সব অঙ্গের প্রতি সমান ও একই পর্যায়ের মমতা পোষণ করি না; বরং কোমল ও প্রধান অঙ্গগুলির ভালবাসা, যাহাদের উপর আমাদের উদ্দেশ্যের অনেক কিছু নির্ভর করে, আমাদের হৃদয়ে প্রবল থাকে। সেইরূপ আমাদের দৃষ্টিতে অঙ্গ সমষ্টির জন্য আমাদের ভালবাসা একটি অঙ্গের প্রতি ভালবাসা অপেক্ষা অনেক অধিক। সুতরাং যদি কখনও আমাদের এমন ঘটনার সম্মুখীন হইতেই হয় যে, কোন উচ্চ পর্যায়ের অঙ্গ রক্ষার্থে নীচু শ্রেণীর অঙ্গ কর্তন, ভঙ্গ বা জখম করিবার প্রয়োজন হয়, তখন আমরা প্রাণ রক্ষার্থে কোন দ্বিধা না করিয়া সেই অঙ্গছেদ বা কর্তনে প্রস্তুত হই। যদিও তখন আমাদের হৃদয়ে এই বলিয়া দুঃখ হয় যে, আমরা আমাদের একটি প্রিয় অঙ্গকে জখম করিতেছি বা কাটিয়া ফেলিতেছি। তবুও আমরা এই ভাবিয়া উহা কর্তনে প্রস্তুত হই, পাছে না এই অঙ্গের অপকারিতা সুস্থ এবং কোমল অঙ্গগুলিকেও নষ্ট করিয়া ফেলে। সুতরাং এই দৃষ্টান্ত হইতেই বুঝিতে হইবে যে, খোদাও যখন দেখেন তাঁহার সাধু বান্দাগণ অসত্যের উপাসকদের হস্তে ধূংস হইতেছে এবং ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলা বিস্তৃত হইতেছে, তখন তিনি সাধুগণের প্রাণ রক্ষা এবং ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলা দমনের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থার উন্নত ঘটান আকাশ হইতেই হউক বা পৃথিবী হইতেই হউক; কেননা, তিনি যেমন পরম দয়াময় তেমনই পরম প্রজ্ঞাময়ও বটেন।

أَلْعَمَنْدِيلِهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

সকল প্রশংসা বিশ্বস্তা ও বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহর জন্য।